B3088
SCL Kolkata

বিহার সাহিত্যভবন লিঃ

২৫/২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

বিহার সাহিত্যভবন লিঃ
২৫/২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ: ১লা বৈশাখ—১৩৬৩ (ইং—১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৬)

রচনাকাল: ১৯২৭—১৯৫১

CENTRAL LIBRARY

মূল্য: সাড়ে চার টাকা।

জয়হিন্দ্ প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৪২ আপার সারকুলার রোড্, কলিকাতা ৯
হইতে শ্রীনিত্যগোপাল চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

সরোজকুমারের জন্ম গিরিডিতে ১৯০৩ সালে।
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতৃ-পিতামহের আবাস মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে।
কৈশোরে ছোটনাগপুর অঞ্চলে সালার স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের পাঠ শুরু হয় হাজারিবাগ কলেজে।
১৯২১ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন ও সুভাষ চন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। ঐ সময়ই তিনি ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লেখক হিসাবে সরোজকুমারের ভবিষ্যৎ এই সময়ই সূচিত হয়। সাংবাদিক সরোজকুমারের পরিচয়ও এই সময়ই পাওয়া যায়।
বর্তমানে তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন সার্থকনামা শক্তিশালী লেখক।

ভূমিকা

'মাটির কাছাকাছি' যে কোনো সৎ লেখককেই থাকতে হয়। সেই মাটির আর্দ্রতা অথবা উষরতা লেখকের মনকে গঠন করে। নদীমাতৃক বাংলা দেশ তার জীবনীকারদের মনকে চিরকাল যেমন করুণরসে স্নিগ্ধ করেছে, তেমনি বাঙলার আদিগন্তবিস্তৃত পথপ্রান্তর, সূর্যকরোজ্জ্বল উদার নীলিমা সেই মনে শান্ত বৈরাগ্য ও স্মিত কৌতুকের সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। সংসারে আসক্ত করেছে যেমন, সংসার থেকে মোহমুক্তিও ঘটিয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে সার্থক বাঙালী লেখক মাত্রেই এই উভয় লক্ষণে চিহ্নিত। মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা-সাহিত্যে এর পরিচয় আছে। দুঃখভারাক্রান্ত ফুল্লরার বারমাস্যা যিনি রচনা করেছেন, তিনিই আবার ভাঁড়ু দত্তকে নয়ে কৌতুকে সরস হয়েছেন। দেবদেবীদের জীবন-ভঙ্গিও এঁরা অনায়াসে নিজেদের হাসিঅশ্রুবিমিশ্র অভিজ্ঞতার ছাঁচে ফেলে আয়ত্ত করেছেন। চণ্ডী অথবা মনসাভক্তরাই হোন, শৈবসিদ্ধারাই হোন। এমন কি বৈষ্ণব-গীতি-কাব্যের সহৃদয় ভাবাবেগ-প্রাধান্য বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যের যুক্তিনির্ভর বুদ্ধি-উজ্জ্বলতায় সামঞ্জস্য পেয়েছে। ডাক ও খনা-বচনের অতি-পার্থিবতা রূপকথার নভোচারিতার সঙ্গে তুলনায় ম্লানতর মনে হয় না, যখন বুঝি বাঙলা দেশের বর্ষিয়সী মহিলাদের মনে ও মুখে উভয়েরই আসন ছিল সমমর্যাদাপন্ন। বাঙালী গৃহিণীদের ব্রতকথায় সংসারে অনুরক্তি ও অনাসক্তি দুইই বিধৃত আছে।

আধুনিক কালেও সেই সুপ্রাচীন বাঙলার মাটি ও মন সঞ্চারিত হয়েছে সাহিত্যে। তাই রূপ কৌশল ও বিন্যাসগত নতুন নতুন পরীক্ষার দিনেও অর্বাচীন সাহিত্যে চিরন্তন বাঙলাকেই প্রকাশ করেছে। রূপগত বৈচিত্র্যের সুযোগে সেই বাঙলাকে অবশ্য আর মধ্যযুগের মত আধুনিককালেও একমাত্র পদ্যবন্ধে বিকশিত হতে হয়নি। গদ্য এসেছে—সেই সঙ্গে উপন্যাস-নাটক, সর্বোপরি যদিও সর্বশেষে ছোটগল্প।

ছোটগল্পের সবশেষে না এসে উপায় ছিল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব যেদিন দৃঢ়তর হোল, সংসার ছোট হয়ে গেল, পৃথিবী ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত হয়ে এলো, ব্যক্তির মন গোষ্ঠী ছাড়াও বাঁচতে চাইলো, প্রকাশিত হতে চাইলো, সেদিন ছোটগল্প এলো। তাই বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত আত্মনিষ্ঠ গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখকের হাতেই যে ছোটগল্পের শুভ সূচনা হোল, এ ঘটনা

যতটা অবিস্মরণীয়, ততটাই অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের বেদনা-মধুর ছোট-গল্পগুলির প্রেরণা যে গ্রামজীবন এবং সেই গল্পগুলিতে যে যুগপৎ করুণ ও কৌতুকের মেঘরৌদ্রলীলা চলেছে, সেটাও লক্ষনীয়। গ্রামের মধ্যেই চিরকালের বাঙলাদেশ কথা বলেছে। এবং সেই গ্রামের সূত্রে সাহিত্যে বিশেষত গল্পে-উপন্যাসে নদীর স্নিগ্ধ কলোচ্ছ্বাস—রুদ্র-ভৈরব-রবও, মাটির নরম আর্দ্রতা, আকাশের সহাস্য উদারতা, মাঠের নিঃসীম প্রসার অর্থাৎ সংসারযাত্রাকে কাছ থেকে অভিভূত হয়ে দেখা ও দূর থেকে নির্লিপ্তমনে ভাবা দুইই সমান বেগে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি বিশেষত তারই উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের পরে ও কল্লোলযুগের পূর্বে দুজন প্রধান বাঙালী গল্পলেখকদের মধ্যে এই লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র দুজনেই ব্যথার কাহিনী ও কৌতুকের গল্প লিখতে পারদর্শী ছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মত উক্ত দুই প্রসঙ্গকে একটি মৌলিক প্রস্তাবে সম্মিলিত সংগ্রথিত করে দিতেই তাঁরা বিশেষত জানতেন।

এর কারণ আর কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়, উন্মুক্ত আকাশ আর বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তাদের পটভূমিতে মানুষের ছোট ছোট সংসারকে যখন বড়ো তুচ্ছ মনে হয়, মানুষের স্বপ্নকামনা চেষ্টা সাফল্য বৃহৎ বিশাল পৃথিবী ও প্রকৃতির মাঝখানে যেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়, তখন দুঃখ হয়, বেদনা জমে; সাথে সাথে উদার ঔদাস্যে মন ভরে যায়। নিকটজনের অশ্রুপাতের পাশে দূরজনের কৌতুকবোধ সমান মূল্যবান মনে হয়। একত্র প্রবাহে দুইই বয়ে চলে জীবনকে রঙিয়ে রসিয়ে। দুইই স্থায়ী হয়ে রইল বাঙালীর গৃহাঙ্গনে, বাঙলা সাহিত্যেও।

এই স্থায়ী ও শাশ্বত জীবনবোধের মূলধন নিয়ে যাঁরা এগোন তাঁদের শিল্পকর্মে স্বভাবতই সাময়িকতা খুব বেশি ছায়াপাত করে না। তাঁদের মনে কোনো বিশেষ সাহিত্যভাবের আন্দোলন তেমন কিছু উৎসাহ বয়ে আনে না। সরোজকুমার গোড়া থেকেই এই মূলধনের কারবারী। তাই 'কল্লোল' 'কালি-কলমে'র সাথে এককালে যুক্ত হয়েও তিনি ঠিক তাদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে কোনদিন অংশ নেন নি। সেদিন বিপ্লবের নামে যে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রচেষ্টা চলেছিল তার পেছনকার সৎসাহস অথবা দুঃসাহসকে মূল্য দিতেই হয়; কিন্তু সেদিনকার মুখ্য আন্দোলনকারীদের অনেকেই যে শেষপর্যন্ত কক্ষচ্যুত ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন তার মূল হেতু হয়তো এই যে, সেদিন তাঁরা বাইরের দিকে যতো চেয়েছিলেন ততোটা ঠিক নিজেদের মাটি আর মনের দিকে চান

নি। আবার কখনো নিজেদের মনের সেই অংশেই এতো আলো ফেলেছেন, যার মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গীণ মানুষের স্পষ্ট স্বতঃস্ফূর্তি বারবার বাধা পেতে থাকে। সেক্ষেত্রে ততটুকু অত্যাবশ্যক আত্মবিস্মৃতি তাঁরা আয়ত্ত করেননি যার প্রভাবে স্থানকালে সীমিত সাধনা চিরকালীন সিদ্ধিতে পৌছতে পারে। নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সৃষ্টি ও আমদানীর দিকে যে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা, তাতে পরবর্তীদের পথ অবশ্যই সুগম হয়েছে, কিন্তু তাঁরা যে অনেকক্ষেত্রেই সেই অভিনবত্ব সৃষ্টির অতিমোহে চিরন্তনীকে মূল্য দিতে পারেন নি ও ফলে নিজেদের পরিণতিকে খণ্ডিত ও সম্ভাবনাকে অসমাপ্ত করেছেন তা আজ আর অস্বীকার্য নয়। বরং কল্লোলের সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠ না হয়েও যাঁরা আন্তরিকভাবে সেইপত্রিকা পরিচালকদের মত সাহিত্যে সন্ধিৎসু ও অধিকন্তু দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয়ে নিবিড় ছিলেন—সেই অল্প কয়েকজন গল্পে-উপন্যাসে আজো অক্লান্ত শক্তিপরীক্ষা করে চলেছেন। মাটির সাথে মনের দৃঢ় যোগ থাকলে মনকে শুষ্ক শ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় না। সরোজকুমারের সাহিত্যিক মানস আজকেও তাই প্রবহমান। প্রাপ্ত পরিণতির চেয়ে স্থিরতর পরিণতি আজো তাঁর অন্বিষ্ট।

যদিও তাঁর প্রধান পরিচয় একজন অগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে, কিন্তু তিনি যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট রচনাকার, একথা সবাই অক্লেশে মনে করতে পারতেন যদি তাঁর গল্প-গ্রন্থগুলি সুলভ ও সুপ্রচারিত থাকতো; নিজে যদি তিনি খ্যাতিযশের আকাঙ্ক্ষা ও আহরণে, বাঙলা সাহিত্যে অন্য অনেকের মত না হোক, কিছু পরিমাণেও তীক্ষ্ণ ও সক্রিয় হতেন।

অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁর জয় হয়েছে। বাঙলাদেশকে তিনি জানেন। বাঙালীর মনপ্রাণের প্রকাশভঙ্গি তিনি বোঝেন। তার আবেগ নিরুদ্বেগ মোহ মোহমুক্তি—তার দ্বৈতাদ্বৈত স্বভাবের তিনি মূল সন্ধান করেছেন। এবং বাঙলাদেশকে জানতে ও জানাতে গিয়ে তিনি লাভ করেছেন নিজেকে। এবং সারাজীবন তাকে রক্ষা করেছেন। এই বিশুদ্ধচিত্ততা তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে প্রকীর্ণ আছে।

সেই ছোটগল্পের সংখ্যা ও ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্য অপরিমেয় হলেও আপাতত লেখকের একটা মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে তাঁর এই প্রধান গল্পগুলির সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছি। যতদূর সম্ভব নির্বাচন ব্যাপারে ব্যক্তিগত রুচির অতিপ্রাধান্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং এ বিষয়ে অন্য যে দুজনের সহযোগিতা বিশেষত পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রীকানাই দত্ত ও শ্রীঅমিতাভ রায়চৌধুরী। এজন্যে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

॥ দুই ॥

'দেহযমুনা'য় অকালবিধবা তরুণীর মর্মজ্বালা যে শান্ত আবেগে বলা হয়েছে, 'নীড়ের মায়া'য় সমস্যা অনেকটা এক হলেও লেখকের পরিণত লেখনী তাকে বুদ্ধির বিদ্যুৎ-স্পর্শে চিরে চিরে দেখাতে চেয়েছে। কারুণ্যের বদলে সেখানে তাই যে কাঠিন্য এসেছে তা সুনিয়মিত ও অনিবার্য। প্রথমগল্পে সতীর মহত্ব আত্মক্ষয়ী বিবর্ণ জীবনের নিদারুণ শ্রান্তির বিনিময়ে পাওয়া, দ্বিতীয়ে অন্তত গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেখি, সুরবালা সতীর সে 'সতীলোক'ও হারালো, ইহজীবনের দুঃখলজ্জা অবসাদ থেকেও রেহাই পেলো না—নির্বিচারা সংসারযাত্রার বিরুদ্ধে এই তার দুঃসাহসী স্পর্ধিত সংগ্রামের পরিণাম! পরিহাসের সুর দুই গল্পেই বর্তমান; কিন্তু দ্বিতীয় গল্পে যেহেতু বিশ্লেষক মনের প্রাধান্য ও সক্রিয়তা প্রবলতর, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মূল চরিত্রের অতর্কিত অথচ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন দেখিয়ে তাই যতখানি পরিণাম-তীব্রতা এসেছে, প্রথমটিতে ঘটনা ও চরিত্রের সাথে লেখকের ঘনিষ্ঠতা নিবড়তর হলেও (করুণা ও অলকার অত্যন্ত ব্যক্তিগত চিঠিদুটি সেই প্রাণযোগের উপযুক্ত স্মারক ও বাহক) সেই ঋজুঘনতা আসে নি। লেখকের বয়োমনোগত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব ছাড়াও গল্পদুটির সমস্যাগত গুরুত্বের বিভিন্নতাও এর জন্যে কিছুটা দায়ী অবশ্যই। প্রথমে দেহযমুনায় জোয়ার-ভাঁটার আনুষঙ্গিক হয়ে এসেছে অতৃপ্ত প্রাণের ক্ষুধা, দ্বিতীয়ে সমগ্র সত্তা তার আত্মপ্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী করতে গিয়ে দেহকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ব্যবহৃত হতে দিয়েছে। তাছাড়া সতীর শূন্যতাবোধ তার মৃত্যুর সাথে অচেতনলোক আশ্রয় করল আর সুরবালাকে সম্পূর্ণতালাভের ভান করে শূন্যতার বোঝাকে সচেতনভাবে বয়ে বেড়াতে হবে বহুকাল, হয়তো সারাজীবন—পরিহাসের প্রদাহ তাই দ্বিতীয়েই যে তীব্রতর তা বলা বাহুল্য।

সরোজকুমারের মনঃশক্তি যে অভ্যস্ত পথে তার প্রকাশ খোঁজে নি তার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তাঁর সাধারণ ও দাম্পত্য প্রেমের গল্পগুলি। এদের মধ্যে 'মুক্তি' অপেক্ষাকৃত তারুণ্যসূচক হলেও আলোচ্য লেখকের চরিত্রের ভগ্নাংশ তাকেও রূপবান করেছে। সেই সুস্থ কৌতুকপ্রিয়তা ও সংক্ষিপ্ত সংলাপে সামঞ্জস্য। গল্পের শেষভাগে প্রশ্নগুলি একটু বেশি উদ্যতভাবের। খুশির জন্যে এমনিতেই পাঠকের ঔৎসুক্য সামান্য হতে পারে না। যে মেয়ে বিবাহিত-পূর্ব জীবনের প্রেমকে 'স্বামী-সৌভাগ্যে'র চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে অনিশ্চিতের মধ্যে বেরিয়ে আসে ও স্পষ্টত বলে যে সেই জীবনে তার 'গ্লানি বোধ হয়'—তাকে বিরলশ্রেণীর সাহসিকা মনে করে সপ্রশংস হলেই সমস্ত শেষ হয় না। তার পরেও অনেকক্ষণ উদ্বেগে মন ভারী হয়ে থাকে। অবশ্য সকলেই জানেন সংসারের সাধারণ নীতি হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া,

মানিয়ে চলা। যেমন, 'মন-পবন' গল্পে কিশোরকালের সমস্ত উদ্দামতা ও চাঞ্চল্যকে মুহূর্তে সমাপ্ত ক'রে দিয়ে নীলাকে অপরিণতির স্তর থেকে পরিণতিতে এগিয়ে যেতে হোলো, লেখকের কথায় 'তার যে অপরিণত মন এতদিন দুটি দুর্বল বাহু দিয়ে যত জঞ্জাল খেলাচ্ছলে কুড়িয়ে বেড়িয়েছে, একটি দিনে তা যেন দশটি বছর এগিয়ে গেল'—স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ 'লেখাপড়ার পক্ষপাতী' বলে সে ফার্স্ট বুক পড়তে বসল—'একটি মেয়ে জন্মের মতো হারিয়ে গেল' ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েটি জন্ম নিল সে-ই প্রাত্যহিক জীবনের পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সুসঙ্গত করে তুলে চিরকাল এগোতে থাকে। বটুক পটলারা পেছিয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ দেখেছিলেন তাকে হয়তো এখানে আশঙ্কা করা ভুল। কিন্তু আপাতত গল্পটি যেখানে শেষ হয় সেখানে নীলার স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাহত হোলো বলে আমরা যতটা ভাবি, তার চেয়ে নিশ্চয়ই কম ভাবায় না বটুকের সেই ভীরু বাসনার ক্ষণ-উদ্ভাসন—বিবাহিতা নীলার মধ্যে তার 'আগেকার মানস-বধূকে' না পাওয়ার জন্যে দুঃখবোধ। আবার খেলার সাথীকে ডেকে পটলা যে চিরকালের জন্যে হতাশ মনে ফিরে গেল, তাকেও কি ভুলে যাই? অথচ এই পরিচিত পৃথিবীতে লক্ষ্মী-নারায়ণদের 'পক্ষপাতী' হয়ে উঠতে হয় নীলাদের অতিদ্রুতবেগে। আপত্তি করা চলে না। লেখকও গল্পটি তাই নির্মম অনায়াসে শেষ করেছেন—একটি পঙক্তির ঋজু কঠিন অব্যর্থ নিশানায়। বৈধ স্বামী-সংসারে স্বেচ্ছাবিরাগী খুশির কাহিনী পাশাপাশি তাই আরো চমকপ্রদ লাগে—সাংসারিক মানুষরা যাকে বলবেন 'চাঞ্চল্যকর', গল্পটির আরম্ভে খবরের কাগজের রিপোর্টকে ওই ভাষাসুদ্ধ কাজে লাগিয়ে সুচতুরভাবে লেখক বুঝি তাই বোঝাতে চেয়েছেন, অবশ্য গল্পের অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেও এর প্রয়োজন ছিল।

প্রেমের ছলাকলা অথবা মন দেওয়া-নেওয়ার সবিস্তার বর্ণবিন্যাসে সরোজ-কুমার খুব বেশি মনোযোগ কোনদিন দেন নি। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই প্রেম জীবনের অন্য অনেক প্রবণতা ও সম্ভাবনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। যে জন্যে প্রেমকে অনেক সময় সরে দাঁড়াতে হয় অন্যতরকে পথ করে দিতে। যেমন 'ক্ষণিকা' গল্পে সাংসারিক দায়িত্ব, স্বামীপুত্রের প্রতি কর্তব্য দুশ্চিন্তা পুরনো প্রেমের সমাধি রচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই প্রেমের সঙ্গে জড়িত স্মৃতি বা স্মারককেও অবহেলা করে বাঁধাধরা জীবনের বাইরে প্রেমের জন্যে কোনো স্বতন্ত্র মর্যাদা পর্যন্ত রাখে নি— এবং এই পথেই তো প্রেম ফুরিয়ে যায়। সচরাচর অভিজ্ঞ লোকেরা এই তো পান জীবন থেকে। জীবনের হেমন্ত ঋতুর দার্শনিক সরোজকুমার প্রেমের গল্পে তাই আহরণ করেছেন। 'বসন্ত-

রাত্রির স্মৃতি' এদিক দিয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সুচরিতা-কমলেশ প্রথম যৌবনের উন্মাদনা দিয়ে একদা একটি তরল বসন্ত-রাত্রিকে ঘনীভূত করে তুলেছিল—বহু বৎসরের ব্যবধানে আরেক মিলন-রাত্রির অবকাশে শান্তসুখী কমলেশকে আত্মঘাতী বলে অনুকম্পা করছে সুচরিতা আর সুচরিতার প্রসাধিত গুণ্ঠিত সৌন্দর্যে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার করছে কমলেশ। বিস্ময়ে সংশয়ে ক্ষোভে সুচরিতা তার শীতে পীত শরীরকে যতই গোপন করতে চাক—বসন্ত যে তার জীবনে আজ স্মৃতিমাত্র একথা সে বেশ জানে: কমলেশের মধ্যে শীতের শৈথিল্য বেশ জাঁকিয়ে এসেছে—পুরুষোচিত বিনয়ে তাকে সে অস্বীকারও করে নি, যদিও সুচরিতার পক্ষে তা মেনে নেওয়া অন্তত আপাতত অসম্ভব। আদর্শবাদী কবি-প্রাণের ভাবোন্মাদনায় শীত ঋতুকে বসন্তের দূত মনে করায় হয়তো সোল্লাস সার্থকতা আছে, কিন্তু বাস্তববাদী গল্পলেখক জীবনের অবশ্যম্ভাবী শীতঋতুকে মেনে নিয়ে বসন্তরাত্রির স্মৃতিগন্ধী একটি কোমলার্দ্র বেদনার ফুল বিকশিত করেন—আর কিছু না। সরোজকুমার এখানে তাই করেছেন। বাঙলা দেশের আকাশ মাটির গুণে উদার ঔদাস্যে সেই গন্ধেও শেষ পর্যন্ত অনাবিষ্ট থেকেছেন লেখক। তাই অভিজ্ঞান বসন্ত এসরাজ অবশেষে কোলের কাছে অনাদৃত পড়ে থাকে—আর নায়কটি বড়জোর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়। এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত নারীও যখন অবস্থার পাকে পড়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে তখন প্রেমিক মানুষটি অজ্ঞাতসারে হাসে ও 'তারপরে উঠে চা তৈরী করতে' যায় অর্থাৎ যথারীতি সংসারের অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বাঁকা ও সোজা পথে জীবন অবিরাম চলেছে। 'সিগারেটের টুকরো' গল্পে সেই বহমান জীবনের কয়েকটুকরো সময় রণধীর-শর্বরীর সম্বন্ধকে জড়িয়ে বিচিত্র বিপরীতের সংস্থানে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যে শর্বরী অন্ধকার পাড়াগাঁয়ে কারাবাসী রণধীরের জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগস্বীকারের দুঃসহ ব্রত দীর্ঘকাল উদ্‌যাপন করেছে—নিঃসঙ্গ নীরব একাকী, রণধীর ফিরলে যে একদিন 'পিঁড়ি পেতে শাড়ির আঁচলে ঝেড়ে' দিয়েছে তাকে বসতে, শহরে এসে রণধীরের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় নার্সের পেশায় যুক্ত হয়ে সে হয়ে গেল অন্যরকম—শান্ত লাবণ্য গিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমা এলো যেমন—তেমনি তার পায়ে চলার পথ রণধীরের পথ থেকে অনেক দূরে বেঁকে গেল—তার ফুলে রণধীরের জন্যে মালা গাঁথা আজ আর তেমন সহজ নয়: বহু মানুষের ভীড়ে বহু আলোর মেলায় কারো বন্ধনমোচন হলে সে এমনি হয়েই যায়। শর্বরীর উপায় কী। রণধীর বুঝি তাই শক্ত হয়ে মুহূর্তের জন্যে

দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজেকে নতুন কাজে জড়িয়ে ফেলে। বিচিত্র ব্যবহার! কিন্তু এই ব্যবহারে বিবিক্ত গল্পলেখকেরও হয়তো সমর্থন আছে। কেননা শান্ত নম্র একব্রতী জীবন আদর্শচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট ধাবমানতায় রূপান্তরিত হলে সেই সঙ্গে অনেক মোহ ও মুগ্ধতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরেই, প্রেমকে অন্য অনেক তিক্ত রক্তাক্ত অবধারিতকে পথ করে দিয়ে তার আপন জায়গা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। একে ঠেকাতে যাওয়া ভুল। মেনে না নিয়ে উপায় নেই। আর শুধু কি অবস্থার বিপর্যয়েই সব ঘটে? প্রাকৃতিক নিয়মেও তো অনেক মধুর সম্পর্ক ও সম্বোধন ধীরে ধীরে ধূসর ও অর্ধমৃত হয়ে যায়। 'একটি সত্যকার প্রেমের গল্পে' কোন সান্ধ্য মেঘ-সমারোহকে উপলক্ষ্য করে আপাতত মাধুর্যবিহীন যে প্রেমোপাখ্যান ঘনিয়ে ওঠে তা-ই সত্যকার প্রেম—নামেই প্রমাণ, লেখক ঈষৎ জোরের সঙ্গেই একে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন, কেননা তিনি জানেন এই গল্পে প্রেমের জনপ্রিয় উত্তাপ উদ্বেগ ও উদ্বেলতার ছড়াছড়ি নেই বলেই সাধারণত একে প্রেমের গল্প বলে মনে করা হবে না, অথচ মজা ও হয়তো পরিহাসও এই যে, অলোচ্য গল্পের উদরসর্বস্ব দামোদর শ্রেণীর প্রেমিকই তো জগতে সংখ্যায় বেশি ও বর্ষার রাতে প্রণয়িনী স্ত্রীর কাছে কেয়াফুলের গন্ধবিজড়িত রসের প্রসঙ্গ না তুলে ঐ দামোদর বাবুর নিয়মেই ইলিশরসিক রসনার দাবী মেটাতে বলা ও তার আয়োজন করাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্যকার প্রেম। এবং এই প্রেমের ঘোরে দামোদরবাবু যে স্ত্রীকে নাম ধরেই সম্বোধন করেন—সে কেবল ঘরের খিচুড়ি-উৎসবের সম্পাদিকার প্রতি বিগলিত কৃতজ্ঞতায়। ঠাণ্ডার আমেজে ভাবতেও আরাম পান, 'সুরমা (তাঁর স্ত্রী) তোয়াজটা জানেন! তাঁকে যেন ঠিক আঙুরের মতো তুলোয় শুইয়ে রেখেছেন।' তাঁর শারীরিক সুখ ও স্বস্তির জন্যে সুরমার অপরিহার্যতাই এই 'সত্যকার' প্রেমের মূল। অবশ্য উক্ত প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব যতই হোক সরোজকুমারের স্মিতহাস্য লেখনী প্রধান প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যতর কৌতুকপ্রদ অবস্থাকে চিত্রিত করতে যথারীতি এগল্পেও অকুণ্ঠ। তোয়াজপ্রিয় দামোদরবাবুর তন্দ্রাকর্ষণকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্রের 'মহম্মদ তোগলককে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি'র প্রতিধ্বনি—এবং সব সত্ত্বেও ছেলেটি যে 'কিছুতেই সেই পরলোকগত পাঠান সম্রাটকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না'—এই বিড়ম্বিত অসহায় অবস্থার চিত্রণে লেখকের কৌতুকরসবোধ যে স্মিত অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশের সুযোগ করে নিল, তাও লক্ষণীয়। তাছাড়া মুখ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও সূক্ষ্মতা ভাবলে গৌণের এই লঘুস্পর্শ ক্ষতের ওপর প্রলেপের কাজ করে নিশ্চয়ই।

এই কৌতুকপ্রিয়তা অন্যত্র ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'শনি রবি সোমে' গ্রাম-গৃহ-উন্মুখ ব্যর্থ-নাগরিক জনৈক কেরানীর জীবনে যে অস্ফুট কারুণ্য সঞ্চিত আছে তার বিশ্লেষণে যেমন সে স্নিগ্ধতা ঢালে, তেমনি 'ব্যাঘ্র-দেবতা'য় গ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ বাঘের মুখে পড়ে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলতায়, স্পর্ধা ও সাহসের হঠকারিতায় যে বিচিত্র শোভাযাত্রার সৃষ্টি করে তার রূপায়ণেও তীক্ষ্ণতা আনে। তাছাড়া প্রথম গল্পটিতে যেমন পল্লীর বর্ষা-প্লাবিত মাঠ-হাট পথ-ঘাটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই, দ্বিতীয়ে তেমনি গ্রাম্য মানুষের পরস্পর-বিরোধী আচার আচরণের ও অসঙ্গত কথাবার্তার নির্ভুল নিরূপণ লক্ষ্যে পড়ে অর্থাৎ পল্লীর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়তই লেখকের অবাধ অধিকার যে অস্খলিত, তা এরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করে। এমন কী ভাবতে আমোদ লাগে, যখন দেখি ব্যাঘ্রভীত মানুষের জনতা বিশেষত নারীসমাজ মৃত ব্যাঘ্রকে মুহূর্তে দেবতা বানিয়ে ফেলল, যেন মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবতাগুলি এইভাবেই মানুষের সীমাবদ্ধতা ও শক্তিহীনতার সুযোগে সিন্দূর-চর্চিত হবার সৌভাগ্যলাভ করতেন। মানুষের দুর্বলতা দেবতার জন্যে স্থায়ী পূজার আসন পেতে দিয়েছে বলেই দেবতারা বহুকাল ধরে জাগতিক সংশয়বুদ্ধি ও কুসংস্কারের পরিধিকে বাড়িয়ে ও জড়িয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করেছেন—গবেষকদের উপজীব্য এই আলোকসম্পাতী বিষয়টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবশ্য গল্পলেখকের কোন কৌতূহল নেই—থাকবার কথাও নয়। যা আছে তা হল, একটি বিশেষ অবস্থায় পড়লে লোকব্যবহারের যে অসম্বৃত বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে তার সম্বন্ধে কিছু হাস্যরস-সৃষ্টি—অপরূপ ভাষাভঙ্গিতে সময়োচিত ভাব-ভাবনার অবিকল অনুবাদে, যা তাদের জীবনের সঙ্গে লেখকের ঘনতর পরিচয়ের সাক্ষ্যবহ নিশ্চয়ই।

অত্যন্ত সহজ সাবলীল সংলাপ ও দু-একটি সরস সতেজ মন্তব্য—যেন তুলির রেখায় এক একটা মূর্তি ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা স্কেচে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না : অন্তর্নিহিত প্রেরণায় সমগ্র একটি ছবির দুর্লভ পরিণাম লাভ করে। সরোজকুমারের লক্ষ্য চিরদিনই এই সম্পূর্ণতা, ঐক্য ও গভীরতার অভিমুখী। তবে দু-একটি গল্পে তিনি কেবল বিস্তারের দিকে ঝোঁক দিয়েও পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। যেমন 'একটি ময়ূর'। কেন্দ্রগত বিষয়টি বিন্দুপরিমাণ। কিন্তু তাকে ঘিরে যে পরিধিটি রেখায়িত হয়ে উঠেছে, তার গুরুত্ব ন্যূন নয়। শহরের কোন বাড়ির ছাদে অচেনা অজানা একটি ময়ূরের আকস্মিক আবির্ভাবে আশেপাশে যে বহুবিচিত্র মানুষের ভীড় ঘনিয়ে উঠল—তাদের খণ্ড খণ্ড কথাবার্তা ভাবভঙ্গি ধ্যানধারণার নানা রঙ মেঘোদয়ে ময়ূরের পক্ষবিস্তারের মতই রমণীয়। বিভিন্ন মনের বিক্ষিপ্ত

ভগ্নাংশগুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতেই এই গল্পটি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি 'মৃত্যুর রূপে' যে স্তব্ধ মুহূর্তরাশি ও আত্মীয়প্রিয়জনদের বিষণ্ণমুখগুলি লক্ষ্য করি—তাদের সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে একটি মৃত্যু-আশঙ্কিতের চেতনাদর্পণে। তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতায় নিকটজনেরা আচ্ছন্ন হয়েই ছিলেন—গল্পের শেষে তাঁদেব রূপ যে স্পষ্ট টানে আঁকা হয়েছে তার কারণ মৃত্যুর স্বরূপ দেখাতে তাঁদের পাণ্ডুর প্রোজ্জ্বলতার প্রযোজন হয়েছিল। প্রথমটিতে কেন্দ্র ময়ূরকে দেখিয়ে পরিধির মানুষগুলিকে নিরলস স্মিতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে পরিধির স্পন্দন ক্রন্দনকে অনুভব করিয়ে কেন্দ্রস্থ মৃত্যু-দর্শনের দুঃসহতাকে নিবিড় করে তোলা হল।

. 'কল্লোল যুগে'র লেখক সরোজকুমার প্রসঙ্গে বলেছেন: 'জীবনের যে খুঁটি-নাটিগুলি উপেক্ষিত, অন্তর্দৃষ্টি [তাঁর] তার প্রতিই বেশি উৎসুক।' ইতিমধ্যেই এর সমর্থন আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও আছে। দাম্পত্যজীবনের অনেক ছবিই এ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে দেখেছি। কিন্তু 'ওপিঠ' এবং 'ক্ষত' গল্পদুটিতে আলোচ্য লেখক সেই জীবনের এতকাল উপেক্ষিত অংশেই আলো ফেলেছেন। স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী পুরুষকে 'ওপিঠ' গল্পের শোভনা যে শান্ত শ্লেষে উপযুক্ত কঠিন উত্তর দিয়েছে, সে জন্যে তার নির্মাতা ধন্যবাদযোগ্য শুধু তাঁর সাহসের জন্যেই নয়, তার প্রকাশযোগ্য পরিবেশ ও অবস্থাকে ঘনীভূত করে তোলার নৈপুণ্যের জন্যেও বটে। কথার পিঠে কথায় ও কাজের পিঠে কাজে কত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতই মাঝে মাঝে শাণিত চোখে ঝিকিয়ে উঠে আমাদের চমকিত ও বিহ্বল করে দিতে পারে, এ তার একটি নমুনা। 'ক্ষত' গল্পে অপুত্রক পত্নীর স্বামীবাৎসল্যের অতিরেক স্বামীর জীবনে কখন কীভাবে গভীর স্থায়ী বেদনা বয়ে আনলো তাকেই আভাসিত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এগুলি সচরাচর চোখে পড়ে না; পড়লেও এদের প্রতি সাধারণত সবাই মনোযোগী হন না। সরোজকুমার কিন্তু এই সব সামান্যের মধ্যেই জীবনধর্মপালনের আগ্রহ ও আবেগ এবং তাদেরই পরিণামী নানা অসুখদায়ক অসঙ্গতির অনিবার্যতাকে আবিষ্কার করেছেন।

মনের তুচ্ছাতুচ্ছ সঙ্কট বা সমস্যাই যদিও কেবল তাঁর পাঠ্য নয়। সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনের বৈকল্যবশত মানুষের শারীরিক ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে প্রবল প্রচণ্ড বীভৎস হয়ে ওঠে। এমন দুর্দিন বাঙলাদেশে সম্প্রতি অনেকবার এসেছে—বিশেষত পঞ্চাশের মন্বন্তরে। সেই কালের ক্ষুধিত বঞ্চিত জীবনের দুটি গল্পও এ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'আগুনে'র মধ্যে ক্ষুধা-ক্ষুব্ধ মানুষ পাশবিকতার কোন স্তরে নামতে পারে—ধীর বিশ্লেষণে তা উদ্ঘাটিত হয়েছে। অবশ্য এখানে ভীষণতম পাশবিকতার পরিচয় আছে, তার সঙ্গে পশু-আচরণ-

কারীর 'অমানুষিক' পূর্ব-ইতিহাস যুক্ত দেখিয়ে লেখক বোধ হয় তাঁর জীবন সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত অসংশয়িত মনোভাবেরই প্রমাণ দিয়েছেন। অবশ্য সমস্যাগত গুরুত্ব হয়ত এর জন্যে খানিকটা হ্রস্ব হয়ে গেছে। ক্ষুধা-তাড়িত ডাকাতের পাশব-বৃত্তির পরিচয় সাধারণ মনে কতখানি ঔৎসুক্যের উদ্রেক করবে সন্দেহ, কিন্তু কোন স্বাভাবিক মানুষকে দিয়ে 'আগুনে'র ভয়ঙ্কর পরিণাম যে ঘটানো হয়নি—তা নিশ্চয়ই লেখকের উন্নততর মূল্যবোধের পরিচায়ক। পঞ্চাশের যুগীয় আরেকটি স্থূল সঙ্কটের গল্প 'ছন্নছাড়া'—নামেই তার প্রমাণ। এতেও ঐ একই মানবমূল্যচেতনা সঙ্কটচিত্রকে অতিধূলির মালিন্য থেকে দূরে—যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেয়েছে। তাই এখানে ক্ষুধার যাতনায় নিজের জীবন বিকিয়ে একহাতে পয়সা এনে মা আপন মেয়েকে গ্লানির জীবন থেকে অন্য হাতে ঠেকিয়ে রেখেছে। ক্লেদ ও ক্লেদহীনতার এমন সহৃদয় অথচ মর্মান্তিক রচনা অত্যন্ত সাময়িক ঘটনাকে নিয়েও সম্ভব হোলো ঐ মূল্যবোধেরই মাহাত্ম্যে।

মানুষের জীবনে সমস্যা অসংখ্য। অসুখী সংসারের দুঃখবৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করে স্বয়ং টলষ্টয় তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের সূচনা করেছেন। এবং আধুনিক যুগের সঙ্কট-বহুলতা মনে রেখেই সম্ভবত লরেন্স তাঁর একটি বহু-আলোচিত উপন্যাসের আরম্ভ করেছিলেন সাম্প্রতিক কালকে 'tragic age' বলে বিশেষিত করে, কিন্তু আমরা যে এই দুর্বিষহ কালকে 'tragically' নিচ্ছি না, তাও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ঘোষণা করেছিলেন। আর এই ভাবেই তো সময় বয়ে চলেছে। মানব-সভ্যতায় জন্ম-জন্মান্তর ঘটছে। যুগ-যুগান্তর। এবং এই সময়স্রোতের টানে সংসারে যে বিপর্যয় আসছে—বিভিন্ন কালপাত্রের বোধে ও ভাবনায় যে সংঘর্ষ, চিন্তাশীল লেখকরা তাকেও গল্পে-উপন্যাসে ব্যবহার করছেন। সরোজকুমারের এইজাতীয় একটি অবিস্মরণীয় গল্প 'বনস্পতির দুঃখ'। পিতার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানদণ্ডে পুত্রদের জীবনাচরণ বিশৃঙ্খল ঠেকে, তার জন্যে তিনি দুঃখবোধ করেন—কিন্তু নিরুপায়ভাবে সব তাঁকে সহ্য করতে হয়, আপন আদর্শে নিরুপদ্রব ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাঁর ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল ভাবেন —'আশ্চর্য এই যুগ! মানুষ যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। পুত্রপৌত্র নিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার উপায় নেই।' পুত্রদেরও কিছু করবার নেই। স্ব স্ব ভাবে তারা পরিণতি খুঁজছে, পাচ্ছেও হয়তো। পিতার জন্যে বড়জোর দুঃখবোধ করে। কিন্তু 'পৃথিবী যে ছোট হয়ে আসছে', দিকে দিকে 'দ্রুত পরিবর্তন'; তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদেরও যে চলতে হবে—তাই তারা চলেছে—স্থবির পিতার স্বপ্ন-রচনায় অংশ নিতে পারছে না। পারবেও না। অগত্যা

সন্ধ্যার পৃথিবীতে যখন প্রাচীন চাঁদ দেখা দেবে, লেখক এই বৃদ্ধ মানুষটির দরদী হিসেবে একমাত্র তাকেই আশা করছেন। লেখকের গভীর সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শে গল্পের শেষ দিকটা তাই যেমন আবেগে মন্থর, তেমনি আন্তরিকতায় জমাট। এখানে কবিধর্মের সমীপবর্তী হয়েছেন লেখক : তাই এই বিষণ্ণ বর্ণনা : 'আতাগাছের দিকে অন্ধকার যেন আলকাতরার মতো জমাট বাঁধবে। কে জানে আজ কি তিথি। চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠবে কিনা। ওঠে যদি, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে।' অথবা একেবারে শেষে একই বাক্যাংশের এই অর্থপূর্ণ পুনরাবৃত্তি : 'ওঠে যদি আজ বাঁকা চাঁদ, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে······সে হয়তো বুঝবে।' বাঙালী চরিত্রের সাংসারিক আসক্তি যদি এই গুণান্বিত আদ্রতার জন্যে দায়ী হয়, সেই একই স্বভাবের উদার বৈরাগ্যপ্রবণ দিকের ভূমিকাও তবে অন্য কোনো গল্পের নিষ্করুণ পরিসমাপ্তির জন্যে নিশ্চয়ই স্বীকার্য। আর সেই গল্প হোলো 'নিবারণের মৃত্যু'—দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেদনের প্রসারে এবং গভীরতায় এর স্থান শুধু বাঙলা গল্পসাহিত্যে নয়, বিশ্ব-গল্পসাহিত্যেও স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠের মধ্যে অবিসম্বাদিরূপে নিশ্চিত হতে পারে। বৃহৎ পৃথিবীতে কোনো এক সাধারণ নিবারণনামা ব্যক্তির মৃত্যু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, তার স্ত্রী-সন্তানের ছোট সংসারে কোনোমতেই তার অভাব যে সামান্য নয়, এ যেমন অত্যন্ত সরল সত্য, তেমনি স্ত্রী-সন্তানের নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে জনৈক নিবারণ যতই অবিচ্ছেদ্য হোক, শতাব্দী-প্রাচীন অসংখ্য মানুষের কলরবে মুখর উন্মুক্ত আকাশ আলিঙ্গিত আদিগন্ত জগতে তার বাঁচা ও মরার ইতিহাস যে কিছুমাত্র নয়, তাও তেমনি এক কঠিন সত্য। এই দুই অত্যাজ্য সত্যের মুখোমুখি হতে গিয়ে আলোচ্য লেখকের জীবনদর্শন ও রচনা-কৌশলগত প্রতিভা এক চরম অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'বনস্পতির দুঃখে' গতি আর স্থিতির সংঘাত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 'নিবারণের মৃত্যু'তে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের গতি বৃহত্তর জাগতিক জীবনের গতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং প্রথম দ্বিতীয়ের সাথে তুলনায় পদে পদে পরাজিত হচ্ছে। 'নিবারণের মৃত্যু' সেই পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। ট্রেনের হকার ছিল নিবারণ। সেই নিবারণের জীবন্ত পরিচয় এ-গল্পে যখন অবসিত হোলো মৃত্যুতে এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গটি যখন চলমান ট্রেনের গতির দ্রুততালে বাজতে লাগলো, তখনই বুঝলাম বিষয়ে আর বিন্যাসে কী অমোঘ সামঞ্জস্যই না অনায়াসে রচিত হয়েছে,—কত সহজেই না প্রকরণে ও প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্গতি তৈরি হয়ে গেল। তাছাড়া নিবারণের

শিয়রে মৃত্যুর নিশ্চিত পদক্ষেপ শুনতে পেয়েও কেন তার স্ত্রী নির্জন ডোবার জলে দাঁড়িয়ে তার দুঃস্থ অবরুদ্ধ সংসারে জীবনের সমস্ত বর্তমান ক্লেশ ও ভবিষ্যৎ দুঃখ সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়ে যায় ও আবার কেমন করে যে সে চেতনার জগতে ফিরে এসে তার ভাগ্যের সাথে যুদ্ধে তৈরি হতে থাকে তা লেখকের গভীর জীবনবোধের স্মারকরূপে এখানে পাঠকের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ডোবার জলে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিবারণের স্ত্রী তরুবালা যেমন সংসারের সুখদুঃখ থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তারপর ঘোষাল-গিন্নির কণ্ঠস্বরে জেগে উঠে আবার রূঢ় পৃথিবীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, লেখকের ভাষায় তার চোখে যে ভাবে তখন 'বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ'—ঠিক তেমি অথচ তার চেয়েও সচেতন, স্থায়ী ও বিশুদ্ধ আত্মবিস্মৃতি এবং অনেকটা তার মতই মানবসংসার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যপূর্ণ অনুরক্ত দৃষ্টি যে কোনো সৎ শিল্পীর সহজাত হওয়া চাই। সরোজকুমার সেই শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম। এবং তাঁরই যাদুকর লেখনীর প্রভাবে তরুবালা, এম্নিতে সে যত সামান্যই হোক, অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্যে শিল্পী-মানসিকতার স্বর্গলোক লাভ করেছিল। কিন্তু সেই স্বর্গবাস তার স্থায়ী হয় নি। কেননা সে মর্ত্যজীবনে স্বাভাবিক নিয়মেই একান্ত আসক্ত। তার আত্মবিস্মৃতি কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্তের জন্যে।

এম্নি আরো বহু প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতবিশিষ্ট সফল গল্প-উপন্যাসকারের পক্ষে অক্ষয় এ শিল্পী-স্বর্গবাস অবশ্যই তর্কাতীত। কেননা সূক্ষ্মকৌতুক ও স্নিগ্ধ করুণের চিত্রণে তথা গভীর ব্যাকুল আত্মবিনিয়োগ ও সহজ কঠিন আত্মবিস্মৃতি উভয়তই সরোজকুমার তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথমাবধি সমান সার্থককাম। আর তাঁর বিশিষ্ট মনঃশক্তির মূলে চিরকালের বাঙলাদেশের আকাশ ও মাটি অবিরাম রস সঞ্চার করে চলেছে।

কলকাতা,
চৈত্র ১৩৬২ ॥

সুনীলকুমার নন্দী
নিখিলকুমার নন্দী

প্রকাশের অপেক্ষায়

এই লেখকের নবতম উপন্যাস

তিমির-বলয়

দেহযমুনা

করুণা লিখিল :

প্রিয়তমাসু,

এতদিন তোমাকে চিঠি লেখবার সময় পাইনি। এদিকে আমার ভায়ের ছেলেটি মর-মর, ওদিকে সতীর কঠিন অসুখ। যম বোধ করি, সতীকে নিয়ে ননদকে রেহাই দিলেন।

কিন্তু এমন অসুখও কখনও দেখিনি। ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ কিছু আনতেই তার দাদা বাকি রাখেন নি। কিন্তু কি যে রোগ কেউ ঠাহর করতেই পারলেন না। সাত দিনের জ্বরে সতী আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

সে কি মৃত্যু! সামনে না দেখলে বলা চলে না। বেচারী পনের বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল,—তার পরে যে দেখেছে সেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, হতভাগী। আমরাই কি দুঃখ কম করেছি? তার মুখের পানে চাইতে পারিনি।

মৃত্যুর পরে সেই মুখের পানে যে চেয়েছে সেই বলেছে, ভাগ্যবতী বটে! সেই সুন্দর, হাসিমাখা মুখ! কোথাও এতটুকু ব্যথার চিহ্ন নেই। পৃথিবীর কোনো কলুষ যেন তাকে কখনও স্পর্শ করে নি। ঠিক যেন এই ঘুমুল।

স্বামী সৌভাগ্যের গর্ব আমরা করি। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করি। কিন্তু ওর প্রাণহীন দেহের পা-তলার দিকে দাঁড়িয়ে যেন নিজেকে অতি ছোটই মনে হল।

মনে হল, এমন মরণ ক্কচিৎ কারও হয়।

যত মেয়ে তখন এসে জুটেছিল, তাদের সকলেরই তো মুখের পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু ওর মতো মুখ তাদের কারও নয়। নাই বা রইল সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কাঁকন, দুপায়ে আলতা,—তবু কত সুন্দর! ওর সতী নামটি সার্থক হয়েছে।

সতীর জন্যে দুঃখ করিনে ভাই, সে ভালোই গেছে।

প্রার্থনা করি, তার পুণ্যে তার স্বামী যেন তারই লোক পায়।

আজকে এই থাক। তোমার ছেলেমেয়েদের আমার স্নেহ-চুম্বন দিও। তোমরা আমার ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমাদেরই বাল্যসাথী করুণা

ইহার উত্তরে অলকা লিখিল :

প্রিয়তমাসু,

ভাই করুণা, সতী যে এমনি অকস্মাৎ আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবে, এই আশঙ্কাই আমি বরাবর করতাম। কিছুদিন আগে সে আমাকে যে চিঠি দিয়েছিল, তাতে লিখেছিল, প্রতিনিয়ত যেন তার স্বামী তাকে ডাকছে। বুঝি তার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে।

ওঁকে তো জান? যৌনতত্ত্ব পড়ে পড়ে যা-কিছু পান, যৌনতত্ত্বের যাঁতিকলে ফেলে তারই মূল্য নির্ণয় করেন। এই কথা ওঁকে বলতেই হেসে বললেন, পুরুষের সঙ্গবিবর্জিত বাইশ বছরের নারী এমনই স্বপ্ন দেখে।

দেখুক। কিন্তু যৌনতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে আমি ওর সতীত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে দেব না। গর্ব যদি কোথাও আমাদের থাকে সে সতীত্বের এবং মাতৃত্বের। বিজ্ঞান এসে সেই দিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে, তা আমরা সইতে পারব না।

আমাদের চেয়ে যৌনতত্ত্ব তো সতীকে বেশি চেনে না। তার সকল কথা, সকল কাজই যে মনে গাঁথা রয়েছে।

মনে পড়ে, তাদের বাড়ির পেছনের বাগানটিতে কত খেলাঘরই না পেতেছি, কত পুতুলের বিয়েই না দিয়েছি, কত চড়ুইভাতিই না রেঁধেছি। দুষ্টুমির জন্যে বকুনিই কি কম খেয়েছি? হায়রে, সে চঞ্চলতা আজ কোথায়!

তবু তো আমাদের মধ্যে আজও কিছু চঞ্চলতা বেঁচে আছে,—সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সেদিনও একটা কাচের গেলাস ভাঙার জন্যে উনি হেসে বললেন, তোমার এখনও চঞ্চলতা গেল না। মনে মনে বললাম, এ আর কি চঞ্চলতা তুমি দেখলে! ছেলেবেলায় তো দেখনি!

চঞ্চলতা আজও কিছু আমাদের আছে। কিন্তু গেলবারের আগের বছর গিয়ে দেখলাম, ও যেন ওর সর্বাঙ্গ থেকে সমস্ত চঞ্চলতা গুটিয়ে নিয়েছে। হাসলে, কথা কইলে, এঁর কথা নিয়ে কত রসিকতা করলে, তবু যেন কিছুতে ওর নাগাল পাওয়া গেল না।

বললাম, চল্ বাগানে যাই।

সে বাগান আর নেই ভাই। করবীগাছটি তেমনি ফুল দেয়, রজনীগন্ধার ঝাড় যেন আরও বেড়েছে, পূব কোণের নিমগাছটিকে বেষ্টন করে যে মাধবীলতাটি উঠেছিল সেটিও ঠিক তেমনি আছে। সবই সেই আগের মতো, তবু যেন সে বাগান নয়। আমাদের মত তেমন করে উল্লাসে—কলরোলে বাগান মাতাতে আর কে পারবে?

প্রথমটায় একটু বাধছিল বৈ কি। তবু শক্ত হয়েই প্রশ্ন করলাম। যে আতাগাছগুলির ঝোপের মধ্যে সকাল বেলায় কাঁচা পেয়ারার শ্রাদ্ধ করতাম তারই নিচে ব'সে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, কি তোর ব্যথা আমায় বল সতী।

সতী আশ্চর্য হয়ে বললে, ব্যথা কিছু নেই তো ?

আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়ে রইলাম। সে দৃষ্টির পানে একটু-খানি চেয়ে ও বোধ করি কথাটা বুঝলে। চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে-ধীরে বললে, কষ্ট মাঝে-মাঝে হয় বৈ কি! ওঁর মুখ মনে করতে চেষ্টা করি। ঠিক মনে করতে পরি নে। ওঁর বাঁ চোখের তারার পাশে একটা তিল ছিল। তাই চোখ দুটি মনে পড়ে। আর কিছু না।

কি যেন একটু ভাববার চেষ্টা করলে। তারপর শ্রান্তভাবে বললে, দাদা বলেন, সমস্তক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকতে। দাদাকে তো তুমি জানো—

– জানি। হরগৌরী দেখিনি, কিন্তু তোমার দাদাকে আর বৌদিকে দেখে অনুমান করতে পারি।

কি ওর মনে হচ্ছিল কে জানে, হঠাৎ বললে, তোর কোলে মাথা রেখে একটু শুই। শোব ?

কোলের ওপর মাথাটি নিতেই কেঁদে ফেললাম। ওর ছোট-ছোট ছাঁটা কোঁকড়া চুলের ওপর গালটি রেখে কতক্ষণ কাঁদলাম জানি না। নিজেকে ওর সামনে আর যেন শান্ত রাখতে পারছিলাম না।

ও কিন্তু কাঁদলে না, কিচ্ছু না,—শুধু দূরের কাঁঠাল-চাঁপা গাছটির পানে স্থির হয়ে চেয়ে রইল।

তারপরে বলতে লাগল, দিনরাত্তির কাজ নিয়েই তো ব্যস্ত থাকি। তবু সব সময় কি তাই পারা যায় ? মানুষ তো,—যন্ত্র তো আর নই।

সতী শ্রান্তভাবে একটু হাসলে।

বললে, রাত্রে ওঁর অস্পষ্ট মুখখানি ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ি। দিনের পরিশ্রমে একটুতেই ঘুমিয়ে যাই, ভালো ক'রে ভাববার, ধ্যান করবারই বা সময় পাই কৈ ?

অনেকক্ষণ পরে বললে, এই দেহটাকে নিয়ে আর পারিনে অলকা। এর পরমায়ু যে কবে শেষ হবে কে জানে !

এমন সময় ওর বৌদি তাঁর ছোট বাচ্ছাটিকে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উপস্থিত।

বললেন, ওমা তুই এখানে বসে রয়েছিস ? তোর মটরু তো বাড়ি তোলপাড় ক'রে তুলল। কি ছেলেই তৈরি করেছিস্ সতী !

তোলপাড় করার ছেলে বটে! ভারি সুন্দর ছেলেটি, না?

সতী শ্রান্তভাবে তাকে কোলের দিকে টেনে নিলে।

বৌদি আমার দিকে চোখ টিপে হাসলেন। ভাবটা, সতীর মনকে বাঁধবার এইটিই হল সোনার শিকল।

মটরু আবোল-তাবোল অনেক কথা বকে চলল। কিন্তু সতীর মনটা কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল, তাই সে বিশেষ সাড়া দিলে না।

সেবারে এই পর্যন্ত। আর তো দেখা হয়নি। কিছুদিন আগে একখানা চিঠিতে লিখেছিল, কি তার নাকি অনেক কথা ছিল। সে কথা আর শোনা হল না। চিঠিতে সব কথা লিখতে বলেছিলাম। লিখেছিল, চিঠিতে লেখার কথা নয়। কি কথা কে জানে?

সতীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়েছে। এঁকে বললাম। বললেন, বেশ তো।

আমি মাসখানেকের মধ্যেই যাব। ততদিন ভাই তোমাকে থাকতেই হবে।

আজকে এই থাক। দেখা হলে সব কথা হবে।

তুমি আমাদের ভালবাসা নাও। ছেলেমেয়েদের স্নেহচুম্বন দিও। ইতি—

তোমাদেরই বাল্যসাথী অলকা।

কিন্তু যে কথাটি দু'জনের কেউ জানে না, যে কথাটি ওর কাছে কারও জানাইয়া যাওয়া হয় নাই, সে কথাটি এই:

সতীদের সংসার বড় নয়—তার দাদা, বৌদি আর তাঁদের গুটি তিনেক ছেলে এবং সে নিজে।

বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির চিঠি প্রথম-প্রথম কয়েকখানি পাইত, তাও বৎসর খানেকের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির সহিত সম্পর্ক লোপ পাইল।

দাদা তার অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ। হাঁ এবং না ছাড়া ক্বচিৎ কোন কথা তিনি বলেন। অথচ এই বাড়ির সকলেই বোঝে, তাঁর ছোট-বড় প্রত্যেক অনুশাসনটিই সকলের মানিয়া চলা চাই। কথা তাঁর স্বল্প কিন্তু অমোঘ।

ছেলেদের বাদ দিলে বাকি যে ব্যক্তিটির সঙ্গে সতীকে কারবার করিতে হয়, তিনি বৌদি। তাঁর মাথার কাপড় সামলাইতে গেলে আঁচল খসিয়া পড়ে এবং আঁচল সামলাইতে গিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া যায়। একদিকে আপনার পরিধেয়, অপরদিকে ঘর-কন্নার কাজ—এই দুই দিকের আক্রমণে প্রায়ই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ

ভাঙিয়া যায়। তখন সামনে যে ছেলেটি পড়ে তাহাকেই দুই ঘা কসিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হন।

ফলে, বড় দুইটি ছেলে হাঁটিতে শিখিবার পর হইতে বাহিরের ঘরে বাপের কাছে আশ্রয় লইয়াছে। অতএব নিরুপায় হইবার কথা মটরুর। কিন্তু সে এখনও মার খাইবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং বৌদিরই বিপদ হইয়াছে বেশি, রাগের সময় হাতের কাছে কাহাকেও পাওয়া যায় না।

মটরুর নিরাপদ হইবাব আরও একটা কারণ আছে। বৌদি অকস্মাৎ একদিন আবিষ্কার করেন, সন্তান যার নাই সে নারী বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া!

•সে রাত্রে সতীর দিক দিয়া এই সমস্যাটি তিনি যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই রক্ত মাথায় উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার মটরু আছে যে!

পরের দিন মটরুকে তিনি সতীর হাতে দান করিলেন।

সতীর অগোচরে বুঝি কিসের ক্ষুধা তার মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। মটরুকে পাওয়ার পর হইতে সেই ক্ষুধার আগুন যেন ইন্ধন পাইল। এতদিন সে হাসিত, খেলিত, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিত এবং অবসর সময়ে বৌদির দোষ ত্রুটি ধরিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিত। অতঃপর সে কাজকর্ম চুলায় দিয়া মটরুকে লইয়া তেতালার ঘরে আশ্রয় লইল। নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলিয়া যাওয়ার উপক্রম।

তখন সতীর বয়স সতেরো।

শিশু যেমন নূতন খেলনা পাইলে না-ভাঙ্গা পর্যন্ত সেটিকে নিষ্কৃতি দেয় না, তেমনি আদরে-আব্দারে, চুম্বনে-আলিঙ্গনে বিব্রত হইয়া মটরু না কাঁদিয়া ফেলা পর্যন্ত সতীর তৃপ্তি হয় না। তখন আবার তাকে শান্ত করিবার উপায় উদ্ভাবনে মন দেয়।

আশ্চর্য এই, মটরু কাঁদিলেও ভালো লাগে, হাসিলেও ভালো লাগে। রাত্রে মটরু মায়ের কাছেই থাকে। পাশের ঘরে শুইয়া শুইয়া সতী প্রহর গোণে। ভোরের প্রত্যাশায় একবার ঘুমাইয়া, একবার জাগিয়া রাত্রি যাপন করে।

এমনি বিনিদ্র রাত্রে সে প্রথম টের পাইল, দিনের বেলায় বৌদি যতই দাদার ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরে থাকুন এবং দাদাও যতই গম্ভীরভাবে বাহিরের ঘরে থাকুন, সমস্ত রাত্রি ইঁহারা কি-যে ফিসফাস, কি-যে হাসাহাসি করেন, তার যেন আর শেষ নাই।

ভোরের দিকে ও ঘরের দ্বার খোলার শব্দ পাওয়া মাত্র সতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে এবং জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত মটরুকে যে অবস্থায় পায় সেই অবস্থাতেই টানিয়া তুলিয়া এ ঘরে লইয়া আসে।

ব্যাপার দেখিয়া দাদা পাশ ফিরিয়া মুখ টিপিয়া হাসেন।

সতী মটরুর মুখ ধোয়াইয়া, চোখে কাজল দিয়া টিপটি কাটিয়া দেয়। নূতন পোষাক পরাইয়া দেয়। কিন্তু ছেলের চোখের কাজল তো ? একবার কাঁদিলেই, ব্যাস। এক কাজলই সতীকে দশবার পরাইতে হয়। মটরুটাও দুষ্টু কম নয়। সম্ভবত ইচ্ছা করিয়াই সে বারম্বার পোষাক নষ্ট করে। দিনের মধ্যে দশবার সতী তেতালা হইতে জানাইয়া দেয়, এমন দুষ্টু ছেলে সে ভূ-ভারতে দেখে নাই।

এদিকে যখন ব্যাপার এইরূপ, তখন বাহিরের ঘরে আর একটা সমস্যার আবির্ভাব হইল।

দাদা দেখিলেন যে, বড় ছেলে দুটি মায়ের কাছ হইতে নিরাপদে থাকিলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বড় নিরাপদ নয়। লেখাপড়া বলিয়া যে কার্যটি প্রত্যেক ভদ্রসন্তানের অবশ্য কর্তব্য, সেদিকে ইহাদের তেমন প্রীতি নাই। পক্ষান্তরে, তাম্রকূটের প্রতি একটা কৌতূহল ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ভয়ে দিবারাত্রি অস্থির, বোন মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করে না। কিন্তু বয়স্ক যাহার সন্ধান পায় নাই, এই দুইটি শিশু, কেমন করিয়া জানি, সেই দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে মোটেই ভয় করে না।

সুতরাং ও-পাড়ার কৃষ্ণকিশোরকে মাসিক তিন টাকা বেতনে ছেলে দুটিকে পড়াইতে নিযুক্ত করা হইল।

কৃষ্ণকিশোর ছেলে ভালো, বয়সও অল্প। বছর দুই পূর্বে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া গ্রামের মাইনর স্কুলে মাস্টারি করিতেছে। শিশুকাল হইতেই এ বাড়িতে তাহার অবাধ যাতায়াত।

কৃষ্ণকিশোর আসাতে ছেলে দুটির না হোক, বৌদির অশেষ সুবিধা হইল।

মটরুকে পাওয়ার পর হইতে সতী আর বড় নিচে নামে না। বৌদিকে একাই রান্নাবাড়া সমস্ত করিতে হয়।

তা, পরিশ্রম করিতে বৌদির আলস্য নাই, বরং বসিয়া থাকিতেই কষ্ট হয়। কিন্তু একা কোনো কাজ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন না। ব্যস্তবাগীশ মানুষ, সর্বদাই চরকার মত ঘোরেন। ইহার মধ্যে তরকারিতে নুন দিয়াছেন কিনা সব সময় মনে করিয়া উঠিতে পারেন না। একজন সহকারী তাঁর সর্বদা হাতের কাছে চাই।

তবে কৃষ্ণকিশোর আসাতে তাঁহারও যে কাজ বাড়ে নাই তা নয়।

পাঁচজনকে খাওয়াইবার বদ অভ্যাসটি বৌদির কেমন মজ্জাগত হইয়া গেছে। যথাসময়ে নয়, যথাসময়ের অনেক পরে অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া যায়, অমুকের খাওয়া হয় নাই। অমনি তার জন্য তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়।

হয়তো নটার সময় হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাইতো, সকাল থেকে ছেলেটা পড়াইতেছে, এখনও তো তাহার জন্য চা পাঠানো হয় নাই। অমনি, ডাক কৃষ্ণকিশোরকে। বল্, চা খেতে আসুন।

কৃষ্ণকিশোর আসিল। বলিল, কি বৌদি ?

—চা খেয়েছ ?

কৃষ্ণকিশোর মাথা চুলকাইতে লাগিল। পরের বাড়ির চা,—পাই নাই বলিতেও লজ্জা হয়, পাইয়াছিও বলা যায় না।

বৌদি রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিলেন, এসেছ তো অনেকক্ষণ। একবার ভেতরে এসে খেয়ে গেলেই তো পারতে। আমার কি সব সময় খেয়াল থাকে ? চেয়ে খেয়ে যেতে হয়।

তারপর তাকের উপর হইতে চায়ের এবং চিনির কৌটা নামাইলেন। কি সর্বনাশ! চায়ের কেৎলী কোথাও পাওয়া গেল না। বৌদির মাথা গরম হইয়া উঠিল।

অথচ চিৎকার করিবার উপায় নাই, পাছে এত বড় দুর্ঘটনা স্বামীর কর্ণগোচর হয়।

বৌদি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, এই একটু আগে তিনি এইখানে কেৎলী নামাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাঁচ মিনিটের জন্য দোতালায় একবার গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, আর নাই।

এক বাটি চা-পানের যে এত বাধা তাহা কৃষ্ণকিশোর জানিত না।

সর্বত্র খুঁজিয়া বৌদি হয়রান হইয়া পড়িলেন। তেতালার উদ্দেশে হাঁক দিয়া শুধাইলেন, ও সতী, কেৎলীটা এইখানে রেখেছিলাম, জানিস ?

সতী তখন খাটের উপর শুইয়া মটরুকে বুকের উপর দাঁড় করাইয়া আদর করিতেছিল। বলিল, জানি।

বৌদি উল্লাসে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে গিয়ে আঁচল খসিয়া পড়িল। পরিধেয় বস্ত্র সামলাইতে সামলাইতে বৌদি বলিলেন, কোথায় রেখেছিস বল্ লক্ষ্মীটি। কৃষ্ণকিশোরকে চা দিতে পাচ্ছি না।

সতী তেতালা হইতে উত্তর দিল, আমার মাথার ওপর আছে, নিয়ে যাও।

অবাক কাণ্ড!

এমন সময় কৃষ্ণকিশোর আবিষ্কার করিল, কেৎলী উনানের পাশে আছে।

বাঁচা গেল। বৌদি উনানে কেৎলী চাপাইয়া বলিলেন, তাইতো বলি, কেৎলী যাবে কোথায়? আমি তো তোমাদের বললাম, আমি উনোনের পাশেই রেখেছিলাম। তা, তোমরা তো কেউ খুঁজলে না।

খুঁজে নাই সত্য। কিন্তু উনানের পাশে কেৎলী রাখার কথাই বা বৌদি কখন বলিলেন, তাহাও কৃষ্ণকিশোর স্মরণ করিতে পারিল না।

অতঃপর কৃষ্ণকিশোরের ডাক আরও ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। হারানো জিনিস খুঁজিয়া দিতে যে কৃষ্ণকিশোর অদ্বিতীয়, এ ধারণা বৌদির মনে বদ্ধমূল হইল।

এমনি করিয়া বছর যায়।

মটরু হাঁটিতে শিখিল, কথা কহিতে শিখিল এবং আরো কিছুদিন পরে বাহিরের ঘরে পর্যন্ত হানা দিয়া দাদাদের বই ছিঁড়িয়া দিয়া আসিবার শক্তিও অর্জন করিল।

অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে। তাহাকে সামলানো সতীর কাজ নয়।

নারীর কোলে চড়িয়া বেড়াইতে আর তাহার ভাল লাগে না, ঘরের মধ্যে বিচরণ করিতেও মন বসে না। তাহার বাহিরময় খেলিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা। খাওয়ার সময় ক্ষুধা পাইলে ভিতরে আসে, খাওয়া শেষ হইলেই বাহিরে পলাইয়া যায়। সতী ডাকিলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরের দিকে দৌড় দেয়।

এখন তাহার বাবার সঙ্গে ভাব।

শিশুচরিত্রে ইহা কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু পরের ছেলের এই অকৃতজ্ঞতা সতীকে বিঁধিল। তাহারও কেমন একটা নিস্পৃহতা আসিল। মনে হইল, পরের ছেলেকে দিয়া মাতৃহৃদয়ের সাধ মিটাইতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নাই। পরের ছেলে কখনও আপন হয়? তবে আর বলে কেন, 'পরের ছেলে খায় আর বন পানে পানে চায়'। সতী মটরুকে জোর করিয়া বুকে টানিয়া লইবার উৎসাহ বোধ করিল না। বরং নিজেই সরিয়া দাঁড়াইল।

আবার তাহার দিন কাটা ভার হইল। তেতালার বাসা ভাঙিয়া দিয়া আবার সে রান্নাঘরে হাতাবেড়ি ধরিল। সেখানে তখন কৃষ্ণকিশোরকে লইয়া

বৌদি বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। সতীর কাছে ইহাদের সঙ্গ মন্দ লাগিল না।

কৃষ্ণকিশোর বিধবা মায়ের ন্যাওটা ছেলে। ঘরকন্নার কাজে মেয়েদের কান কাটিয়া দিতে পারে। ছেলে পড়ানোর চেয়ে বৌদির গৃহস্থালী গুছাইয়া দেওয়ার কাজেই তার আনন্দ বেশি। সুতরাং মিনিট দশেকের মধ্যে নমোনমঃ করিয়া ছেলে-পড়ানো সারিয়া চা-পানের অছিলায় সেই যে ভিতরে আসে, দশটার আগে আর বাহির হয় না। রবিবারে তো এইখানেই খাওয়া দাওয়া।

সতী দেখিল, কৃষ্ণকিশোরের মতো গল্প বলিতে কেউ পারে না। একবার সে গল্প ফাঁদিলে আর উঠিয়া আসা শক্ত।

গল্প জমে রবিবারের দুপুরে বৌদির ঘরে। বৌদির যে গল্প শোনার সখ বেশি তা নয়। কিন্তু পাশে বসিয়া কেহ গল্প করিলে তাঁহার হাতের সুঁচ চলে ভালো। আগ্রহ সেইখানে।

তিনটি লোকের সভা। তার মধ্যে সভানেত্রী উদাসীন। সুতরাং কথা চলে আসলে সতী আর কৃষ্ণকিশোরের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে?

প্রথমে কেউ জানিলও না। আত্মভোলা কথকটিও না, ভাবমুগ্ধ শ্রোতীটিও না। যখন জানিল, তখন অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে।

তখন রবিবারের দুপুরে কথকটির সভায় আসিতে সঙ্কোচে বাধে। মাঝে মাঝে জোর করিয়া আসেও না। কিন্তু সে না আসিলে বৌদির কাঁথা সেলাই এগোয় না। ডাকের পর ডাকে শেষে আসিতে হয়। কিন্তু তেমন করিয়া আর গল্প জমে না। কথা-নির্ঝরিণীর উৎসমুখে কোথায় যেন একটা পাথর আটকাইয়া গেছে,—স্রোত আর তেমন স্বচ্ছন্দগতিতে খেলে না।

বৌদি বলেন, তোমাদের ইস্কুলে সেই পণ্ডিতটি আছেন, যিনি চেয়ারে বসলেই হাঁ করে ঘুমোন, আর ছেলেরা মুখের মধ্যে ছোট ছোট বিস্কুট ফেলে দেয়?

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গে কৃষ্ণকিশোরের বিশেষ একটা আগ্রহ ছিল। তবু শুধু একটু হাসিয়া বলিল, আছেন।

বৌদি বলিলেন, পণ্ডিত মশায়ের গল্প তুই শুনিস নি সতী। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়। মা গো মা, কি দুষ্টু ছেলে সব!

সতী কিন্তু চোখ নিচু করিয়া বসিয়া থাকে। গল্প শুনিবার জন্য কৃষ্ণকিশোরকে কোনো জেদ করে না।

এমন করিয়া কয় দিন সভা চলে? বৌদির শত চেষ্টাতেও সভা আর টিকিল না। কৃষ্ণকিশোর সকাল বেলায় এক সময় আসিয়া মুখ নিচু করিয়া চা খাইয়া চলিয়া যায়। সতী তখন তেতালার ঘরে আহ্নিক করে।

সূক্ষ্ম জিনিস বৌদির চোখে পড়ে না। মানুষের পানে যখন তিনি তাকান, তখন তার সমগ্র দেহের পানেই তাকান। কিন্তু সেদিন সতীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন: ও কি চেহারা হয়েছে তোর সতী? মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোর কি অসুখ হয়েছে?

এ প্রশ্নের পরে বৌদির পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, অসুখ আবার কি হবে? তোমার যেমন—

বহুদিন সতী আয়নায় মুখ দেখে নাই। নিজের ঘরে গিয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। বিছানায় উপুড় হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, আর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কেবলই মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমি আর পারি না। এ-মুখ আমি বাইরে কেমন করে দেখাব?

কিন্তু সতীর ফাঁকা ফাঁকা কথায় বৌদি শান্ত হইলেন না। যে-স্বামীকে তিনি সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলিতেন, তাঁহাকেই অসময়ে ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দাদা ভিতরে আসিতেই বৌদি অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বাইরের ঘরে তো দিনরাত্রি বসে থাক, এদিকে সতীর যে অসুখ তার খবর রাখো?

বৌদির ক্রোধ দেখিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, সতীকে দুমাস তো চোখেই দেখিনি। সে কোথায় থাকে?

বৌদি ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তাকে দেখবে না, আমি তাকে দেখব না, তা হলে সে কি করে বাঁচে? তার আর কে আছে?

দাদা বলিলেন, কি হয়েছে? জ্বর?

এবারে বৌদির রাগ পড়িল সতীর উপর। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, কি হয়েছে মুখপুড়ি তা কি, কাউকে বলে! কত সাধ্য সাধনা করলে তবে একবার নিচে এসে একমুঠো খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করেন।

অপ্রস্তুতভাবে দাদা তেতলায় চলিলেন।

বারান্দায় তাঁর পায়ের শব্দ পাইয়া সতী তাড়াতাড়ি আপাদমস্তক একখানা বিছানার চাদর মুড়ি দিল। অপরিসীম লজ্জায় তাঁহার মনে হইতেছিল, ধরণী যদি দ্বিধা হয়, সে তার মধ্যে মুখ লুকাইয়া বাঁচে।

দাদা প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে রে সতী?

লজ্জায়, দুঃখে তার তখন কান্না পাইতেছিল। কথা কহিবার শক্তি নাই। কোনোমতে ঘাড নাড়িয়া জানাইল, কিছু হয় নাই।

—কিছু হয়নি তো অমন করে পড়ে আছিস কেন?

• সতী কপালে হাত দিল।

দাদা বলিলেন, মাথা ধরেছে? তাই বল।

দাদার সুমুখে সতী জীবনে কখনো মিথ্যা কহে নাই। কিন্তু আজ কহিল।

দাদা নিচে নামিতে নামিতে বলিলেন, আচ্ছা আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আসিলেন বৌদি। সতীর মাথাটি কোলে করিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইতেই সতী তাঁর কোলের উপর মুখ গুঁজিযা কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বলিল. তোমরা সবাই মিলে কেন আমার পিছনে এমন করে লাগলে? আমি বলছি, আমার কিছু হয় নি।

বৌদি জোর করিয়া আর একবার সতীর মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন।

যা ভাবিয়াছিলেন, তাই। ক্ষুধার্ত দুটি চক্ষু কোটরের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, গাল দুটি পাণ্ডুর। চোখ তুলিয়া সতী চাহিতে পারে না।

তার মাথাটি কোলে করিয়া মায়ের মত স্নেহময়ী বৌদি মৃত্যু ছাড়া তার জন্য অন্য কিছু কামনা করিতে পারিলেন না।

সত্যই তো, যে নারী পুরুষকে ভালবাসা দিবে না, পৃথিবীকে সন্তান দিবে না, তার মৃত্যুতে কার কি ক্ষতি?

সে যাত্রা সতী কিন্তু মরিল না। শরতের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার আগের মতো সমস্তদিন ঘর-কন্নার কাজ করে, তবু যেন ঠিক আগের মানুষটি নয়। দেখিলে মনে হয়, পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা, দেবতার বরে কোনো কৌশলে দেহের লাবণ্য আজও জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বোঁটা-ছেঁড়া জলে-ভেজা গোলাপের দেহে যে লাবণ্য দেখা যায়, এ যেন তাই।

দেহযমুনায় দুর্দিনের বানডাকা শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হইল।

সতী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, আর রাত্রে নিভৃতে একান্ত গোপনে স্বামীর অস্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করে।

পাশের ঘরে দাদাতে-বৌদিতে সমস্ত রাত্রি কি যে হাসাহাসি চলে, তাঁরাই জানেন।

ক্বচিৎ কখনো গভীর রাত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতে গিয়া সতী দেখে, বাহিরের মস্ত বড় উঠানে চাঁদের আলোয় দাদা এবং বৌদি পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া একটা বড় বেঞ্চে ঠায় বসিয়া আছেন। সতীর দ্বারখোলার শব্দেও তাঁহাদের চৈতন্য ফেরে না।

সতী আর্তস্বরে স্বামীকে ডাকিয়া বলে, আমায় এমন করে একলা ফেলে কেন রাখ? তোমায় ছেড়ে একলা থাকা যায়?

কাঁদিয়া বলে, এমন করে মিথ্যে বাঁচার দায় থেকে কবে আমায় বাঁচাবে? আমি যে গেলাম!

সে প্রার্থনা তার স্বামী বোধ হয় শুনিয়াছিলেন। ইহারই বছর দুয়েক পরে সতী সম্ভবত সতী-লোকেই চলিয়া গেল।

মে. ১৯২৭

মন-পবন

অসাধারণ মেয়ে কিছু নয়; যেমন আর পাঁচজন, তেমনি। কিন্তু সে কথা লক্ষ্মীনারায়ণকে বোঝায় কে?

সে বলে, সবুরে যে মেওয়া ফলে, সেকথা সত্যি।

বন্ধুরা সায় দেয়, তা বটে।

—দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না, ভাই। কোন্ খেঁদী-পেঁচী যে ঘাড়ে চাপবে সেই ভাবনায় ঘুম হত না। যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি ভাই, মনের মতো।

লক্ষ্মীনারায়ণ বন্ধুদের কাছে নীলার রূপ দেবার চেষ্টা করেঃ কেমন জানিস? যেন একটি ছোট্ট টিয়াপাখী আমার ডানার তলে রাত কাটাতে চায়।

বন্ধুরা টিপেটিপে হাসে, কিন্তু মুখে বলে, তোর কপাল ভালো।

লক্ষ্মীনারায়ণ অশিক্ষিত নয়। তার একটা বিশিষ্ট আদর্শ আছে,—যদিচ সেটা তার নিজস্ব নয়,—এবং সমগ্রভাবে জীবনের একটা রূপও চোখের সামনে জেগেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সে কোন্ পথে চলবে, তারও ছক্ আঁকা এখনই শেষ করে রেখেছে। সবচেয়ে বড় করে চোখে পড়ে তার উগ্র নিষ্ঠা। মহাত্মার প্রসঙ্গে যে কোনো লোকের সঙ্গে হাতাহাতি করা তার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, এবং তার মুদীর দোকান খোলা শুধু এই কথা প্রমাণ করবার জন্যে যে, ইংরাজ রাজত্বের ফলে দেশের যে সর্বনাশ হচ্ছে তা' থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সরকারি চাকুরি ছেড়ে ব্যবসা করা।

সুতরাং বিরুদ্ধ-মনোভাববিশিষ্ট সংসারে প্রতিপদে নিষ্ঠার শুচিতা বাঁচাতে গেলে যে পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মেজাজ উগ্র হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হচ্ছিলও তাই, অকস্মাৎ—

তাহ'লে গোড়া থেকেই বলি:

বিয়ের ক'দিন পরেই—শ্বশুরবাড়িতে। তখনো দু'জনের ভালো করে পরিচয়ই হয়নি। ক্বচিৎ কখনও চোখে চোখে দেখা, এক পলকের জন্যে। ঐ পর্যন্ত।

লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে একটা কবি-মন ছিল। নববধূর প্রতীক্ষায় পালঙ্কে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল, আজকের প্রথম সম্ভাষণটি ঠিক কেমন হলে মানাবে ভালো।

এমন সময় নীলা এল,—মাথায় গুণ্ঠন। কিন্তু হাত দুটি এমন আড়ষ্ট

যে, মনে হচ্ছিল বসনখানি সে নিজের মনোমত করে সামলে নিতে চায়, অথচ সামলাতে মানা।

যেন প্রতিমার সাজ,—মালাকর সাজিয়ে দিয়ে গেছে নিজের মনের মতো করে, প্রতিমার এতে কোনো হাত নেই।

বিপদ হয়েছে বেশি ঘোমটা নিয়ে। ছোট ছেলের মাথায় টুপি পরিয়ে দিলে সে যেমন অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে, তেমনি হয়েছে তার।

লক্ষ্মীনারায়ণ কথা কইবে কি, ওর এই আড়ষ্ট মূর্তির পানে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে হেসেই বাঁচে না। এতটুকু মেয়ের আবার বিয়ে দেয়!

এক মিনিট।

নীলা বেশ শান্তভাবে এসে তার পায়ের গোড়ায় টিপ্‌ করে একটা প্রণাম করলে। ব্যাস্‌।

গাঁয়ের কংগ্রেস কমিটীতে পাণ্ডাগিরি করে লক্ষ্মীনারায়ণের মনে যে একটা অহমিকা এসেছিল, কিশোরীর এই প্রণামটুকু একেবারে সেইখানে পৌছুল। এক মিনিটে তার সমস্ত স্নেহ এই মেয়েটির পরে উদ্‌গত হয়ে উঠ্‌ল। মুচকি হেসে বললে, ও কি হল?

হাসি দেখে, নীলা যেন একটু সাহস পেলে। বললে, মা বলে দিয়েছে যে।

—তাই নাকি? তা বেশ। কিন্তু আমাকে তো একটা আশীর্বাদ করতে হবে। কি আশীর্বাদ করি বলতো?

আশীর্বাদের কথায় নীলার হাসি আর থামে না। তার ঠাকুমা আশীর্বাদ করেন,—রাঙা বর হোক। সেই কথাটি মনে পড়ল।

এমনি করে দুটি অপরিচিত প্রিয়জনের মধ্যে পরিচয় সহজ হয়ে উঠল। নীলার মাথার ঘোমটা কখন খুলে গেল, পোষাকি কাপড় আপনার অজ্ঞাতে কখন অভ্যাস মতো আঁটসাঁট করে বেঁধে নিল।

তারপরে আবোল তাবোল বকুনি।

সে বকুনিতে মনোযোগ দেবার বয়স লক্ষ্মীনারায়ণের পার হয়ে গেছে। সে শুধু দুটি মুগ্ধ চোখ মেলে এই লঘুচ্ছন্দা ঝর্ণাটির পানে চেয়ে থাকে। মনে হয়, ও বুঝি মন্দাকিনী ধারা—স্বর্গ থেকে এই প্রথম তার পায়ের কাছটিতে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করলে।

—ওঃ হোঃ! তোমার সঙ্গে যে এখনো একটা ঝগড়াই করা হয়নি!

লক্ষ্মীনারায়ণ বিস্ফারিত চোখে ভয়ের ভান করে বললে, কি অপরাধ করলাম?

অমনি নীলা হেসেই খুন। এই মানুষটা আচ্ছা হাসাতেও পারে যা হোক।

হাসতে হাসতে শাসনের ভঙ্গিতে তর্জনী নেড়ে বললে, ভয়ানক ঝগড়া। ঠান্‌দিরা অত করে বললে, তুমি গাইলে না কেন?

—এই জন্যে ঝগড়া?

—হুঁ।—হাসি আর তার থামে না।

এর পরে তার দিদির ছেলেটির গল্প শুরু হল। তার চেয়ে বছর তিনেকের বড়, কিন্তু এখনও হাফ্‌প্যান্ট্‌ পরে রাস্তায় লাট্টু খেলে। তবে পড়াশুনায় ভালো, বরাবর ফার্স্ট হয়। পনেরো বছর তো মোটে বয়স, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে।

—কিন্তু ভারি দুরন্ত। দিদির হাতে যা মারটা খায়, বাপ্‌রে!

—তুমি মার খাও না?

—ধ্যেৎ। এতবড় মেয়ের গায়ে বুঝি কেউ হাত তোলে?

—তা বটে।

তারপরে বটুকের প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। বটুক কে, তা লক্ষ্মীনারায়ণের জানার কথা নয়। অনুমানে বুঝল, পাড়ারই একটি ছেলে, ওর পেয়ারা পাড়ার সাথী। এও সে অবগত হল যে, এই ছেলেটি একদিন পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এবং এই পড়ে-যাওয়া এমনি হাসির ব্যাপার যে, বটুকের তাতে আঘাত লেগেছিল কিনা তা সঠিক জানা গেল না। তবে বোঝা গেল, আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি। যাও একটু চোট লেগেছিল, তা ছোটকাকার হাতে প্রহার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেরে যেতে দেরি হয়নি।

—ওঃ! ভারি ভুল হয়ে গেছে।

—আবার কি ভুল হল?

একথার আর নীলা জবাব দিলে না। লক্ষ্মীনারায়ণের একখানি পা নিয়ে টিপতে বসে গেল।

—মা বলে দিয়েছেন?

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে নীলা জানালে, হ্যাঁ।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাধা দিলে না, চুপ করে শুয়ে রইল। ধীরে ধীরে এই মেয়েটাকে কেন্দ্র ক'রে তার কল্পনা উর্ধ্বলোকে উঠতে লাগল।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখলে, ওর হাতখানি পায়ের উপর ঠিকই আছে, কিন্তু চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে।

বললে, ঘুম পাচ্ছে?

ঘুম সম্ভবত বেশিই এসেছিল। হাত দুটি ধরে টানতেই আস্তে আস্তে ওর বুকের উপর নেতিয়ে পড়ল। পলকের জন্যে দেহলতা অজ্ঞাতসারেই একটু আড়ষ্ট হল।

তারপরে শিশু যেমন মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে এই বারো বছরের মেয়ের চোখদুটি তেমনি সুখে নিমীল হোল। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙলে লজ্জা একটু করবে বৈকি!

কিন্তু এখন?

তনু-দেহে শিহরণ একটুও জাগল কি?

ও যেন নীল-পদ্মের কুঁড়ি,—দলগুলি মেলতে এখনও দেরি আছে। তবু অতি ক্ষীণ সুরভি মনকে একটুখানি যেন ছুঁয়ে যায়।

মোটের উপর, কি যেন একটা পরিবর্তন আসবে এ যেন ও মনে-মনে বুঝতে পারলে। ঢল নামবার ঠিক আগে নদীর ক্ষীণ দেহলতা যেমন আশা ও আশঙ্কায় দুলে ওঠে, তেমনি। নব মেঘের মায়া তৃণের বুকে বর্ষার যে সম্ভাবনা জাগায়,—যাতে করে সে থমকে যায়, উৎকর্ণ হয়ে আগতপ্রায় পরিপূর্ণতার পায়ের ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করে, তবু বুকের গুরু গুরু থামে না,—সেও তো এই।

দিনের মধ্যে সহস্রবার, নিরালা পেলেই, আয়নাতে তার সিঁথির সিন্দুরটুকু দেখা চাই। শিশুকাল থেকে সহস্র সীমন্তে যে সিন্দুর দেখে এসেছে, তা যে এতবড় বিস্ময়ের বস্তু, তা সে এই প্রথম টের পেলে।

পেয়ারা গাছের ওপর থেকে বটুক ইসারায় পাকা পেয়ারার লোভ দেখায়। ইচ্ছে হয় ছুটে যায়, কিন্তু গতি যেন তার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তার দিদির ছেলে যতীশ মাঝে-মাঝে ঝগড়া বাধাতে আসে। মাঝে মাঝে হাতা-হাতিও যে না হয়, ত নয়। কারণের তো অভাব ঘটে না, সব সময়েই বর্তমান।

ইস্কুলে যাবার সময় তার ফাউন্টেন পেনটি পাওয়া গেল না। পেনটি নীলার নেওয়া সত্যি এবং ধরাও ঠিক পড়তো। কিন্তু রাগের সঙ্গে যে আসে তার পায়ের শব্দ হয় বেশি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্র সে বেমালুম সেটিকে লুকিয়ে ফেললে।

যতীশ এসেই বললে, আমার কলম নিয়ে ইয়ার্কি হচ্ছে। দাও আমার কলম।

নিতান্ত ভালো মানুষের মতো নীলা বললে, বাঃ রে বা! আমি নিয়েছি নাকি?

যতীশ কিন্তু এতে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। সে একেবারে পূজনীয়া মাসীমার একখানা হাত ধরে দিলে এক ঝাঁকুনি। এর পরে হাতাহাতি বাধার পথ সুগম হয়ে গেল।

যতীশ বেটাছেলে। ওর গায়ের জোরও বেশি, সুতরাং চিৎকার করতে লাগল নীলা। শেষটায় যতীশের মা এসে যতীশের কান চেপে ধরতেই যতীশ তাকে ছেড়ে দিলে।

—হতভাগা ছেলে, ইস্কুল যাওয়ার নাম নেই, মারামারি করতে ওস্তাদ।

—আমার ফাউণ্টেন পেন নিয়েছে যে!

দিদিকে দেখে নীলার সাহস বেড়ে গেল। কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বললে, নিয়েছে ওর কলম! দেখেছ?

—হ্যাঁ দেখেছি।

দেখার কথাটা যতীশের মিথ্যে। কিন্তু রাগের মাথায় এ ছাড়া কোনো উত্তর ওর এল না।

—বেশ করেছে, নিয়েছে। কলম নইলে ওর যেন ইস্কুল যাওয়া হবে না!

মায়ের পক্ষপাতিত্বে যতীশ রেগে কেঁদে ফেললেঃ বিয়ে করে যেন নবাব হয়েছেন। দোব একদিন এমন এক ঘুঁসি—

যতীশ দুপ্‌দাপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কিন্তু ঘুঁসির কথায় নীলা যে বিশেষ ভয় পেলে তা মনে হল না।

দূর থেকে যতীশ তখন বলতে বলতে চলেছেঃ বরকে রোজ চিঠি লিখতে হয়, নিজে কলম কেনো। আমারটিতে আর কোনদিন হাত দিয়েছো কি—

একথা ওপরের ঘরে দুই বোনেরই কানে গেল। দিদি মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন। নীলা বালিসে মুখ লুকিয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলে। যতীশটা কি ছেলে মানুষ! ওর বুদ্ধি কোনো কালে হবে না।

যতীশ তখন রাস্তায় যেতে যেতে ভাবছে—খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে সে।

আশ্চর্য এই যে, বটুক কিন্তু এখন যেন নীলাকে একটু সমীহ করতে আরম্ভ করেছে। অথচ এরই সঙ্গে ওর একদিন বিয়ের কথা হোত। তখন—

কিন্তু তখনকার কথা এখন তুলে লাভ নেই। এখনও বটুক কখনও কখনও জামরুল পেড়ে দেওয়ার লোভ দেখায়, কিন্তু অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে। মনে-মনে ভাবে, এখন সে আর আগের মতো ছুটে আসবে না।

ছুটে হয়তো যায়। কিন্তু বটুকের মনঃপূত হয় না। এই মেয়েটির মধ্যে সে তার আগেকার মানস-বধূকে খুঁজে পায় না। আগে আধখাওয়া পেয়ারা বাঁ হাত দিয়ে যার দিকে ফেলে দিত, এখন তারই জন্যে আগ্‌ডালের পেয়ারাটি কত কষ্টে পেড়ে এনে নিজের হাতে দিয়ে কৃতার্থ হয়।

তার কেবলই মনে হয়, এই মেয়েটির চোখে সে যেন ছোট হয়ে গেছে। তবু রাগ হয় না,—নিজের ওপরেও না, ওর ওপরেও না। আঁচল লুটিয়ে-লুটিয়ে ও যখন চলে যায় বটুক তখন করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।

তখন যদি ও বলে,—বটুকদা, কাঁচা-মিঠে আম নিয়ে আসতে পার? বটুক এক দৌড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে সেই রাখাল-গাছির বাগানের সবচেয়ে ভালো কাঁচামিঠে আম পেড়ে এনে দিতে পারে। কাঁটা দেওয়া গাছ বেয়ে উঠতে বুক যদি ছিঁড়ে যায় তো যাবে।

রাগে যতীশ বলে, দেখছিস ভাই, বিয়ে হয়েছে বলে আমাদের যেন গ্রাহ্যই করে না। তবু যদি ফার্স্টবুকখানা শেষ করত!

বটুক বলে, হুঁ।

আমের আঁটিটা জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যতীশ বলে,—ওকে আমি দুটি চক্ষে দেখতে পারি না।

বটুক বলে, হুঁ।

—দাদুটা কেন যে ওর বিয়ে দিলে! না দিলে বেশ হ'ত, থাকত থুবড়ো হয়ে ধিঙ্গী মেয়ে।

আবার বলে, এক গাদা গয়না হয়েছে কি না, সেই গরমে মাটিতে আর পা পড়ে না।

ওরা যেন পিঠোপিঠি। ওইটুকু মেয়ের গায়ে এক গা গয়না, আর এক বৎসর খোসামুদি করেও ওর একটা রিস্ট্-ওয়াচ হল না। এইটে ও সহ্য করতে পারে না।

যতীশ বলে,—ভারি হিংসুটে। সেদিন বললাম, দাও না মাসী, তোমার হেজ্‌লীন একটুখানি। মেয়ে একেবারে চাবিটা ঝম্ করে পিঠে ফেলে চলে গেলেন!

যতীশ ওর চাবির রিং পিঠে ফেলে চলে যাওয়ার ভঙ্গি নকল করে দেখায়।

বটুক হাসে, বলে,—বর বি-এ পাশ কিনা তারই গরম।

যতীশ বলে, কিন্তু আমার মেশোমশাই ভাই খুব ভালো।

মেশোমশাইটির ওপর বটুকের, কেন জানিনে, রাগ আছে। বলে,—লোক ভালো, কিন্তু ভাই একটু দেমাকে।

সে কথা যতীশ মানে না। বলে,—দূর, তুই জানিসনে। সে দিন চাইতে-না-চাইতে দামি ফাউণ্টেন পেনটা দিয়ে দিলে। ও হলে দিত?

এই ফাউণ্টেন পেনটি নিয়েই দু'জনের ঝগড়া। মোটকথা যে দুটি সঙ্গী নীলার ছিল, সেই দুটিই ওর প্রতি আর প্রসন্ন নয়।

এই মেয়েটির জন্য মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত নেই,—বকুনিরও কামাই নেই।

—বেহায়া মেয়ে দিন-রাত্তির লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন,—লজ্জাও করে না?

রান্নাঘরের কোণ থেকে নীলা ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—কোথায় আবার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ালাম? সমস্তক্ষণ তো বসে।

—আছ ওখানে বসে! একটু আগে পুকুরে সাঁতার কাটছিল কে?

রাগে কাঁদ-কাঁদ হয়ে নীলা বললে—তাই বলে চান করতেও যেতে পারব না? পারবনা আমি সমস্তক্ষণ তোমার পেছনে পেছনে ঘুরতে।

—তা কেন পারবে? তা হলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! দাঁড়াও, দাঁড়াও, শ্বশুর-বাড়ি তো যাও, ঠেলা বুঝবে সেইখানে। এখানে তো সুবিধ হল না!

নীলা মুখ ভার করে বসে রইল।

মা আবার বললেন,—বাবাঃ! আর পারিনে। শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারলে বাঁচি!

—তাই বাঁচ, তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।—বলেই নীলা দুপ্‌দাপ্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

মেয়ের কথা শুনে মা তো অবাক!

—ও ছোটবৌ, ও মেজবৌ, শোনো, শোনো, মেয়ের কথা শোনো। কালকে বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে শ্বশুরবাড়ির ওপর এত টান!

জামাইয়ের শান্ত, সৌম্য, প্রিয়দর্শন মূর্তি,—তার মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসি মায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আনন্দে তাঁর দুটি চক্ষু ছলছল করে উঠল। মনে মনে ভগবানের উদ্দেশে দম্পতীর জন্য কি যে প্রার্থনা জানালেন, তা আর কেউ জানল না।

শ্বশুরবাড়ি গিয়েই ঠেলা বুঝতে হল। একেবারে নতুন আবেষ্টনী। নীলা অবাক হয়ে সবারই মুখের পানে চেয়ে থাকে। এতগুলো লোক আসছে, যাচ্ছে, বসছে—অথচ এদের কাউকে সে চেনে না, কখনও দেখেও নি—এর চেয়ে বিস্ময় আর কি আছে!

এদের বাড়িও অন্যরকম। ওদের বাড়ির গড়ন ঢিলাঢালা,—সামনে-পেছনে অনেকটা জায়গা। বাড়িটা অনেকখানি জায়গার উপর কেমন যেন আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর এদের বাড়ি সমস্তটুকু জায়গা আঁকড়ে কেমন যেন বুক-চাপা হয়ে দাঁড়িয়ে।

৩০৮৮

ওদের বাড়িতে হাল্কা হয়ে নেচে নেচে বেড়ানো চলে। 'এখানে কেবলই কোণে চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। ওর ঘরটির তবুও দক্ষিণ খোলা, তাই রক্ষা। নইলে হাঁফিয়ে উঠত। নিচে যখন ওর নিঃশ্বাস আটকে আসে, তখন চুপি-চুপি পালিয়ে এসে দক্ষিণের বড় জানালাটির পাশে বসে। গুটি কয়েক তেঁতুল গাছের ছায়ায় যেখানে পাড়ার ছেলেরা খেলা করে, ওখান থেকে সে জায়গাটি দেখা যায়।

ওই জানালাটির পাশে বসে যে ছেলেদের খেলা দেখতে পায় এইটুকুই নীলা ভাগ্য বলে মানে। এটুকুও যদি না পেত!

তা বাড়ির লোকেরা ভালো। নীলাকে একেবারে রাণী করে রাখে। আদর যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। তবুও—ওরই মধ্যে একটু যদি শাশুড়ী শাসন করেন, নীলার ছ'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

চটে বীণা। বছর সতেরো বয়স। গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে ক'দিন হল বাপের বাড়ি এসেছে। সে এ-সব আদিখ্যেতা দেখতে পারে না। মাকে ক্রমাগতই ধমকায়।

বলে,—না, চা ওপরে পাঠানো হবে না। তোমার রাণী-বৌ নিচে এসে চা-টুকু খেয়ে যেতে পারে না?

মা হেসে বলেন,—তা দিলামই বা ওপরে চা পাঠিয়ে। তাতেও তো কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না!

—মহাভারত যে অশুদ্ধ হবে না, সে আমি জানি। কিন্তু দেবেই বা কেন ওপরে চা পাঠিয়ে? বৌ তো কুটুম নয়!

তর্কের তো কথা নয়। চল্লিশ বছরের মায়ের মন কি সতেরো বছরের মেয়েয় বোঝে? মা চুপ করেই রইলেন।

বীণা চা খেতে-খেতে মাকে উপদেশ দিতে লাগল। এবং তার শাশুড়ী এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিরূপ মোক্ষম মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেন তাও জানিয়ে দিল।

ননদীকে নীলা বাঘের মত ভয় করে। প্রাণপণে সে বীণাকে খুসি রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। তবু হঠাৎ এমন আচমকা সে রেগে ওঠে যে নীলা ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—লোটন কাঁদছে, শুনতে পাচ্ছ না?

নীলা তাড়াতাড়ি উঠে লোটনকে কোলে করে বাইরে নিয়ে এল। লোটন কিন্তু শান্ত ছেলে নয়। চোখ বুজে-বুজেই সে প্রথমে চিৎকার এবং তারপর হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিলে। তাকে সামলান নীলার কাজ নয়। নীলা তাকে

কোলে করে উঠানে বেরিয়ে এল, চাবির গোছা ঝম্‌ঝম্‌ করে বাজালে, বাগানে পর্যন্ত ঘুরে এল। কিন্তু ছেলে সেই যে একঘেয়ে সুরে চোখ বন্ধ করে কাঁদতে লাগল, আর চোখও মেলে না, কান্নাও বন্ধ করে না।

অতি ভয়ে ভয়ে নীলা এসে বললে,—থাকছে না কিছুতেই।

—থাকবে কি করে? অমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ালে ছেলে থাকে?

এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। আস্তে চলা বা শান্তভাবে কোনো কাজ করা তার স্বভাবের বাইরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ দোকান করতে করতে দিনের মধ্যে সাতবার বাড়ির ভিতর ছুটে আসে। কখনো নীলার সঙ্গে একটুখানি দেখা হয়, কখনো হয় না। এইটুকু মন্দ লাগেনা। লক্ষ্মীনারায়ণের মনের সমস্তটুকু কথা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু এ যে ঠিক ছেলেখেলার লুকোচুরি, তা বোঝবার মতো বয়সও তার হয়েছে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে দোরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। দেখে, চারিদিকে ওর চোখ যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুখে বলছে, মা, সেই পাঁচসেরী বাটখারাটা পাচ্ছিনে যে!

বোঝে সবাই। তবু মা বলেন,—কি জানি কোথায় রেখেছিস বাপু। কোথায় যে কি রাখিস তার তো ঠিক নেই।

বীণা কিন্তু ছাড়ে না। বলে, বৌকে বরং জিজ্ঞেস কর বড়দা, সে যদি রেখে থাকে।—বলা তো যায় না। কিন্তু আমি বলি বড়দা, বার বার বাটখারার খোঁজে বাড়ির ভেতর আসার চেয়ে বৌকে বরং দোকান ঘরেই নিয়ে যাও।

বীণার সঙ্গে কথায় পারার যো নেই। অপ্রস্তুত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ পালাবার পথ পায় না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব ফাজিল হয়েছিস!

লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থা দেখে বীণা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, এই বড়দা বিয়ে করতে চাইত না!

মা বলেন, তা এখন বিয়ে করেছে, বৌকে আদর-যত্ন করবে না?

বীণা ঘুমন্ত কোলের শিশুটিকে পিঠে ফেলে শুইয়ে দিতে গেল। দেখে, ঘরের মধ্যে নীলা লোটনের পাশে জড়-সড় হয়ে বসে আছে।

—ওখানে কি করছ?

—লোটনকে ঘুম পাড়াচ্ছি ঠাকুরঝি।

দোলনার ওপর শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে বীণা বললে,—তা তো পাড়াচ্ছ। কিন্তু বড়দা যে দশবার এসে ফিরে গেল।

নীলার মাথা লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তার তখন এমন রাগ হচ্ছিল, কেন এমন করে বার বার আসে ও?

ওই তখুনি। পরের দিনই আবার সমস্ত মন লক্ষ্মীনারায়ণের পায়ের শব্দটুকুর জন্যে সারাক্ষণ একাগ্র হয়ে থাকে।

কিন্তু বীণাকে নিয়ে মুস্কিল দু'জনেরই। দিনের বেলায় দেখা হওয়ার তো উপায় নেই। দেখা যা হয় রাত্রে।

তেরো বছরের তো মেয়ে, এখনও দেহের রেখায় তরঙ্গ জাগে নি। কিন্তু দুটোর এদিকে ঘুমোবার নাম করে না। শুধু বলে,—তারপর?

দোকান নিয়ে খাটুনি তো বড় সোজা নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ হাই তুলে বলে,—তারপর সে-বাজিতে ওরা হেরে গেল। দিলাম একটা রেড্ সেট্।

তাস খেলার নীলা কিছুই বোঝে না। তবু মনোযোগের সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করে। স্বামীর ডান হাতের একটা আঙুল টানতে টানতে বলে,—আর খেললে—না, না? আচ্ছা, তোমার যে কালকে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, কই গেলে না তো?

—সোমবারে যাব।

নীলা ওর ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে—হ্যাঁ, তাই বই কি! দেবে তোমায় যেতে!

লক্ষ্মীনারায়ণ হেসে বললে, আচ্ছা।

একটু পরে নীলা হেসে বললে, আমি তো শ্রাবণ মাসে যাচ্ছি।

—কোথায়?

একটু ইতস্তত করে নীলা বললে, বাপের বাড়ি।

—কে বললে?

—মা মত দিয়েছেন যে।

লক্ষ্মীনারায়ণ একটু হেসে বললে, এরই মধ্যে যেতে হবে? তুমি তো একমাস মোটে এসেছ।

আব্দারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে নীলা বললে, তা বিয়ের কনে আবার কদ্দিন থাকে?

—এক বৎসর।

—ওরে বাপ! তা হলে আমি ঠিক মরে যাব। —বলে সত্যি সত্যিই নীলা কেঁদে ফেললে।

শ্রাবণ মাসে ওর বাপের বাড়ি যাওয়া হল না। কিন্তু সেই সময়েই পট্‌লা এল। পটলকে পেয়ে ও যেন বাঁচল।

পট্‌লা লক্ষ্মীনারায়ণের পিস্‌তুতো ভাই। ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে পড়ে, কিন্তু তাস খেলায় তুখোড়। ওকে পেয়ে নীলা যেন তার বাপের বাড়ির নিজেকে ফিরে পেল।

দু'দিনে পট্‌লা একাধারে বৌদির বাজার সরকার এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে দাঁড়াল। দোতলার কোণের ঘরে দু'জনে গান করতে করতে তুমুল হাতাহাতি বাধে। রেগে পট্‌লা বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বলে,—বৌদি, দু'আনা পয়সা দেবে? এমন চমৎকার ফুলুরি ভাজ্‌ছে মাইরি—

আবার দু'জনে ভাব হয়।

পিসিমা বলেন, পট্‌লা যে এখনও গাছে উঠল না বৌ, ছোঁড়ার অসুখ-বিসুখ হল নাকি?

পট্‌লা দোতালার বারান্দা থেকে মুখ খিঁচোয়। অসভ্যতা পিসিমা দু'টি চক্ষে দেখতে পারেন না। রেগে বলেন, আ হাহা, কি সভ্য ছেলে হয়েছেন!

নীলা ভেতর থেকে ডাকে: পটল ঠাকুরপো!

পট্‌লা একছুটে ভেতরে আসে। নীলা লুডোর ছক্‌ পেতে বসে রয়েছে।

পট্‌লা বলে,—দেবো আর একদিন থান ইঁট ছুঁড়ে- যা থাকে কপালে।

—কাকে ঠাকুর-পো?

—মাকে।—বলেই পট্‌লা লুডোর গুঁটি চালতে আরম্ভ করে, সিক্স! দুত্তোর! আমার দান কিছুতেই পড়তে চায়না।

বিপদ হল লক্ষ্মীনারায়ণের।

এখন আর নীলা রাত-জাগার জন্য তাগিদ দেয় না। সে যেন ঘুম চোখে করেই ঘরের মধ্যে আসে। গল্প করতে করতে যদি লক্ষ্মীনারায়ণ একটু-খানি চুপ করেছে, তারপরে আর ডেকে নীলার সাড়া পাওয়া যায় না। ভোরের বেলা কখন উঠে চলে যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ তা জানতেও পারে না।

লক্ষ্মীনারায়ণ এতে বিরক্ত হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। কেবল ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

—দিন-রাত্তির জানালার ধারে বসে থাক কেন? দেখছ না, ছেলেরা খেলছে ওদিকে?

নীলা ভয়ে ভয়ে ওদিক থেকে সরে আসে।

—পটলার সঙ্গে দিন রাত্তিব কি হুটোপুটি কব! লজ্জা করে না? বয়স কি দিন দিন কমছে?

—আমি কি ঝগড়া করি না কি? ও-ই তো এসে—কিন্তু স্বামীর চোখের পানে তাকিয়ে নীলা ভয়ে-ভয়ে চুপ ক'রে যায়।

এর পরে নীলা লক্ষ্মীনারায়ণকে ক্রমাগতই এড়িয়ে চলতে লাগল।

কিছুদিন এমনি চলার পর লক্ষ্মীনারায়ণের মনে বোধহয় করুণা জাগল। সেদিন দুপুর বেলায় নীলার ঘরে এসে উপস্থিত।

হাসতে হাসতে বললে,—কই দেখি, পান তো সাজা হচ্ছে খুব। দাওতো একটা পান।

নীলা পানের ডিবে এগিয়ে দিলে। এতদিন পরে ওর হাসি দেখে সে যেন হাতে স্বর্গ পেলে।

—অমনি করে? চাইনে তোমার পান।

কেমন করে ও পান চায় সে নীলা জানে। তবু অনেক দিনের ব্যবধানের পর কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। একটুক্ষণ বসে থেকে তারপরে একটি একটি করে দুটি পান সলজ্জ হাস্যে ওর মুখে দিয়ে দিলে।

ও কিন্তু এর পরে উঠে যাবার কোনো লক্ষণই দেখালে না। বললে,—দাও তো ঐ চয়নিকা বইখানা।

নীলা প্রমাদ গণলে। এই সময়টি পটলার সঙ্গে লুডো খেলার সময়। তবু বইখানি এনে দিলে।

—পড়েছ বইখানা?

নীলা ঘাড় নেড়ে জানালে, পড়েনি।

লক্ষ্মীনারায়ণ গম্ভীরভাবে বললে,—দিন-রাত্তির লুডো না খেলে বরং এইগুলো পড়। তাতে কাজ দেবে।

বলে পড়তে লাগল:

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যা-দীপখানি?

দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্তে নাহি চল সলজ্জিত বাসব শয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুন্ঠিতা
তুমি অকুন্ঠিতা।

—বুঝলে কিছু? এদিকে এসো—

লক্ষ্মীনারায়ণ বাঁ হাতখানি নীলার পিঠের ওপর রাখলে। অত দুরন্ত মেয়েরও সে স্পর্শে যেন চোখ বুজে এল। সে আস্তে অস্তে নিজের মাথাটি ওর কাঁধের ওপর রাখলে। লক্ষ্মীনারায়ণ একটু হেসে আবার সুর করে পড়েত লাগল।—

কোনকালে ছিলে নাকি মুকুলিতা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!
আঁধার পাথার তলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

—বুঝতে পারলে?

নীলা বললে,—তুমি দাও বুঝিয়ে।

লক্ষ্মীনারায়ণ কবিতা বোঝাতে লাগল। ইতিমধ্যে বারান্দায় কার পায়ের যেন অতি মৃদু শব্দ হল। কে যেন অতি সন্তর্পণে এসে দোরের গোড়ায় দাঁড়াল।

লক্ষ্মীনারায়ণ বুঝিয়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সে দেখলে ছাত্রী একেবারে অন্যমনস্ক।

হেসে বললে, কি ভাবছ বলতো?

নীলা চমকে বললে, না ভবিনি তো। তারপরে বল।

লক্ষ্মীনারায়ণ বললে, কিছু ভাবনি?

এবারে নীলা অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তুমি কি করে বুঝলে?

—আমি হাত গুণতে জানি যে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

নীলা হঠাৎ উকিলের মতো জেরা করে বসল: বলতো দেখি, আমি কি ভাবছিলাম?

—বলব? তুমি ভাবছিলে, কখন এই কবিতা পড়া শেষ হবে।

নীলা ত্বহাতে তালি বাজিয়ে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে বললে,—হল না, হল না। কি ভাবছিলাম বলব?

—বল।

নীলা অপাঙ্গে একটু হেসে, ত্ব'বার ঢোক গিলে, আঙুলে আঁচলের প্রান্তটুকু জড়াতে জড়াতে বললে,—একটা টাকা দেবে?

—টাকা কি হবে?

—আমার জন্যে নয়। পটল ঠাকুরপোর বিশেষ দরকার, তাই।

মুহূর্তে লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সে উঠে জামার পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিচে নেমেই দেখে পটলচন্দ্র একটা চ্যালা-কাঠ হাতে করে উঠোনের ওপর বীরদর্পে দাঁড়িয়ে এবং উঠোনের ও-কোণে পিসিমা তারস্বরে পটলের প্রতি কুবাক্য বর্ষণ করছেন।

একটু আগেই পটল দোতলায় বৌদির ঘরে আড়ি পাতছিল। এর মধ্যে কখন যে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তা কেউ জানে না। কিন্তু এ যুদ্ধ-ঘোষণা তার পক্ষে মোটেই সমীচীন হয়নি। কারণ, তাকে পালাবার অবসর না দিয়েই লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারে তার টুঁটি চেপে ধরলে এবং যে মারটা মারলে তা পৃথিবীতে শুধু পটলচন্দ্রের পক্ষেই পরিপাক করা সম্ভব।

নীলা দোর গোড়া থেকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখলে।

সে রাত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ একটি কথাও কইলে না। নীলা ঘরে আসতেই ও পাশ-বালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরে শুল। নীলা খাটের পা-তলার দিকে চুপটি করে ঠায় বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে একবার ওর পায়ের তলায় হাত দিলে। কিন্তু কোন সাড়া পেলে না।

খাটের বাজুতে মাথা রেখে ও অঝোরে কাঁদতে লাগল। ওর মনে হোল, জীবনে এত বড় বিড়ম্বনা আর নেই। ওর মায়ের কথা মনে পড়ল। বাপের কথা মনে হল। মনে হল, এর চেয়ে যদি বটুকের সঙ্গে বিয়ে হত সেই হত ভালো। তার সঙ্গে ভাব করা চলে, ঝগড়া করা চলে, গাছে-গাছে মাঠে-মাঠে

খেলা করাও চলে। এর চেয়ে পটল ঠাকুরপোও ভালো। সে অমন ক'রে বাঁধে না,—তার মার ফিরিয়ে দেওয়া চলে।

ঠিক সেই সময়ে দরজায় শব্দ হল,—খুট্ খুট্। কে যেন অতি সন্তর্পণে চাপা কণ্ঠে ডাকলে,—বৌদি!

নীলা একেবারে ঝাঁপিয়ে উঠে স্বামীর পা ঠেলে চিৎকার করে বললে,—ওগো, ঐ দেখ, আবার এসেছে পটল ঠাকুরপো।

লক্ষ্মীনারায়ণের কিন্তু ঘুম ভাঙল না। সে শুধু পা-টা সরিয়ে নিয়ে বললে,—আঃ!

সে রাত্রে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরের দিন সকালে পিসিমা চিৎকারে পাড়া মাথায় করলেন। পট্লাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে যে কখন পালিয়েছে, কোথায় পালিয়েছে, কেউ জানে না।

সমস্ত দিন পিসিমা কাঁদলেন এবং জলটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। আর সবাই ছুটল দিগ্বিদিকে পট্লাকে খোঁজবার জন্যে।

এ সময় নীলার কথা মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

নীলাও কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে একটিবার পট্লার নাম পর্যন্ত মুখে আনলে না। তার যে-অপরিণত মন এতদিন দু'টি দুর্বল বাহু দিয়ে যত জঞ্জাল খেলাচ্ছলে কুড়িয়ে বেড়িয়েছে, একটি দিনে তা যেন দশটি বছর এগিয়ে গেল।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি পট্লাকে পাওয়া গেল। মাইল দুয়েক দূরে ময়ূরাক্ষীর বাঁকের মুখে যে আমবাগান, বেচারা সেইখানে বসে ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকছিল।

ছেলে ফিরে পেয়ে পিসিমা আর এক দফা কাঁদলেন। বাড়িতে একটা কোলাহল পড়ে গেল।

কিন্তু যে মেয়েটি জন্মের মতো হারিয়ে গেল, সে তখন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে ফার্স্ট বুকের পড়া মুখস্থ করছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ লেখাপড়ার পক্ষপাতী।

মুক্তি

নিচের খবরটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল :

গুরুনারায়ণ মঠে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি

নারীসহ সন্ন্যাসী উধাও

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ডেরাডুন, ১৬ই মে

স্বামী অমৃতানন্দ গুরুনারায়ণ মঠের জনৈক বিশিষ্ট কর্মী। এক দিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কঠোর তপশ্চর্যা, অন্য দিকে তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার ও চারুদর্শন চেহারা অল্পদিনেই তাঁহাকে আশ্রমবাসীদের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। গত বুধবার অকস্মাৎ একটি সুন্দরী তরুণী আশ্রমে আসিয়া আপনাকে অমৃতানন্দের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। অমৃতানন্দও তাহা অস্বীকার করেন না। অথচ পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি যখন প্রথম আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন নিজেকে অবিবাহিত বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আশ্রমে এবং এই অঞ্চলে বশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ স্বামী অমৃতানন্দকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সে যাহাই হউক, পরের দিনই সকলের অগোচরে কখন যে তিনি স্ত্রীলোকটিকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান কেহ জানে না ইহাতেও কম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। ব্যাপারটা সকলেরই কেমন রহস্যজনক মনে হইয়াছে।

মনে হওয়ার দোষ নেই। কারণ রহস্য জিনিসটা স্ত্রীলোকের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। নিতান্ত সাধারণ ঘটনাও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসে রহস্যজনক হয়ে ওঠে। এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে এমনি রহস্যজনক-ঘটনার বিবরণ আমরা প্রত্যহই কিছু না কিছু পাই।

আমি নিজে খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক। অন্যান্য বিবরণের মতো এটিকেও যথাসময়ে যথারীতি প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে গলাধঃকরণ করেছিলাম। কিন্তু তখন ভাবিনি সংবাদপত্রের রক্তমাংসহীন হাড়ের টুকরো বিবরণ একদা সাহিত্যে ঠাঁই পাবে। না, তখন আমি একথা ভাবিনি।

অথচ ভাববার কারণ ছিল। শুনেছিলাম, আমাদের সুরেন অমৃতানন্দ অথবা ওই রকম কি একটা নাম নিয়ে কি যেন একটা আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। গেরুয়াও পরেছে!

কিন্তু সেই সুরেন যে গুরুনারায়ণ আশ্রমের অমৃতানন্দ নয় সে বিষয়ে সুরেনকে যারা চেনে তাদের সংশয় হবে না। বাইরে এবং মনে সুরেন চিরকাল ঝরঝরে এবং পরিষ্কার। সুরেন কলেজে যে পড়াশুনায় খুব নামকরা ছেলে ছিল তা নয়। কিন্তু মেধায় অসাধারণ না হলেও বাক্যে ব্যবহারে, চিন্তায় কর্মে একটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট শুচিতা সব সময় সে যেন বয়ে নিয়ে বেড়াত। সুতরাং সংবাদপত্রের ইঙ্গিতপূর্ণ বিবরণের রহস্যময় নায়ক যে আমাদের সুরেন নয় এ তো অতি সহজেই বলা চলে।

তথাপি এই ঘটনায় অনেক দিন পরে সুরেনকে মনে পড়ে গেল। অনেক দিন তাকে দেখিনি। কেন যে হতভাগা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেল তাই বা কে জানে! সংসারে দুঃখ বলতে কিছুই তো তার ছিল না। এই বয়সে জ্বালাই বা এমন কি পেলে?

কিন্তু মানুষ যে শুধু দুঃখের জ্বালায় সন্ন্যাস নেয় তাও তো নয়।

ইত্যবসরে একদিন সুরেনের সঙ্গে দেখা। সন্ন্যাসী সুরেনের সঙ্গে নয়, আমাদের সেই পুরনো কালের সুরেনের সঙ্গে। অর্থাৎ বাবু সুরেনের সঙ্গে।

বললাম, আরে সুরেন যে!

এক গাল হেসে সুরেন বললে, তুই! কি খবর?

—ভালোই। তবে যে কে বললে, তুই সন্ন্যিসী হয়েছিস?

—আমি? কে বললে রে?

—কে যেন বলেছে। অনেক দিনের কথা। ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় একটু রসিকতা করেছিল। তারপর? এখানেই থাকিস, অথচ একদিন দেখা করিসনি? আচ্ছা যা হোক!

—এখানে তো ছিলাম না। কিছুদিন হল এসেছি।

—তাই নাকি? কোথায় ছিলি? কোথায় আছিস? কি করছিস?

—বিশেষ কিচ্ছু না। মানে, ইন্সিওর‍্যান্সের দালালী। আছি বৌবাজারে। আসবি একদিন?

—যাব বই কি? ঠিকানাটা?

সুরেন ঠিকানা দিলে। আশ্চর্য সুরেন! এত দিনেও এতটুকুও বদলায়নি। একদিন যেতেই হবে ওর ওখানে। তার মানে সামনের রবিবারেই যেতে হবে। খুব দেখা হয়ে গেছে যা হোক! এই সময় ওর কথাই ভাবছিলাম।

রবিবারে হাতে কোনো কাজ ছিল না! ঠুক ঠুক করে সুরেনের কাছেই গেলাম। আমার বাসা থেকে বৌবাজারের সেই এঁদো গলিটা অনেকখানি দূরে। রবিবার বিকেলে হাতে কোনো কাজ না থাকলে হাঁটতে মন্দ লাগে না।

কেবল একটুখানি সন্দেহ ছিল, এই সময়টায় ওর দেখা পাওয়া যাবে কি না। যা আড্ডাবাজ লোক! এমন চমৎকার বিকেলে ওর মতো ছেলের পক্ষে বাসায় না থাকাটাই বেশি সম্ভব।

চমৎকার বিকেলই বটে!

কিছু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার পরে উঠেছে পড়ন্ত বেলায় একটুখানি মিঠে রোদ। রাস্তার দুটি ফুটপাথে চলেছে অগণিত জনতার অনতিব্যস্ত মন্থর স্রোত। মোটরে, ফিটনে, ট্রামে-বাসে উৎসুক মানুষের খুশি মুখ। শেষ অপরাহ্ণের আলোয় সব যেন রঙীন, যেন হাসছে। পথে পথে খুশি যেন উপচে উঠছে। যেন অকারণ যোগাযোগে এই অপরাহ্ণটিই খুশি মানুষের সমারোহহীন শোভাযাত্রার জন্যে বিধাতা পুরুষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হয়েছে।

বাস্তবিক এর পরে বড রাস্তা ছেড়ে সেই স্বল্পান্ধকার সরু গলিটির ভিতরে ঢুকতে আমার মন সরছিল না।

কিন্তু তবু গেলাম। মনে শুধু এইটুকু ভরসা ছিল যে, দেরি বেশি হবে না। সুরেনের সেই বাসস্থানটি,—মেসই হোক আর বাসাই হোক,—নিশ্চয় দেখব বন্ধ। নিশ্চয়ই তার দেখা পাওয়া যাবে না। একটু পরেই আবার ফিরে এসে এই সুন্দর শোভাযাত্রয় যোগ দিতে পারব। এইটুকু ভরসা হাতে নিয়েই সেই অন্ধকার গলির গর্তে পা দিলাম।

তেরো নম্বর কাছেই। খুঁজতে বেগ পেতে হল না মোটেই। দেখেই মনে হল এটা মেস নয়, বাসা—সুরেনের নিজেরই হোক, বা তার কোনো নিকট আত্মীয়েরই হোক। কাজেই একটু সমীহ করেই দরজার কড়া নাড়লাম।

কোনো সাড়া নেই।

বোধ হয় সুরেন বাড়ি নেই। বোধ হয় বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষই নেই। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে আর একবার কড়া নাড়লাম।

সাড়া এবারও পেলাম না বটে, কিন্তু অনতিউচ্চ দোতালার ঘর থেকে যেন একটা চঞ্চলতার আভাস পেলাম। কারা যেন উৎসুক হয়ে উঠল মনে হল।

ডাকলাম, সুরেন আছ ?

—কে ?

কণ্ঠস্বর শুনে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে দেখি একখানি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ জানালার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সুরেন আছে ?

—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—বলুন মৃত্যুঞ্জয়।

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে নিচে এসে দরজা খুলে দিলে।

হাসিমুখে বললে, ওপরে চলুন। ওঁর জ্বর।

বললে, আপনার কথাই হচ্ছিল। বলছিলেন, আজ আপনি আসতে পারেন।

—জ্বর কি খুব বেশি ?

মেয়েটি এবারে সকৌতুকে হেসে উঠল। বললে, মোটেই না। একশোর নিচে। কিন্তু দেখবেন চলুন কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন !

মেয়েটি আর একবার সুন্দর ভঙ্গিতে হাসলে। অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। কিন্তু কে ? সুরেন কি বিয়ে করেছে ? নিশ্চয় করেছে। নইলে বাড়িতে নিশ্চয় দ্বিতীয় একজন স্ত্রীলোক থাকত।

—দেখবেন। সিঁড়িটা বড় অন্ধকার।

মেয়েটি আমার পিছু পিছু উপরে এল।

সুরেন উপরের ঘরের মেঝেয় একটি পাতলা বিছানার উপর অসাড় হয়ে শুয়ে। দ্বিতীয় আসন না থাকায় আমি তার বিছানারই একপ্রান্তে বসলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ ?

বিকৃত মুখে সুরেন কি যে বললে বোঝা গেল না। কেবল মনে হল জীবন সম্বন্ধে আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। এমনি ভাবটা।

মেয়েটি হাসি চাপবার জন্যে অন্য দিকে মুখ ফেরালে। হাসি আমারও এসেছিল। কিন্তু চাপবার জন্যে ক্লেশ পেতে হল না।

কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললাম, কিন্তু জ্বর তো তেমন বেশি মনে হচ্ছে না।

মনে হল, এ কথায় সুরেন যেন বিরক্ত হল। কিন্তু প্রকাশ করলে অন্য ভাবে। ঝাঁঝের সঙ্গে মেয়েটিকে বললে, ওখানে সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? একটা আলো আনতে হবে না?

মেয়েটি শান্তভাবে আদেশ প্রতিপালনের জন্যে চলে যাচ্ছিল। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, না, না। এখন আলো কি হবে? তোমার উপরের এ ঘরখানায় তো মন্দ আলো আসে না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়াল।

সুরেন বিরক্তভাবে বললে, তুমি কথা শোন না কেন খুশি? আলো নাই আনলে, অনেকদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় এল, একটু চা তো তাকে খাওয়াতে হবে।

খুশি! মেয়েটির নাম খুশি! খুশিই বটে! অকারণে চলকে-ওঠা, অকারণেই থমকে-যাওয়া খুশি ও।

খুশি নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল। সুরেন আবার একটা ধমক দিয়ে বললে, যাচ্ছ তো? কিন্তু চা আছে তো, না নেই? যাই বল মৃত্যুন, সন্নিসির আশ্রম দেখলাম, কত কি দেখলাম, কিন্তু আমার এই আশ্রমের কাছে কিছুই কিছু নয়। যে জিনিসটি চাইবে, ঠিক সেইটিই নেই।

বলে এমন নিষ্ঠুরভাবে হাসলে যে, খুশির লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে আমি পর্যন্ত লজ্জায় মাথা নিচু করলাম।

কিন্তু খুশি যেন তখনই নিজেকে সামলে নিলে। আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে একটুখানি হাসি গোপন করেই নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বারান্দায় এবং সেখান থেকে নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ির শেষ ধাপে যখন ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, তখন যেন সুরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বললে, এই একটা আচ্ছা উপসর্গ জুটিয়েছি। ওকে নিয়ে কি করি বল তো?

—কার কথা বলছ? তোমার স্ত্রীর?

এবারে সুরেন উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসল। ফিস ফিস করে বললে, স্ত্রী আবার কে? খবরের কাগজে পড়নি ডেরাডুনের গুরুনারায়ণ আশ্রমের—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বামী অমৃতানন্দ না কে একজন—

—আমিই তো অমৃতানন্দ। শোননি বছর পাঁচেক আগে আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম?

—সে তো শুনেছি। কিন্তু তুমিই তো একদিন···তা আশ্রমে তুমি তো ওঁকে স্ত্রী বলেই—

—তা স্বীকার করব না? যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা রয়েছে সেখানে—বেশ লোক যাহোক!

সুরেন রাগে মুখখানা বিকৃত করলে।

বললাম, তবে আর উপসর্গটা কি?

—উপসর্গ নয়? বেশ! কোথায় গিয়ে দাড়াই বল তো? কেউ কি আমাদের আশ্রয় দেবে?

—তার দরকারই বা কি? তুমি লেখাপড়া শিখেছ. দুটো পেট চালাতে পারবে না?

—তুমি তো বললে সে কথা। কিন্তু চালাই কি করে? দাও না একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে?

সে একটা সমস্যা বটে! এ সংসারে সুন্দরী নারী সংগ্রহ করা কঠিন না হতে পারে, কিন্তু একটা সামান্য টাকার চাকরি জোগাড় করাও অসম্ভব।

একটু বিরক্তভাবেই বললাম, কিন্তু এ উপসর্গও তো তুমি নিজেই জুটিয়েছ। ওঁকে নিয়ে তুমি নিজেই তো আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছ।

বিস্মিতভাবে সুরেন বললে, আমি! তুমি জান না মৃত্যুন, আমার সাধ্য কি গুরুজির আদেশ ছাড়া আশ্রম ছাড়ি।

একটু চুপ করে আবার বললে, আচ্ছা তুমি বলতে পার মৃত্যুন, গুরুজি এ কথা আমাকে কেন বললেন যে, সন্ন্যাস জীবনের পুণ্য আমার পাওয়া হয়ে গেছে, এর পরে আমাকে খুশিকে নিয়েই গৃহী হতে হবে?

ওর কথা শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বললাম, গুরুজি নিজে এই আদেশ দিয়েছেন?

—নিজে। আমায় পাথেয় দিয়েছেন এবং সকলের অগোচরে নিজে আশীর্বাদ করে বিদায় দিয়েছেন। আশ্চর্য হচ্ছ?

—হচ্ছি বই কি।

—হুঁ। সমস্তটুকু না শুনলে বুঝতেও পারবে না। আশ্চর্য আমারও কম লাগেনি। ভয়ও পেয়েছিলাম। কেঁদে বলেছিলাম, আমায় মার্জনা কর ঠাকুর। সংসারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। তার বাঁধা ছকের মাঝখানে আমি মূর্তিমান অনিয়মের মত ওকে নিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

গুরুজি হেসে বলেছিলেন, তবে এতদিনের সন্ন্যাসে পেলে কি? কি হল

তপশ্চর্যায় ? আমি জানি, তোমায় যে কাজের ভার দিলাম, তা সন্ন্যাসের চেয়েও দুরূহ। কিন্তু আশীর্বাদ করি, তুমি পারবে।

বড় বড় চোখ মেলে সুরেন বললে, এই কথা গুরুজি বললেন। ভাবতে পার ?

জিজ্ঞাসা করলাম, খুশিকে তুমি পেলে কি করে ?

—যেমন করে সবাই পায় তেমনি করে। তার মানে, খুশি আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। আমি সন্ন্যাস নিয়েছিলাম জান তো ? সে ওরই জন্যে। সামাজিক কারণে যখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে কিছুতেই হল না, হল অন্য লোকের সঙ্গে, মনের দুঃখে সেদিন সংসার ত্যাগ করেছিলাম। দেখলে প্রকৃতির পরিহাস, আবার মাথা নিচু করে সেইখানেই ফিরে আসতে হল। কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ হয় না, —দুঃখ হয় যখন দেখি আমারই জন্যে খুশির গায়ের গহনা একখানি একখানি করে অন্তর্হিত হচ্ছে। দুঃখ গহনার জন্যে নয়, কিন্তু কেমন যেন পৌরুষে ঘা লাগে।

সুরেন মুখখানা কি রকম করলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর স্বামী আছেন, মানে, যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল ?

—আছেন।

বলেই হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, তাঁর তো কোনো দোষ নেই। দিব্যি ভদ্রলোক। কিন্তু খুশি সেখানে থাকতে পারে না। বলে, কেমন গ্লানি বোধ হয়।

সুরেন ফিক করে হাসলে।

এমন সময় খুশি ফিরে এল। তার এক হাতে চায়ের বাটি, অন্য হাতে একখানা রেকাবিতে খানকয়েক লুচি।

তাড়াতাড়ি বললাম, এসব আবার কেন করলেন ? শুধু একটু চা হলেই তো হত।

খুশি যেন লজ্জিত হল, তার দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে। কথাটা বলে আমিও লজ্জা কম পেলাম না। লুচি যখন হয়েই গেছে, তখন অনাবশ্যক ও কথা বলে তার দারিদ্র্যকে খোঁচা দেওয়ার কোনোই দরকার ছিল না।

অপরাহ্ণ থেকে সন্ধ্যা, তারপরে রাত্রি হল। হারিকেনের স্বল্পালোকে বসে তিনজনে কত গল্পই হল।

হঠাৎ সুরেন বললে, দেখ তো খুশি, আমার জ্বর বোধ হয় ছেড়েছে।

খুশি ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করার আগেই বললে, জ্বর অনেকক্ষণ থেকেই নেই।

—তবে কি ছিল ?

—অস্থিরতা।

সুরেন হো হো করে হেসে উঠল।

বললে, সত্যি। একটু জ্বর হলেই আমি অস্থির হয়ে উঠি। তোমার ভয় করে না তো ?

খুশি হেসে বললে, ভয় করবে কেন ? তোমাকে কি আমি চিনি না ?

এই একটি কথায় কি যে তৃপ্তি ছিল জানি না, গভীর আনন্দে সুরেন চোখ বন্ধ করলে।

জীর্ণ হোক, অন্ধকার হোক, খুশি গৃহ পেয়েছে। আরও বেশি করে পেয়েছে,—যার চেয়ে বড় জিনিস মেয়েদের আর নেই —গ্লানি ও অশুচিতা থেকে মুক্তি। কিন্তু ও ঘটনার এইখানেই কি শেষ !

ওদের কিছু বলিনি বটে, কিন্তু আমি পুলিশ কোর্টের উকিল, মনে মনে এইখানেই আমি দাঁড়ি টানতে পারলাম না। খুশির স্বামী বেঁচে আছে। তার পক্ষে আইনের আশ্রয় নেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

তখন ?

সুরেনের কথা আমি ভাবছি না। সে সন্ন্যাসী,— মনে প্রাণে সন্ন্যাসী। খুশির জন্যে হাসতে হাসতেই হয়তো সে আইনের চরম দণ্ড মাথা পেতে নেবে। কিন্তু খুশি ? কোথায় যাবে খুশি ? এ সংসারের কোন্ আইন তাকে দেবে সত্যকারের গৃহ, দেবে নারী জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি ? সে কোন্ আইন ?

ব্যাঘ্র-দেবতা

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এদিকে কেবল মাঠের পর মাঠ, ধান-জমি। মাঝে মাঝে তাল ও আমের বাগান। তাও মাঠের মধ্যে নয়, গ্রামের কোলে। কোথাও জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। শীতকাল। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে আখের খেত মাঠের শূন্যতা দূর করিতেছে। এদিকে বাঘ আসার কথা নয়, আসেও না। কেবল খেতের আখগুলিকে ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকে গুজব তোলে, অমুক মাঠে বাঘ আসিয়াছে। এমন একটা গুজবের মুখে সেবারে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার কয়েকটি ছোক্‌রা পাড়ার কয়েকটি খেজুর গাছে রস লাগায়। গুড় তৈরি করিবার মতো প্রচুর রস এদিকে হয় না। শুধু নিজেদের ঊষাপান, পাঁচজনের মধ্যে বিতরণ এবং খানিকটা আমোদ—এই লাভ। কিন্তু তাহার জন্য কম কষ্টও করিতে হয় না। রাত্রে লোকে আসিয়া রস খাইয়া চলিয়া যায়। সকালে ইহারা গিয়া দেখে ভাণ্ডে রস নাই। সেজন্য প্রায়ই রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেও হয়। এই কয়দিন কেবল পাহারা দিতে হইতেছে না। বাঘের ভয়ে কেহ আর রাত্রে বাহির হইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে। আর রাত নাই, কিন্তু ভোর হইতেও বিলম্ব আছে। তাঁতী-পাড়ার ছোক্‌রা কয়টি কাপড় মুড়ি দিয়া থুর থুর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হন্‌ হন্‌ করিয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—কি!

ছোক্‌রা কথা কহিল না শুধু আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল,—পথের ভিজা ধূলায় স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ! একটি, দুটি, তিনটি, অনেকগুলি ব্যাঘ্রপদচিহ্ন বাঁ দিকের ডোবার পথ ধরিয়া গিয়াছে। ওইখানেই একটা খেজুর গাছের রস লাগানো হইয়াছে যে!

—সর্বনাশ!

—আর রসে কাজ নেই ভাই; চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

—যা রে যা! গিয়ে পরিবারের আঁচল ধরে বসে থাক গে। বাঘ না ইয়ে!

—কিন্তু কত বড় থাবা দেখেছিস?

—দেখিছি। আমাদের বাঘা কুকুরটার থাবা ওর চেয়ে বড়।

বলিতেছিল বটে, কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর নামিয়া গিয়াছে। বাঘ হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। বাঘা কুকুরটার পায়ের দাগ হওয়াও অসম্ভব নয়। সেটাও প্রকাণ্ড বড় কুকুর। দেশি জাতের অত বড় কুকুর প্রায় দেখা যায় না।

অকস্মাৎ দূরে নারীকণ্ঠে আর্তনাদ উঠিল,—ওরে বাঘরে বাঘ, বাঘ।

এক সেকেণ্ডে সকল তর্কের অবসান হইল। হাতের ভাঁড় দুম্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সকলে একলাফে পাশের প্রাচীরটার উপর উঠিল। নিচে মাটির ভাণ্ড ভাঙিয়া রস গড়াইয়া পথ কর্দমাক্ত হইয়া গেল। আর উপরে তাঁতীপাড়ার ছোক্‌রা কয়টি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রাচীরটি মোড়লদের খামারবাড়ির। এক প্রান্তে তাহাদের গোয়াল ঘর, আর প্রান্তে রান্নাঘর। ভয়ের আধিক্যে তাহারা দেখিতে পায় নাই, প্রাচীরের ঠিক নিচেই মোড়লদের বাড়ির ছোট্ট বৌটি গোবর মাখিতেছিল। অতগুলি লোক দুম্‌দাম্ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিতেই সে ভয় পাইয়া বাড়ির ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল।

শাশুড়ী বাড়ির ভিতরে উঠান ঝাঁট দিতেছিল। ঝাঁটা হাতেই বাহিরে আসিয়া কাংস্যকণ্ঠে হাঁকিল,—কে রে মুখপোড়া! মরবার আর জায়গা পাস নি? আমার বাড়িতে এসেছিস উপদ্দুরুপ করতে?

মুখপোড়ারা একদল তখন সরিতে সরিতে গোয়ালঘরের কাছে পৌঁছিয়াছে, আর একদল রান্নাঘরের কাছে।

বুড়ি চিৎকার করিতেই তাহারা ধমকাইয়া কহিল,—চুপ! বাঘ!

—বাঘ! দিনের বেলায় বাঘ! আমাকে ছোট ছেলে পেয়েছিস, না রে? নাম বলছি।

প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ তো এক লাফেই সব কয়টাকে সাবাড় করিয়া দিবে। তাহারা সকলেই চালের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু শিশিরে খড়ের চাল এমন পিছল হইয়া উঠিয়াছে যে, উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর সেই সময়েই বুড়ি টিস্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে।

—আরে, এ মাগী করে কি? বলছি বাঘ ··!

—বাঘ বার করছি দাঁড়া রে মড়া! ডাকি লস্‌নাকে, সে এসে দেবে তোদের মুখে নুড়ো জ্বেলে। ওঠ তো রে লস্‌না, মড়ারা এসেছে সকাল বেলায় আমার বাড়িতে বাঘ দেখাতে!

মাতার বারম্বার আহ্বানে লসন চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া তাহার নজর পড়িল সুমুখে রান্নাঘরের চালের উপর

কয়েকটি লোক ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে, আর সভয়ে বারবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

—কী হে পেল্লাদ !

প্রহ্লাদ একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না। যেমন অবস্থায় বসিয়া ছিল, তেমনি অবস্থায় শুধু অস্ফুট স্বরে কহিল,—বাঘ !

বাঘের গুজব কয়দিন হইতেই উঠিতেছিল। লসন সভয়ে কহিল, কোথায় হে ? প্রহ্লাদ সাড়া দিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। লসন আবার উচ্চতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পেল্লাদ ?

ভয়ের সময় বেশি কথা কহিতে বিরক্ত লাগে। প্রহ্লাদ ঝাঁঝিয়া কহিল,—কোথায় তা কি দেখতে পাচ্ছি না কি ? এইখানেই আছে কোথাও।

পরক্ষণেই কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু আওয়াজটা অত্যন্ত কাছেই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন কর্কশ কণ্ঠে পাড়া মাতাইয়া চিৎকার করিল—পালারে বাঘ, বাঘ !

এবং তাহার চিৎকার বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে কি যেন একটা ভারি জন্তু—যে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া লসন ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল, সেই ঘরের চালের উপর,—দুম্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল, বোধ করি পাশের তেঁতুল গাছটা হইতে।

বাঘ !

চক্ষের নিমেষে লসন ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া খিল লাগাইয়া দিল। তাহার স্ত্রী দাওয়ার এক কোণে অন্তরালে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও কালবিলম্ব না করিয়া পাশের ঘরে খিল লাগাইয়া দিল। কেবল লসনের বৃদ্ধা জননী ছুটিয়া দাওয়ায় উঠিতে গিয়া সিঁড়িতে হোঁচট খাইয়া আবার উঠানেই গড়াইয়া পড়িল এবং হাত-পা ছুঁড়িয়া জড়িত কণ্ঠে এমন ভাবে কাৎরাইতে লাগিল যে, শুনিলে মনে হয়, বাঘটা তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

আর গোয়াল ও রান্নাঘরের উপরের লোকেরা প্রাণপণে খড় আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে বড় ঘরের চালের উপর যে জন্তুটা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে তখন থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরের উপর হইতে প্রহ্লাদের দল স্পষ্ট দেখিতেছে, সেটা সত্যই বাঘ নয়, একটা হনুমান মাত্র। কিন্তু তথাপি যেন কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। থাকিয়া থাকিয়া স্খলিত কণ্ঠে কেবলই চিৎকার করিতেছে,—বাঘরে, বাঘ, বাঘ !

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। মেয়েরা স্নান, ঘরের

কাজ, রান্নাবান্না বন্ধ করিয়া রুদ্ধ ঘরে ছেলেপুলে লইয়া বসিয়া রহিল। ঘাটে যাওয়ারও উপায় নাই, ঘরের বাহিরে আসিবারও উপায় নাই! বাঘটা যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো স্থান হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। অথচ মুস্কিলের কথা এই যে, বাঘটা যে ঠিক কোথায় আছে তাহাও ঠাহর করিবার উপায় নাই। এই দক্ষিণপাড়া হইতে চিৎকার আসিল, বাঘ, বাঘ। পরক্ষণেই পূবপাড়া হইতে তেমনি চিৎকার আসিল। কোথাও খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে, কি লোকে ভয়ে বাঘ, বাঘ বলিয়া চিৎকার করিতেছে।

গ্রামের চৌকিদার পরাণ হাজরার বয়স হইয়াছে। তবু এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতেছিল। ঘরে তাহার দরজা নাই, রাত্রে একটা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া থাকে। তাহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া পরাণকে ঘরে আসিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছিল। সে ঘরে না আসিলে বেচারা ঝাঁপ বন্ধ করিতে পারিতেছিল না। আবার ঝাঁপ বন্ধ না করাও নিরাপদ নয়।

—মিন্‌সে নিজেও মরবে, সাতগুষ্টিকেও মারবে। ঘরে আসবি তো আয়, নইলে দিলাম ঝাঁপ বন্ধ করে।

এবারে পরাণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, দে ক্যানে ঝাঁপ বন্ধ করে! মানা করছে কে ?

তাহার স্ত্রী মুখ ভেঙ্‌চাইয়া বলিল, মানা করছে কে ? একটা মানুষ ঘরের বাইরে বসে থাকলে ঝাঁপ দেওয়া যায় ?

—তবে মর্।

বলিয়া পরাণ বিরক্তভাবে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের এক কোণ হইতে একটা বড় টাঙি এবং তাহার চৌকিদারি পেটিটা বাহির করিয়া উঠানে নামিল।

— আবার টাঙি নিয়ে চললি কোন্ চুলোয় ?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পরাণ বাহির হইতে হইতে শুধু বলিয়া গেল,—দে এইবার ঝাঁপ বন্ধ করে।

তাহার পরিবার হাউ মাউ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সুমুখেই বৈঠকখানায় একটা মোড়ার উপর বসিয়া রায়েদের বড় বাবু পাটের দড়ি

কাটিতেছিলেন। পরাণ উঠান হইতেই গড় হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিল।

বড়বাবু বিপুল শক্তি ও অসীম সাহসের জন্য বিখ্যাত। বয়স ষাটের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি হুঙ্কার দিলে বড় বড় জোয়ানেরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সম্মুখে লাঠি ধরে, এমন লোক এ অঞ্চলে বেশি নাই।

তিনি পরাণের দিকে বঙ্কিম নেত্রে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এদিকে চল্লি কোথারে হারামজাদা? বাঘ এসেছে যে।

পরাণ করযোড়ে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে তাই শুনেই একবার বেরুলাম বাবু। মাগীকে বললাম, তুই ঝাঁপ দিয়ে ছেলেগুলোকে নিয়ে বোস, আমি বাঘের খপরটা একবার নিয়ে আসি।

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—তাই যা। মাগীর হাতে শ্মশান খরচাটা রেখে এসেছিস তো?

পরাণ একগাল হাসিয়া কোমরের পেটিটার উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। কহিল,—আজ্ঞে আমরা মহারাণীর চাকর, আমাদের ওপর তো তেনার হস্ত উঠবে না।

এমন সময়ে কাছেই বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব উঠিল,—এই যে, এই যে! মার, মার।

মনে হইল মুখুয্যেদের খামারবাড়িতে।

বড়বাবু ডান হাত দিয়া মেঝে হইতে কাস্তেটা উঠাইয়া লইয়া মোড়াটিকে একেবারে দরজার গোড়ায় টানিয়া আনিলেন। যেন প্রয়োজন বোধ করিলে, এক লম্ফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন অথচ বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—তা, সংবাদ নিতে হয় তো যা। নইলে ঘরের মধ্যে ঢোক্! বাঘটা মনে হচ্ছে মুখুয্যেদের খামারবাড়িতে ঢুকেছে।

পরাণ বাঁ হাতটা একবার পেটিতে একবার কপালে ঠেকাইয়া টাঙ্গিটা কাঁধে ফেলিয়া কহিল,—আজ্ঞে না, ঘরে আর পেবেশ করব না, খপরটাই নিয়ে আসি।

বলিয়া মুখুয্যেদের খামারের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বড়বাবু উদ্বিগ্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এখান হইতে মুখুয্যেদের খামারবাড়ি মিনিট তিনেকের পথ। একাকী, এত কাছে, একখানি মাত্র কাস্তে সম্বল করিয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ হইবে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এক কালে তাঁহার নিজের বন্দুক ছিল, শিকারের সখও ছিল। পরিণত বয়সেও তিনি নিজের হাতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। তাই বাঘ যে কত হিংস্র, তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইল কোন অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁহার বন্দুক, এমন কি, বহুকষ্টে সংগৃহীত কয়েকখানি গুপ্তি এবং তরবারিও বাজেয়াপ্ত

করিয়াছেন। উপযুক্ত অস্ত্র না লইয়া বাঘের সম্মুখীন হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়াছিলেন। অথচ, ছাড়া বাঘ দেখিবার সখটুকুও ষোলো আনা আছে! এত কাছে বাঘ আসিয়া পড়ায় তিনি ভাবিতেছিলেন, এখানে বসিয়া থাকা সঙ্গত হইবে কি না।

এমন সময় পাঁচু সেখ আসিয়া অভিবাদন করিল,—সেলাম বাবু।

লোকটা উৎসাহের আধিক্যে একেবারে শুধু হাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

—কি হে সেখজি?

—জি, আপনাদের পাড়ায় নাকি বাঘ আল্‌ছে?

—আল্‌ছে। তাই শুধু হাতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিস্?

পাচু একগাল হাসিয়া কহিল,—জি, আমরা জাত পাঠান। একটা নেংটে বাঘ মার্‌তে আমাদের হাতিয়ার লাগে না। ধরব, কি কল্লা মুচুড়ে লুব।

দাত খিঁচাইয়া বড় বাবু বলিলেন,—ভারি মরদ!

পাচু সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া মেঝেয় একটা চাপড় দিয়া কহিল, জি, পাঁচু সেখের মর্দানি সেবার বিলের লড়ায়ে তো দেখলেন। পঁচিশটা জোয়ান আমি একা ভাগিয়েছি।

পাঁচু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিয়া বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ওরে হতভাগা, এ তোর লেঠেলি নয়। বাঘ লাঠি মানে না।

পাঁচু লাঠিয়ালি ঢঙে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কোন্ খানে বাঘটা আছে বলুন। পাঁচু সেখের কেরামতি আর একবার হুজুরকে দেখিয়ে দিই।

পাঁচু বড়বাবুর পেয়ারের লাঠিয়াল। নিজের হাতে তাহাকে লাঠি খেলা শিখাইয়াছেন। তাঁহার বহু দুঃসাহসের বিশ্বস্ত সঙ্গী সে। তাহাকে বাঘের মুখে পাঠাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু সে যে এ ব্যাপারে নিষেধ মানিবে না, তাহাও বুঝিলেন!

একটু দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন, যাবি? তা যা। বোধ করি মুখুয্যেদের খামারেই আছে। তবে শুধু হাতে যাস নে। এই কাস্তেখানা নিয়ে যা।

পাঁচু ওস্তাদের দেওয়া কাস্তেখানি পরম সমাদরে মাথায় ঠেকাইল।

বড়বাবু আবার বলিলেন, দেখিস্, যার তার ঘাড়ে বসাস না যেন। ওতে বিষ পান দেওয়া আছে। রক্ত বার হলে আর নিস্তার নাই।

পাচুর উল্লাস দেখে কে! কাস্তেখানা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া পাচু বলিল, জি, তা হলে ও শালার মিত্যু নিব্যাৎ আমার হাতে।

বলিয়া ওস্তাদকে আর একবার সেলাম করিয়া কাস্তেখানা উর্ধ্বে তুলিয়া

পাচু লাঠিয়ালি ঢঙে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার ছেলেগুলি ঠিক দেখিয়াছিল।

বাঘের পায়ের থাবাই বটে। অনুমান হইতেছে বাঘটি সেই দিক দিয়া সোজা চাটুয্যেদের কলাবাগানে ঢোকে। চাটুয্যেদের কলাবাগান তাহাদের অন্দরেরই এক প্রান্তে। চাটুয্যেগিন্নী সেদিকে গোবরছড়া দিতে গিয়া দেখিতে পান, বাঘটি সুমুখের দুই থাবায় মুখ ঢাকিয়া ঝোপের মধ্যে সম্ভবত নিদ্রা যাইতেছে। তিনি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রাণপণে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দেন। সে চিৎকারে পাড়ার লোক উঠিয়া পড়ে। যাহারা সাহসী তাহারা ছুটিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু এরূপ সাহসী লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। অধিকাংশ লোকই নিরাপদ গৃহকোণে বসিয়া বলিতে থাকে - বাঘ না আরও কিছু! দেখেছে হয়ত উদ্‌বেড়াল, অমনি ভয়ে ভিরমি খেয়েছে। তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

তথাপি পাড়ায় একটা সোরগোল ওঠে। এবং সেই চিৎকারে নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিতে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাঘ্র মহাশয় পদ্মগড়ের দক্ষিণ এবং বন্দীগড়ের উত্তর দিয়া সোজা পশ্চিম মুখে হাঁটিতে থাকে। বন্দীগড়ের ঘাটে দত্তদের সেজ বৌ বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন লইয়া একরূপ বাঘের সুমুখ দিয়াই বাড়ি ঢোকে। বাঘ হয়তো তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, নয় তো অন্য কোন খেয়ালে ছিল, অবলা মানবীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। দত্তদের বৌও অতটা খেয়াল করে নাই। করিলে সেইখানেই মূর্চ্ছা যাইত।

বলে,— দেখলাম যেন মা, কি একটা পদ্মগড়ের পাশ দিয়ে এই দিকেই হেলে-দুলে আসছে। কে জানে মা বাঘ! আমি তো সুমুখ দিয়েই চলে এলাম।

বলে আর তাহার বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া ওঠে।

দত্তদের সেজ ছেলে তখনও লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল। এই শীতের রাত্রে এত ভোরে উঠিয়া স্ত্রী যে বাসন মাজিতে যায়, তাহা তাহার ভালো লাগে না।

মুখের উপর হইতে লেপটা সরাইয়া তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল,—উঁঃ! রাত পোয়াতে না পোয়াতে নিত্যি নিত্যি বাসুন মাজার ধুম পড়ে যায়! নিত মাগীকে গপাং করে তো বেশ হত!

মাগী সভয়ে শিহরিয়া বলিল,—বাবাঃ! এত বড় মাথাটা। আমি তখনি জানি, উনি সহজ পেরানী লয়।

—উঁঃ! তুইত সবই জানিস। নিত্যি বলি অত ভোরে যাস না, গাঁয়ে বাঘ

এসেছে। আমার কথা গেরাহ্যিই হয় না। এইবার যা।

—আবার !

বলিয়া সেজ বৌ স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিল।

এখান হইতে বাঘ বরাবর গিয়া মুখুয্যেদের খামারে ঢোকে। শীতকাল। খামারে সারি সারি অনেকগুলি ধানের পালা। পাশাপাশি দুইটি পালার মধ্যে যে সরু ফাঁক আছে, সেই স্থান দিনযাপনের পক্ষে নিরাপদ হইবে মনে করিয়া বাঘটা তাহারই মধ্যে আশ্রয় লয়। লোকে আর বাঘ খুঁজিয়া পায় না। শেষে মুখুয্যেদের রাখাল আসিয়া সংবাদ দেয়, বাঘ তাহার মনিবের খড়ের পালার ফাঁকে আশ্রয় লইয়াছে। খামার পরিষ্কার করিতে আসিয়া সে ছোকরা দেখিতে পায়, বাঘের লেজের কিয়দংশ বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া লট্‌ পট্‌ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বহুলোক খামারবাড়ির চারিদিকের বাড়িগুলির চালের উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা বাড়ে, তবু বাঘের বহিরাগমনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। লোকে চালের উপর বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এমন কি, কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল যে, এত সোরগোলের পরও যখন জন্তুটা বাহিরে আসে না, তখন ওটা নিশ্চয় বাঘ নয় উদ্‌বেড়াল কিম্বা অমনি একটা কিছু হইবে।

অবশেষে সরকারদের ওরম্বাপদ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া লাফ দিয়া খামারবাড়ির মধ্যে পড়িল। ওরম্বা দেখিতে বেঁটে-খাটো, কিন্তু গায়ে অসীম জোর—প্রশস্ত বুক, সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহু এবং সাহসও যথেষ্ট। ছোকরা গায়ে ডজন্ খানেক জামা চড়াইয়া, বুকে-মাথায় বেশ করিয়া কম্ফার্টার জড়াইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস, বাঘে তাহার কিছু করিতে পারিবে না।

ওরম্বা অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, লেজটি বাঘেরই কিনা। বাঘ সে কখন দেখে নাই। বড়বাবুর বাড়িতে কতকগুলো বাঘের চামড়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের লেজ কি রকম ছিল ঠিক মনে পড়িল না। তবু তাহার মন বলিল, এ লেজ বাঘের না হইয়া যায় না।

উপর হইতে তখন ক্রমাগত প্রশ্ন আসিতেছে,—বাঘ বটে তো হে ? না উদ্‌বেড়াল ?

সাড়া দিবার উপায় নাই। ওরম্বা ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল, বাঘই বটে। শুনিয়া লোকগুলি চালের উপর বেশ সাবধান হইয়া বসিল।

ওরম্বার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যদি আস্তে আস্তে খড় চাপা দিয়া ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাঘটার নিশ্চয়ই পালাইবার পথ

বন্ধ হইবে। তখন তাহাকে কায়দা করা সহজ হইবে। আগুন লাগাইয়াই হউক, আর সকলে মিলিয়া চাপ দিয়াই হউক, বাঘটাকে মারিয়া ফেলিতে কষ্ট হইবে না।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ওরম্বা বাঘের লেজের দিকে আঁটি আঁটি খড় চাপা দিতে লাগিল। পিছনের ফাঁকটা কেবল বন্ধ হইয়াছে, অকস্মাৎ একটা ভীষণ গর্জন উঠিল। তেমন গর্জন এ অঞ্চলের লোকে জীবনে শোনে নাই। চালের উপরের লোকগুলি পড়িতে পড়িতে কোনরূপে চালের খড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাদের কাঁপুনি আর থামে না।

ভীষণ গর্জন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরম্বা লক্ষ্য করিল, বাঘটা দুই পা তুলিয়া সোজা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রকাণ্ড মাথা, তাহাতে চোখ দুইটা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, আর হা-মুখটা এতই বড় যে ওরম্বার কম্ফার্টার সমেত মাথাটা অবলীলাক্রমে তাহার ভিতর চলিয়া যাইতে পারে।

পলকের মধ্যে ওরম্বার সম্মুখ হইতে খড়ের পালা, ঘরের দেওয়াল, আকাশ, মাটি, গাছপালা লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত বাহ্যচৈতন্য লোপ পাইল। কিন্তু ভগবান মানুষের মনে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়াছেন, বোধ করি সেই প্রেরণার বশেই সে বাঘের উর্ধ্বোত্থিত সম্মুখের দুইটা পা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল।

তারপর আরম্ভ হইল, মানুষে বাঘে লড়াই।

ওরম্বার দেহে অমিত শক্তি। বাঘটা তাহার দৃঢ়মুষ্টি হইতে সুমুখের পা দুইটা ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন ধস্তাধস্তি করিতেছে যে, আর বোধ হয় বেশিক্ষণ সে-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ওরম্বার থাকিবে না। তাহার পিঠ একটা খড়ের পালায় না ঠেকিলে এতক্ষণ বোধ হয় সে পড়িয়া যাইত। পিছনের পা দিয়া বাঘটা তাহার পায়ের হাঁটু হইতে নিচ পর্যন্ত কয়েকটা স্থান চিরিয়া দিয়াছে। ক্ষতমুখ দিয়া ঝর ঝর ধারে রক্ত পড়িতেছে। ওরম্বা বাঘের সুমুখের পা দুইটা ধরিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ফারিত চোখে সে যে কি দেখিতেছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এক মিনিট......দুই মিনিট......!

এমন সময় চৌকিদার পরাণ হালদার আসিয়া টাঙি দিয়া বাঘের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—হেট্, হেট্।

যেন তাহার দুষ্টু হাঁসা বলদটা গলাঘি খুলিয়া খামারে ঢুকিয়াছে, ধান খাইতে!

বাঘটা এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর এক ঝট্কায় ওরম্বার মুষ্টি

হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পরাণের উপর লাফাইয়া পড়িল—এবং সরকারী পেটির মর্যাদা কিছুমাত্র রক্ষা না করিয়া মহারাণীর ভৃত্যের ঠোঁটের দক্ষিণ পাশ হইতে গালের খানিকটা মাংস উঠাইয়া লইয়া, এক লাফে খামার-বাড়ির অনুচ্চ প্রাচীর ডিঙাইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেটা বড় রাস্তা নয়। ডান দিকে মুখুয্যেদের বাড়ি, তারপরে মহান্তদের গোলাবাড়ি, তারপরেই একটা ছোট ডোবা। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামসীমান্তে হাড়িপাড়ায় পৌঁছিয়াছে, আর একটা বাঁয়ে বেঁকিয়া রায়েদের বৈঠকখানার পাশ দিয়া তাঁতীপাড়ার দিকে গিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পাঁচু সেখ ডোবাটা পার হইয়া মহান্তদের গোয়ালবাড়ির কাছ পর্যন্ত লাফাইতে লাফাইতে গিয়াছে। কাস্তেখানা তখনও তাহার ডান হাতে তেমনি শূন্যে নাচিতেছে!

এমন সময় চারি চক্ষে সম্মেলন!

সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাঠানের মুখ শুকাইয়া গেল। কে জানিত বাঘের চোখ এমনি করিয়া জল্ জল্ করে! বাঘটা তাড়াইয়া আসিতেই, সে কাস্তেখানা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়াই ডোবায় লাফ দিল। কাস্তেখানা বাঘের গায়ে লাগিল কিনা, অথবা লাগিলেও ফল হইল কিনা, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলও না। কেবল অনুমানে বুঝিল, ঠিক তাহার পিছনে পিছনে আরও একটা কি যেন জলে লাফ দিয়া পড়িল।

পাঁচু সেখ ডুব-সাঁতার কাটিয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, এবং দুরন্ত শীতে ভিজা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ওপাশের পদ্মগড়েতে আবার লাফ দিয়া পড়িল।

বাঘটা খানিক জলে সাঁতরাসাঁতরি করিয়া আবার এ-পারেই উঠিয়া আসিল, এবং মহান্তদের গোয়ালঘর ও মুখুয্যেদের বাড়ির মধ্যে যে সরু গলি আছে সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল বড় বড় বাবরী চুলওয়ালা কে একজন একটা রাম দা হাতে করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বাঘটা ইচ্ছা করিলে এক নিমিষে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। শুধু সুমুখের বড় বড় ঝকঝকে দাঁত দুইটা বাহির করিয়া শব্দ করিল,—গ্যাঁও-ও।

ব্যস। আর দেখিতে হইল না। বাবরীওয়ালা লোকটি ছিট্‌কাইয়া প্রথমে মহান্তদের গোয়ালঘরের দেওয়ালে পড়িল, সেখান হইতে আছড়াইয়া পড়িল মুখুয্যেদের ঘরের দেওয়ালে। দুইটা গাল এবং হাঁটুর চামড়া খানিকটা উঠিয়া রক্তাক্ত

হইয়া গেল, কিন্তু তখনও তাহার থামিবার উপায় নাই। লোকটা গড়াইতে গড়াইতে ডোবার জলে গিয়া পড়িল।

বাঘ কিন্তু আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে মহান্তদের গোয়ালঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোয়ালের এক কোণে গুটি তিনেক গরু বাঁধা ছিল। বাঘ দেখিয়া সেগুলা তখন কোণে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দড়ি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। গোকুল মহান্ত খবরটা শুনিয়া রুদ্ধ শয়ন-কক্ষের মধ্যে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল,—গেল রে, গেল গেল, হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল। বাঘটা এতক্ষণে গরুগুলিকে বুঝি সাবাড় করিয়া ফেলিল।

কিন্তু ডোবার জল হইতে উঠিবার পর হইতে বাঘটা যেন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গরুগুলির হাম্বারব এবং ছুটোপাটিতেও তাহার জল-যোগের স্পৃহা দেখা গেল না! সে আর এক কোণে স্থির হইয়া বসিয়া প্রসারিত জিহ্বা দিয়া পদতল লেহন করিতে লাগিল।

অনেকগুলি লোক সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের চালের উপর উঠিয়া পড়িল। একজন বুদ্ধি করিয়া চালের খড় খানিকটা ফাঁক করিয়া, সেই পথে একখানা কাস্তে-বাঁধা বাঁশের লগি দিয়া গরুগুলির গলার দড়ি কাটিয়া দিল। ছাড়া পাইয়া গরুগুলি যে লাফ দিয়া কোন্ দিকে পলাইল, তাহা আর দেখা গেল না।

বাঘ শুইয়া শুইয়া অপাঙ্গে চাহিয়া সব দেখিল। কিন্তু একটা গরুও ধরিবার চেষ্টা করিল না। শুধু সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এইবারে বাঘটাকে বন্দী করা যায় কি করিয়া? গোয়ালঘরের শিকল সাধারণত আল্‌গাই হয়। কিন্তু নামিয়া শিকল লাগাইবে কে? আবার কয়েক-জন লোক সেইখানকার চালের খানিকটা অংশের খড় সরাইয়া ফেলিল এবং বারকয়েক চেষ্টা করার পর সেই কাস্তে বাঁধা লগিটা দিয়া অবশেষে শিকল তুলিয়া দিতে সক্ষম হইল। প্রথমে উপর হইতেই বেশ ভালো করিয়া দেখা হইল শিকল ঠিক লাগিয়াছে কি না। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, শেষে একজন সাহসী ব্যক্তি নামিয়া আসিয়া, তাহার উপর একটা ভারি তালা বেশ শক্ত করিয়া লাগাইয়া দিল।

এত বড় সাফল্যে চালের উপর মহোৎসব লাগিয়া গেল। কতকগুলো ছোক্‌রা চালের মট্‌কার প্রায় সমস্তটারই খড় উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হৈ হৈ

করিতে লাগিল।

সে খবর শুনিয়া গোকুল মহান্ত আবার চিৎকার করিতে লাগিল, ওরে বাবারে, ছোঁড়ারা মিলিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিল রে। একে তাহার খড নাই। খড়ের অভাবে বহুকাল গোয়ালঘর সংস্কার করিতে পারে নাই। তাহার উপর যে সামান্য আচ্ছাদন ছিল, তাহাও পাঁচ শয়তানের পাল্লায় পড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

গোকুল শাসাইতে লাগিল, নষ্টামি দেখিয়া দেখিয়া তাহার চুল পাকিয়া গেল। সে আর নষ্টামি বোঝে না? ও সব বাঘ-মারা তো নয়, তাহার সর্বনাশ করা। একবার কাছারি খুলুক, তারপর সে সকলের নামে এক এক নম্বর ঠুকিয়া খেসারত আদায় করিয়া ছাড়িবে, তবে তাহার নাম গোকুলচন্দ্র দাস মহান্ত।

কিন্তু গোকুলের কণ্ঠ রুদ্ধগৃহের বাহিরে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল না। পৌঁছিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিবার মতো মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। তাহারা উপর হইতে বাঘের উপর বড় বড় ইট, পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাতে অবশেষে বাঘ যেন অত্যন্ত বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চালের উপরকার লোকদের প্রতি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লোকে মাঝে মাঝে বর্শা ছুঁড়িয়া মারে। কোনোটা গায়ে আসিয়া ঢপ্ করিয়া পড়ে, কোনোটা মেঝেয় বিঁধিয়া যায়। বাঘটা মাঝে মাঝে লাফ দিবার ভয় দেখায়। কিন্তু লাফ দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না জানিয়াও লোকেরা ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। তাড়াতাড়িতে পরস্পরের মাথায় মাথা ঠুকিয়া যায়, মাথা ফুলিয়া ওঠে।

অবশেষে স্থির হইল, এমন করিয়া কিছুই হইবে না। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র লোকের বন্দুক আছে। তাহাকেই ডাকিয়া আনা হউক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিল কাশী হালদারের বাড়ি। হালদার বাড়িতেই ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর তাহার বড় ছেলে আসিয়া বলিল,—বাবা মাথার অসুখে শয্যাগত।

—তা হোক। তাকে উঠতেই হবে। বাঘটাকে মহান্তদের গোয়ালে বন্দী করেছি। গুলি করে মারতে হবে।

ছেলেটি বাড়ির ভিতরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে। কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না।

লোকগুলিও নাছোড়বান্দা। তাহারা বলিল,—উঠতে পারবে না কি রকম! এখান থেকে আমরা তার গলা শুনতে পাচ্ছি। সেতো উঠেই আছে।

ছেলেটি আবার বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, না তিনি কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, গুলির নিশানা হইবে না।

—তবে বন্দুকটা দিতে বল। আমরা অন্য লোক দিয়ে গুলি করাবো। বড় বাবুই করতে পারবেন, কি বল হে চন্দরা?

এমন সময় কাশী হালদার মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টি হাসিয়া বলিল,—বন্দুক দোব কি করে হে? আমি ছাড়া আর কারও ও বন্দুক ছোঁবার 'লাইসেন্' আছে?

লোকগুলি সকাল হইতেই উত্তেজিত হইয়া ছিল। এখন চটিয়া বলিল,—তাহলে বাঘ মারার কি হবে?

হালদার অবলীলাক্রমে হাতের তালু উল্টাইয়া বলিল,—তা আমি কি জানি!

এ কথায় লোকগুলি চটিয়া আগুন হইল। বলিল,—তুমি জান না, বটে? তোমাকে গাঁয়ে বাস করতে হবে না? ছেলে মেয়ের বিয়ে পৈতে দিতে হবে না? পাঁচজনকে কাজকর্মে ডাকতে হবে না? তখন দেখে নোব জানো কি না।

এবারে হালদার যেন অনেকটা নরম হইল। কহিল,—তুমি তো বলছ বটে হে, চন্দরা। কিন্তু তিনটি বুলেটের দাম একটি টাকা। টাকাটা দেবে কে শুনি? তুমি দেবে?

—আমি কেন দেব? দরকার যদি হয়, গাঁয়ের ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে।

—ওঃ, ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে! তবেই হয়েছে!—হালদার ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিল।

চন্দরা অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া কহিল,—আচ্ছা, একটা টাকা তুমি আমার কাছেই নিও হে। তারপর সে চাঁদা তুল্‌তে হয়, যা করতে হয়, আমি বুঝবো।

মানুষের বিপদের সময় মোচড় দিয়া অমনি ভাবে টাকা আদায়ের অভ্যাস হালদারের চিরকালের। সে সন্দিগ্ধভাবে চন্দরার পানে চাহিয়া বাড়ি যাইতে যাইতে বলিল,—দেখো ভাই চন্দরা, বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে কথাটা বল্‌লে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমি আর কি বলব?

হালদার বাড়ির ভিতরে চলিয়া যাইতেই চন্দরা পাশের লোকটির গা টিপিয়া বলিল,—তিনটি বুলেটের দাম এক টাকা। শুনেছ হে! কার্য তো উদ্ধার হোক্, তারপরে দেখা যাবে কত জলে কত মুস্থরি ভেজে।

হালদারকে পরম সমাদরে গোয়ালঘরের চালের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে তিনটি বুলেট। কিন্তু নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়াও ব্যাঘ্রের চাল-চলন, সক্রোধ

দৃষ্টি দেখিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

—উহুঁ, অমন করে নয়,—অমন করে নয়। একটা দাবা বাঁশ চালের ভেতর দিয়ে নামিয়ে দাও। দিয়ে জনপাঁচেক বলবান লোক সেইটে বেশ বাগিয়ে ধর,—যেন নড়ে না। আর আমার মাজায় দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁধ। দেখছ না, বাতের যন্ত্রণায় মাজা হিল্‌ছে।

তাহাই করা হইল। বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া হালদারকে বাঁধা হইল, যাহাতে তাহার কোমর না নড়ে। তারপরে হালদার বেশ করিয়া বন্দুক উঁচাইতেই বাঘটা থাবা গাড়িয়া বসিয়া নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে তাহার বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কোন রকমে ঘোড়াটা টিপিতেই গুড়ুম করিয়া একটা আওয়াজ হইল। এই পর্যন্ত হালদারের মনে আছে। তারপরে কখন যে গুলি খাইয়া বাঘটা ভীষণ গর্জন করিয়া চালের মটকা পর্যন্ত লাফাইয়া উঠিল, আর কখনই বা তাহার বন্দুকটা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, সে সকল কিছুই মনে পড়ে না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল বাঘটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ দিয়া অঝোরে রক্ত গড়াইতেছে,—সে রক্তে গোয়ালঘরের মেঝে কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। আর লোকগুলো সেই ভারি বাঁশটা দিয়া বাঘের মুখে-পেটে ক্রমাগত গুঁতাইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত দেখিয়াও সে কিছু মাত্র উৎসাহিত হইল না। যেন শুধু বলিল,—একটু জল।

বাঘ মরিয়াছে! বাঘ মরিয়াছে!

কথাটা শুনিয়া মানুষের দেহে প্রাণ আসিল। যে যাহাকে দেখে, সেই তাহাকে উৎসাহের সঙ্গে সংবাদটা দেয়, যেন সে-ই বাঘটা মারিয়াছে। মেয়েরা তো সমস্ত দিনের পর বাহিরে আসিয়া আলোর মুখ দেখিয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়ে লইয়া দুরু দুরু বক্ষে ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ছেলেদের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, যে কেহ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করিতে সাহস করে নাই।

অপরাহ্ন বেলায় একখানি মহিষের গাড়িতে বাঘের মৃতদেহ লইয়া লোকে গ্রাম-প্রদক্ষিণে বাহির হইল। ছেলেরা মরা বাঘের উপর অকারণেই মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে জন্তুটা এত লোককে জখম করিয়াছে, এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সমস্ত দিন একপ্রকার অনাহারে রাখিয়াছে, তাহার প্রতি ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। মরার পর জানা গেল, বাঘটার বসন্ত হইয়াছিল। সেইজন্য সে বেশ কাবু হইয়াছিল! নহিলে তো গ্রামে আর লোক রাখিত না। তাহাকে যে এখন সকলে খোঁচা দিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

মহান্তদের গোয়াল হইতে মিছিল বেণেপাড়ার ভিতর দিয়া ঠাকুরপাড়ায় পৌঁছিল। প্রথমে হরিহর ঠাকুরের বাড়ি, তার পরেই চাটুয্যে বাড়ি। বাঘের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যেগিন্নী একটা ঘটি হাতে করিয়া আসিয়া একবার সাশ্রুনেত্রে বাঘটার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—কা'র শাপে এসেছিলি বাবা! বাঘ তো নোস্, বাঘ হয়ে ছলতে এসেছিলি! আমি যে তোকে দেখেই চিনেছি!

চাটুয্যেগিন্নী ঘটির জল দিয়া বাঘের চারিটি পা ধুইয়া দিয়া, পথের উপরেই গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী এমনি মজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চাটুয্যেগিন্নীর কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনিও ছুটিয়া বাড়ির ভিতর হইতে একঘটি জল আনিয়া বাঘের চরণ প্রক্ষালন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পুত্রকন্যার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

এক মুহূর্তে বাঘ দেবতা হইয়া গেল। কাহার শাপে তিনি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছেন, কেনই বা এই গ্রামের নিরীহ বাঙালী সন্তানকে এতক্ষণ ধরিয়া ছলনা করিলেন এবং চাটুয্যেগিন্নীই বা শকটারূঢ় মৃত ব্যাঘ্রদেহ দেখিয়া কি করিয়া চিনিলেন, এ সকল বিষয়ে চাটুয্যেগিন্নীকে কেহ কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও প্রয়োজন বোধ করিল না। যে পথে বাঘ যায় তাহার দু-পাশে কাতার দিয়া মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল এবং বিসর্জনের প্রতিমাকে যেমন মহা ভক্তিভরে গলদশ্রুলোচনে বিদায় দেয়, তেমনি করিয়া বিদায় দিতে লাগিল। বাঘের বড় বড় থাবা সধবা মেয়ের দেওয়া সিন্দুরে রাঙা হইয়া উঠিল।

যে কয়টা ছোঁড়া এতক্ষণ খোঁচা দিতেছিল, বড়দের তাড়া খাইয়া তাহারা পিছনে হটিয়া গেল এবং বড়দের মুখ দেখিয়া মনে হইল, বাঘটাকে চালচিত্র দিয়া ঘিরিয়া প্রতিমার মতো সাজাইয়া লইয়া যাইবার উপায় থাকিলে, তাহারা কাঁধে করিয়াই গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিত।

মৃত্যুর রূপ

ডাক্তারে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া।

হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। টাইফয়েড্‌ কিম্বা নিউমোনিয়া, কলেরা কিম্বা কালাজ্বর, কিম্বা অন্য যে কোন একটা ল্যাটিন নামের শক্ত রোগ হলেও ক্ষতি ছিল না। তাতে রোগের লক্ষণের হয়ত তফাৎ হত, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনেরও, কিন্তু আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি তখন পরলোকের যাত্রী। আমার কাছে তখন যাওয়ার সমস্যাটাই মুখ্য, যানের সমস্যাটা গৌণ। অসংখ্য লতা-পাতা-ফুলে ভরা এই পৃথিবী, তারায় ভরা এই আকাশ. চেনা-অচেনা অগণিত লোকের প্রতিদিনের স্পর্শ। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে যাওয়ার দিনক্ষণ যদি ঠিক হয়ে গিয়েই থাকে, তা হলে কিসে চড়ে যাচ্ছি, ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া না টাইফয়েড তা নিয়ে মাথা ঘামানো মিথ্যে।

তবে ডাক্তারে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। আমিও বলি তাই। অর্থাৎ আমার তাতে আপত্তি নেই।

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ কোনদিন? দেখেছ মৃত্যুর রূপ? সরীসৃপের মতো লক্‌লকে জিহ্বা দিয়ে কেমন করে লেহন করে নেয় মানুষের প্রাণশক্তি, অনুভব করেছ কখনও? ঠাণ্ডা হয়ে আসে পায়ের পাতা, তারপরে হাঁটু, কোমর, বুক। পরাজিত রাজার মতো একটি একটি ঘাঁটি ছাড়তে ছাড়তে প্রাণশক্তি আশ্রয় নেয় রাজধানীর সর্বশেষ দুর্গের অভ্যন্তরে। একটির পর একটি অঙ্গ স্তিমিত হয়ে মৃত্যুর ধূমল স্পর্শের কাছে করে আত্মসমর্পণ। দুর্দান্ত শত্রু পরিবেষ্টিত রাজা দুর্গকোণে বসে ধুক্‌ধুক্‌ করে কাঁপতে থাকে। তারপরে সেই শেষ আশ্রয়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। রাজারও কাঁপুনী আসে ঝিমিয়ে। যুদ্ধেরও সমাপ্তি হয়।

তারপরে?

ধোঁয়া।

ধোঁয়ার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী, যা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো প্রথমে এসে পায়ের তটদেশে আঘাত করছিল, দেখতে দেখতে সমস্ত চৈতন্যকে তাই গ্রাস করে ফেলে।

এর নাম মৃত্যু।

একদা এই মৃত্যুর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি অনুভব করেছি, সেই সরীসৃপের লেহন। তার ধূম্র বাহিনীর স্পর্শহীন আঘাত শুধু টের পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় না। পরম মৃত্যুকে তেমনি করে একদিন আমার চেনবার

সুযোগ ঘটেছিল

সপ্তমী পূজোর দিন।

ভোরের দিকে সানাইএর সুরে ঘুম ভাঙল। দেখি মাথা তোলা যায় না, এত ভারি হয়েছে। বেশ শীতও করছে। চেয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। পূজোর আয়োজনে এত ভোরেই সব উঠে গেছে। তাদের কলরব ওপরে বসেই শুনতে পাচ্ছি।

একটা কিছু গায়ে দেবার দরকার। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে কোথাও কিছু খুঁজে পেলাম না। শুধু বাচ্চুর দলিত-মর্দিত ছোট্ট বিছানাটি এক পাশে পড়ে রয়েছে।

ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় বোধ করি আমাকে ডাকবার জন্যেই গৃহিণী এলেন।

বললাম, একটা কিছু গায়ে চাপিয়ে দাও তো।

গৃহিণী চমকে উঠলেন। বললেন, সে আবার কি?

—জ্বর।

—তাই নাকি? দেখি।

হাত দিয়ে ললাট স্পর্শ করে গৃহিণীর মুখ শুকিয়ে গেল।

—উঃ! এযে খুব জ্বর! দেখ তো কাণ্ড! বাড়িতে পূজো। কোথায় খাটবে-খুটবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, তা না জ্বর করে বসলে ঠিক এই সময়েই।

গৃহিণী একটা লেপ আমার গায়ে বেশ করে গুছিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, আর আমি নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম। সত্যিই কাজটা ভালো হয়নি। জ্বর মানুষের হয়, আমারও হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে? যখন নিজের বাড়িতে পূজো? যখন বাইরে সানাই বাজছে? সময় নির্বাচনের দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে, জ্বরের সময়টা ঠিক উপযোগী হয়নি।

তারপর থেকে গৃহিণী একবার বাইরে গিয়ে পূজার্চনা, কাজকর্ম দেখে আসেন আর একবার আমার শয্যাপার্শ্বে এসে ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করেন। উত্তাপ কেবলই বেড়ে চলতে লাগল। ১০২° থেকে তিন, তা থেকে চার, বারোটার সময় উঠল পাঁচ। বাইরের আনন্দ উৎসব কলরব, পূজা-অর্চনা, বাইরেই পড়ে রইল। সবাই এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন। তাঁদের মুখে উদ্বেগের চেয়ে অপ্রসন্নতার লক্ষণই বেশি।

একশো পাঁচ জ্বর অবশ্য খুব বেশি। কিন্তু ম্যালেরিয়ার দেশে তাও খুব বেশি নয়। অর্থাৎ উদ্বেগের কারণ নেই। কিন্তু কাল মহাষ্টমীর রাত্রে থিয়েটার আছে। তার পরদিন লোকজন খাওয়া আছে। সে সব দেখবেই বা কে? করবেই বা কে?

ডাক্তার এসে বলে গেলেন, ম্যালেরিয়া। জ্বর একটু বেশি হয়েছে।

বলে গেলেন, মাথাটা বেশ করে ধুয়ে ফেলে কপালে জলপটি দিতে।

ভীষণ শীত এবং কাঁপুনী! মাথার স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সব কথা ঠিক মনে পড়ে না। বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল।

কেবল মনে পড়ে রায় বাড়ির জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, ওকে মহিমের পাঁচন খাইও ঠাকুরপো। মহিম কবরেজ তো নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আমাদের পুটুকে সেবার, দেখেছ তো?

পাঁচটার পরে আমার ঘুম ভাঙল। গায়ে ঘাম দেখা দিলে। শীত এবং কাঁপুনী দুই-ই অনেক কমে গেল। আমি চোখ মেলে চাইলাম! তখন উত্তাপ একশো একের কিছু বেশি! জ্বর ছেড়ে আসছে। ম্যালেরিয়াই বটে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, বাবা! কি ভয়ই হয়েছিল!

ললাটে যুক্তকর ঠেকিয়ে তিনি মা দুর্গাকে প্রণাম জানালেন।

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে গৃহিণীও কটাক্ষে হাসলেন। ভাবটা, এত ভয়ও তুমি দেখাতে পার!

ভ্রাতুষ্পুত্র মিণ্টু সকালে আমার কাছ থেকে এক বাক্স তারাকাঠির প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল। বেচারা কতবার যে এসে ফিরে গেছে কে জানে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে কথা মনে পড়ল। বেচারার মুখখানি শুকনো। তারাকাঠির লোভ আছে, কিন্তু সকালের সে উৎসাহ নেই!

মা বললেন, কি গো, তুমি কি মনে করে?

মিণ্টু লজ্জায় দরজার সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

বললাম, কি রে, তারাকাঠি? এই নিয়ে যা।

বালিশের নিচে থেকে ম্যানিব্যাগটা বার করে ওর হাতে একটা সিকিই দিয়ে দিলাম।

মিণ্টু আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না।

আমরা হাসলাম।

পাঁচটায় উত্তাপ স্বাভাবিক হল।

এতক্ষণ মা আমার কাছে বসেছিলেন। নিচের কাজকর্ম সেরে গৃহিণী আমার ঘরে আসতেই মা বললেন, তুমি একটু বোসো বৌমা। আমি গা-টা ধুয়ে আসি।

মা চলে যেতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন এখন কেমন আছ?

—ভালো।

—জ্বরটা ছাড়ছে, নয়?

—হ্যাঁ।

গৃহিণী ললাটের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছিয়ে বললেন, এত ঘামছ কেন বল তো? বোধ হয় জ্বরটা ছাড়ছে, সেইজন্যে।

গৃহিণী যেন ঠিক প্রসন্ন হলেন না। আপন মনেই বললেন, তাই বলে এত ঘাম!

ভারি ভারি লেপ দু'খানা তুলে ফেলে দিয়ে একটা পুরু চাদর আমার গায়ে ঢেকে দেওয়া হল।

বললেন, কাল থিয়েটার। কানু ঠাকুপো এসে আমার শাড়ি আর ব্লাউজ চেয়ে গেছে। ও বুঝি রাণী সাজবে।

—হুঁ।

—তোমার তো আর দেখা হবে না।

—কেন? জ্বর তো ছেড়ে গেছে।

—তা হলেও এই হিমে ওটি চলছে না। আজ জ্বর উঠেছিল অত, আর কাল থিয়েটার দেখা! সখটুকু খুব!

মনে-মনে একটু বিরক্ত হলাম। কিন্তু প্রকাশ্যে সাড়া দিলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, পূজো হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। প্রসাদ বিলি হচ্ছে। মা গেলেন সেই জন্যে।

—এত দেরিতে?

সস্নেহে আমার মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে গৃহিণী মৃদু হাস্যে বললেন, বেশ! যে কাণ্ড তুমি বাধিয়েছিলে? সারা দুপুর আমরা কি কেউ পূজোর দালানে যাবার সময় পেয়েছিলাম?

সে ঠিক। একটু সুস্থ হতেই ওই কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। শীতল করস্পর্শে চোখ জড়িয়ে আসছিল। চোখ বন্ধ করে সেই স্পর্শ গভীর আলস্যে অনুভব করতে লাগলাম।

—কিন্তু মিতু অত ঘামছ কেন?

—জ্বরটা ছাড়ছে বলে।

—এঁত ঘাম ?

গৃহিণী কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন :

—ডাক্তারকে আর একবার খবর দিই বরং।

—পাগল নাকি ! ম্যালেরিয়ার জ্বর এমনি ঘাম দিয়েই ছাড়ে, জান না ?

চিন্তিত মুখে গৃহিণী বললেন, এত ঘাম !

—তাই হয়।

—হোক বাপু, আমি একবার ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই।

তাঁর কণ্ঠে সুস্পষ্ট উদ্বেগের স্বর। ক্রমশ যেন তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমার কোন নিষেধই শুনলেন না। স্ত্রীলোক স্বভাবতই উত্তেজনাপ্রবণ, এই কথা মনে করে আমি কিছুটা বিরক্তভাবে, কিছুটা নিরুপায়ভাবে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম।

মহিম কবিরাজ যত বড় কবিবাজ, পশার ততটা নয়। সে দোষ তাঁর নয়, বর্তমান যুগের। যেখানে আজ পাড়াগাঁয়েও ধুতির উপর বুকখোলা কোট এবং কোটের পকেটে স্টেথোস্কোপ নিয়ে কলকাতার পাশ করা ডাক্তার আছে, সেখানে উত্তরীয়মাত্রসম্বল কবিরাজ যথেষ্ট পণ্ডিত হলেও অচল।

মহিম কবিরাজেরও সেই অবস্থা। লোকে যখন তাঁকে ডাকে, তখন ফি দিতে হবে না বলেই ডাকে। যখন ফি দিতে পারে, তখন ডাকে নিবারণ ডাক্তারকে। ফি ছাড়া তিনি এক পাও চলেন না।

আমার লোক যখন নিবারণ ডাক্তারকে ব্যস্তভাবে ডাকতে যাচ্ছিল, কবিরাজ মশাই তখন পূজোর দালানে পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

লোকটিকে ব্যস্তভাবে ছুটে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বাপু, এত ছুটে যাও কোথায় ?

— আজ্ঞে ডাক্তার ডাকতে।

— কি ব্যাপার ? কার অসুখ ?

—বড়দার।

যাঁরা আলোচনা করছিলেন, সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকলেই জানতেন, জ্বর ছেড়ে আসছে। ভয়ের কারণ নেই। ইতিমধ্যে এমন কি ঘটতে

পারে যার জন্যে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হল, ভেবে সকলেই চিন্তিত হলেন।

—চল তো কবরেজ, দেখে আসা যাক।

—চল।

এই ঘটনা অবশ্য পরে শোনা। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি তা এই যে, কবিরাজকে পুরোভাগে করে আমার ঘরে একটি দল লোক প্রবেশ করলেন।

আমি মনে-মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। বাড়িতে পূজো। কাজকর্ম উদ্যোগ আয়োজন অনেক কিছু আছে। সেই অত্যন্ত আবশ্যকীয় কাজকর্মের মধ্যে অকস্মাৎ আমাকে নিয়ে এই অনাবশ্যক সমারোহ অত্যন্ত অশোভন বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এই অশোভনতা সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোকেই দেখাতে পারে, এই ভেবে আমি নিঃশব্দে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। সেই সঙ্গে অবশ্য এই বিশ্বাসও ছিল যে, কবিরাজ মহাশয় যখন এসেছেন, তখন এই বিড়ম্বনা অধিককাল স্থায়ী হবে না। তাঁর বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, ব্যাপারটা গুরুতর কিছুই নয়। শুধু জ্বরটা ছাড়ছে, তাই এই প্রবল ঘামের প্লাবন।

ঔৎসুক্যের সঙ্গে দক্ষিণ হস্ত কবিরাজের দিকে প্রসারিত করে দিলাম। কবিরাজ মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাইতে চাইতে পরম ঔদাসিন্যের সঙ্গে হাতখানি তাঁর দুই হাতের মধ্যে তুলে নিলেন।

অনেকক্ষণ তিনি নাড়ি টিপতে লাগলেন। কতক্ষণ জানি না। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ। নিশ্বাস পতনের মৃদু শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত সকলের মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া যেন নেমে আসছে। কবিরাজ মহাশয়ের মুখ যেন ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যেতে লাগল।

হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

—কেমন দেখলে কবরেজ?

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে কবিরাজ শুধু হাতের ইঙ্গিতে আমার একটি ভাইকে ডাকলেন। বললেন, তুমি ছুটে গিয়ে ঘণ্টাকে বল, আলমারীর সব উপরের তাকে ডান দিকের কোনে যে মকরধ্বজ আছে সেইটে নিয়ে আসতে। জলদী।

বাড়ির মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা বাপু, তাড়াতাড়ি করে একটু মুসুরি ডালের যুশ করে নিয়ে এস। এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেক না।

—কি রকম দেখলে কবরেজ?

অন্যমনস্কভাবে তিনি শুধু বললেন, হুঁ।

ঠিক সেই সময়েই ডাক্তার এলেন। নিবারণ ডাক্তার পাতলা, মাঝারি গোছের লোক। অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ। হাত, মুখ, চোখ সকল সময়েই অত্যন্ত বেশি মাত্রায় সক্রিয়।

দরজার গোড়া থেকেই তাঁর হাঁক-ডাক শোনা গেল ঃ

—কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? দেখি ভিড় ছাড়ুন। এই যে বোক্‌রেজ. কেমন দেখলে ?

ডাক্তার কবিরাজকে বোক্‌রেজ বলেন।

ভিড় সরিয়ে তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। নাড়িটা একবার দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কবিরাজের দিকে চাইলেন। কবিরাজ হতাশভাবে শিরঃ-সঞ্চালন করে কি জানালেন তিনিই জানেন। বোধ হয় এই জানালেন যে, নাড়ি নেই।

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমার বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কবিরাজ-পুত্র ঘণ্টা এল খল-নুড়ি মকরধ্বজ নিয়ে, যে মকরধ্বজ আলমারীর বিশেষ একটা কোণে সযত্নে এবং সঙ্গোপনে লুক্কায়িত ছিল, বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায়। আর বাড়ির মেয়েরা নিয়ে এলেন মুসুরির ডালের যুশ।

উভয় পদার্থই একটু একটু খেলাম। তার উপর খেলাম ডাক্তারের দেওয়া ব্রাণ্ডি। এরও উপর সমবেত সকলে কড়ায়ে রক্ষিত কাঠের আগুনে হাত তাতিয়ে তাই দিয়ে আমার হাত-পা ঘষতে আরম্ভ করলেন।

আমি নিঃসাড়ে পড়ে পড়ে এই অত্যাচার সহ্য করতে লাগলাম নিরুপায়ভাবে।

দু'জন ডাক্তার কানের কাছে চুপি চুপি কথা কইছেন, ইংরেজিতে :

—নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে ?

—না।

—বড় জোর তিনটে পর্যন্ত, কি বল ?

—তার বেশি নয়।

—ইনজেক্‌শন ধরছে না ?

—একেবারেই না।

—হুঁ। তিনটের বেশি নয়।

চোখ বুজে অসাড়ে শুয়ে শুয়ে ওঁদের দিকে চাইলাম। মনে হল ওঁদের দু'জনেরই মুখ নোড়ার মতো লম্বা হয়ে গেছে।

তিনটে ? তার পরে সব শেষ হয়ে যাবে ? তার পরে আর আমি থাকব না ? শুধু পড়ে থাকবে এই দেহ, যা আমাকে অসীম মমতায় এতকাল ধরে ঘিরে রেখেছিল ? যা আমার এত কালের পরিচয় ? আমার আত্মার পরিচয়ে যা এতকাল পরিচিত হয়ে এসেছে ? আমার সেই পরিত্যক্ত ভ্রান্ত পরিচয়কে ঘিরে উঠবে রোদনের কলরব ?

আমি হাসলাম।

কিন্তু তিনটে? ভোর তিনটের অন্ধকারে চোরের মতো চলে যাওয়া? সে কি রকম হবে? আলো জাগবে না, পাখী ডাকবে না, দক্ষিণের জানালার গা ঘেঁষে ফুলে-ভরা শিউলী গাছ পাতার আঙুল তুলিয়ে আমায় শেষ বিদায় দেবে না—সে কি রকম হবে?

আমার মনটা দমে গেল।

চারিদিক ঘিরে অসংখ্য লোক। কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ ভালোবেসেছিল, কেউ বাসতে পারেনি। এদেরই জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। এদের সবারই চোখে আজ জল!

কিন্তু এদের মুখ অমন লম্বা হয়ে গেল কেন?

ঘরে বিশ্রী ধোঁয়া। সব আবছা দেখাচ্ছে ছায়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করলাম: "ওগো মরণ, হে মরণ মোর।" ভুল তো হল না। সবই তো মনে আছে।

তিনটেয় আসবে মৃত্যু, কে জানে কেমন করে। জেগে থেকে দেখতে হবে, কেমন তার রূপ। সে কি আসে রাজার মতো বিজয়গর্বে? না বধূর মতো কুন্ঠিত চরণে? জেগে থেকে দেখতে হবে। চোখ জড়িয়ে এলে চলবে না।

গৃহিণীকে টানাটানি করছে ক'টি প্রৌঢ়া, সব শেষ হবার আগে শেষ বারের মতো দুটি মাছ ভাত খেয়ে নেবার জন্যে। ওর সিঁথির সিঁদুর যেন জমাট রক্তের মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছে! আমার পা ছেড়ে ও নড়বে না কিছুতেই। কিন্তু ওরাও ছাড়বে না। অবশিষ্ট জীবনকালের জন্যে যার খাওয়া-শেষ হতে চলেছে, শেষবারের জন্যে তাকে দুটি খাইয়ে দেওয়া নিতান্তই চাই।

কিছু কি বলবার আছে ওকে? কিছু না। এতগুলি বসন্ত এসেছে, গেছে; তার মধ্যে বলা যদি শেষ হয়ে না গিয়ে থাকে, এই শেষ মুহূর্তে আর কি বলতে পারি আমি?

মাকে নিয়ে কারা যেন কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বোধকরি যত দেবতার দোরে দোরে। তাছাড়া আর কোথায় হবে? কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে আসছেন আর এঘরে ফিরে এসে মেঝেয় লুটোচ্ছেন।

কিন্তু ঘরে এত ধোঁয়া কেন? ভালো করে সবারই মুখ দেখা যাচ্ছে না যে!

দেওয়ালে কে যেন হিজিবিজি কি লিখে দিয়ে গেল! দেওয়ালের গা ঘেঁসে

কারা যেন ছায়া-ছবির মতো একটির পর একটি এসে দাঁড়ায়।

গান্ধিজী? কিন্তু অত লম্বা নাক কেন?

চার্লি চ্যাপলিন? চুলগুলো অত খাড়া কেন?

ও কার ছবি আলেয়ার মতো ঘন ঘন একবার নিভছে একবার জ্বলছে? অমন করে ও কেবল ডাকছে কেন?

তিনটে বাজতে আর কত দেরি?

পরলোক, সে কোথায়? আমি কোথায় চলেছি? বৈতরণীর উপর দিয়ে? হাত-পা অবশ হয়ে আসে কেন? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যে!

পরলোক আর কতদূর? তার চিহ্নমাত্রও তো দেখা যায় না,—না দূরের বনলেখা, না ভেসে-আসা অস্পষ্ট কলরব।

-- আর ভয় নেই কাকা, এযাত্রা বেঁচে গেল।

কে কথা বলছে? নিবারণ ডাক্তার? কে বেঁচে গেল? আমি? ফিরে এসেছে নাড়ি?

কে যেন কেঁদে উঠল না?

বাবা?

কি হল তাঁর? উঠতে পারছেন না যে? সারারাত ঠায় উবু হয়ে বসে থেকে কোমর বেঁকে গেছে! ও কি হল? মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন যে!

মৃত্যুকে দেখতে চেয়েছিলাম।

অবশেষে তাকে দেখতে পেলাম। পেলাম, দেওয়ালের গায়ে হিজিবিজি লেখায় নয়, বিচিত্র দর্শন মূর্তির মধ্যে নয়, আলেয়ার মতো জ্বালাময় চোখের দৃষ্টিতেও নয়।

তাকে দেখলাম, আমার বৃদ্ধ পিতার ভূলুণ্ঠিত দেহে, আমার মায়ের উদাসীন রূপে, আমার স্ত্রীর ধূমাঙ্কিত চোখের কোটরে। তাকে দেখলাম, একান্ত প্রিয়জনের উদ্বিগ্ন চোখের কাতরতায়। কি নিষ্ঠুর সে রূপ!

শনি রবি সোম

এবারে বর্ষার প্রকোপটা কিছু বেশি। গত শনিবার বৃষ্টি নামিয়াছে, আর এক শনিবার শেষ হইতে চলিল, কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পল্লীগ্রামে কাদা তো আছেই। কিন্তু এই ঝম্ ঝম্ শব্দ যেন আরও পাগল করিয়া তুলিল। মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সোনাটিকুরীর বিল বনগ্রামের কোল পর্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠে যত দূর দৃষ্টি যায়—কেবল জল, জল, বানের গেরুয়া জল। মাঝে মাঝে যে সকল বড় বড় গাছের মাথা জাগিয়া আছে, কেবল তাহা দেখিয়াই অনুমান করা চলে, কোন্‌টা নতুন পুকুরের চক আর কোন্‌টা বামুনহাটির মাঠ।

কিন্তু ট্রেন বর্ষা মানে না। একমাত্র ভূমিকম্প ছাড়া আর কোন দুর্যোগেই বোধহয় ভয় পায় না। শনিবারের লোকাল ট্রেনখানি ঠিক আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় গ্রামের স্টেশনে আসিয়া থামিল।

দুর্যোগের রাত্রি যেমন দুর্যোগ, তেমনি অন্ধকার। প্লাটফর্মে গোটা কয়েক আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তা এত দূরে দূরে এবং বৃষ্টির ছাঁটে এমন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে যে, অন্ধকার খুব সামান্যই কমিয়াছে। এ ট্রেনে চড়িবার জন্য একখানা টিকিটও বিক্রি হয় নাই। রাত্রের অবস্থা দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার আশা করেন, এখানে নামিবার যাত্রীও কেহ নাই। সুতরাং ভারি বর্ষাতিটা গায়ে দিয়া এবং হাতে একটা রেলের বাতি লইয়া কোন রকমে গাড়িখানাকে পত্রপাঠ বিদায় করিবার জন্য ভদ্রলোক হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছেন, এমন সময় সামনের থার্ড ক্লাস হইতে নামিল দুইটি কাপড়ের পুঁটলি, একটি প্রজ্বলিত হারিকেন এবং একটি ভদ্রলোক। পুঁটলি দুইটির অবস্থা মলিন। হারিকেনে এত কালি পড়িয়াছে যে, বড় জোর সেইটাকে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী আর কিছু নয়, এবং সেই স্বল্পালোকে স্পষ্ট করিয়া দেখা না গেলেও বোঝা যায়, ভদ্রলোকের অবস্থাও উক্ত অস্থাবর বস্তু কয়টি অপেক্ষা আশাপ্রদ নয়।

স্টেশন-মাস্টারকে দেখিয়াই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে···আমাদের রতন আসেনি মাস্টার মশাই?

বলিয়া ছাতাটা মেলিয়া মাথায় ধরিলেন। ছাতার আদিম কালো কাপড়ের উপর আর একটা শাদা কাপড় বসানো হইয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটা, বোধ

হয় বিড়ি-সিগারেটের কাণ্ড। শ্বেতছত্র বর্ষার ধারা নিবারণ করিতে না পারিয়া যেন ক্রোধবশে পর্জন্যদেবকে ভেঙচাইতে লাগিল।

ভদ্রলোকের অনুনাসিক, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মাস্টারমশাই প্রথমটা চমকাইয়া গেলেন। কিন্তু হাত-বাতির আলোটা তাঁর মুখের উপর ফেলিয়া তখনই বলিলেন, আরে! দত্ত মশাই যে! বিলক্ষণ! এই দুর্যোগেও বেরিয়েছেন।

—দুর্যোগ মানে,...ইয়ে! আমাদের রতন···

কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের তখন দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় নাই। হাত-ইসারায় দত্ত মহাশয়কে স্টেশনে উঠিতে বলিয়া তিনি ট্রেন পাস্ করিবার জন্য গার্ডের গাড়ির দিকে ছুটিলেন। দত্ত মহাশয় পুঁটলি দুইটা হাতে করিয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় স্টেশনে আসিয়া উঠিলেন।

স্টেশন-ঘরের উজ্জ্বল আলোয় এতক্ষণে দত্ত মহাশয়কে ভাল করিয়া দেখা গেল। দেখিলে মনেই হয় না, ইনি জার্মোলিন লিমিটেডের একটা ছোট বিভাগের বড়বাবু। অত্যন্ত শীর্ণ দেহের উপর একটা বর্তুলাকার শীর্ণ মাথা এমন আল্‌গোছে বসান যে, কেহ একটা কথা কহিলেই সেটা ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে থাকে। এইটুকু তো মাথা। তাহারও তিন-চতুর্থাংশ স্থান একটি বিপুল নাসিকা একাই দখল করিতেছে। বাকি এক-চতুর্থ স্থানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া, নিতান্তই ভগবানের রাজ্য বলিয়া টিঁকিয়া আছে।

প্লাটফর্ম হইতে এইটুকু আসিতেই দত্ত মহাশয় ভিজিয়া গেলেন। গায়ে একটি মাত্র লংক্লথের পাঞ্জাবি। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেটা গায়ের সঙ্গে ল্যাপ্টাইয়া গিয়াছে। জোলো হাওয়ায় ভদ্রলোক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। করিবার মত কোন কাজ হাতের কাছে না পাইয়া, দত্ত মহাশয় বিরলকেশ মাথাতেই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাস্টার মহাশয় দুম্ দাম্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভারি বর্ষাতিটা ডান দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আর মাথার বর্ষাতি টুপিটা বাঁ দিকে। তারপর একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, তারপরে? দত্ত মশাই? এই দুর্যোগেও বেরুলেন।

মাস্টার মহাশয়ের যেমন কলেবর তেমনি কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে আর সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করে না, এত ক্ষীণ মনে হয়। সে ক্ষেত্রে দত্ত মহাশয়ের তো কথাই নাই।

তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে বলিলেন, ইয়ে···! আর বলেন

কেন মশাই! আমার হয়েছে··হুঁঃ! সবাই বললে, ঘরে চাষ করুন। তদর্থং কৃষিকর্মাণি। সেই ঝঞ্ঝাট!

মাস্টার মহাশয় অট্টহাস্যে স্টেশন-ঘর কাঁপাইয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! এই বাজারে ঘরে চাষও করবেন না কি?

সে হাসির দমকে দত্ত মহাশয়ের মাথাটা দুলিয়া উঠিল। টানিয়া টানিয়া বলিলেন, আর বলেন কেন মশাই? ঘরে চাষ, তাও একটিমাত্র মোষ পাওয়া গেছে। আর একটা···হুঁ!

—আর একটা কি হল বললেন?

—হবে আবার কি? সে এখনও হাটে।

মাস্টার মহাশয় আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—হাটে কি মশাই! সেটা কি সেইখানে থেকেই চাষ করবে না কি? বিলক্ষণ!

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দত্ত মহাশয় বলিলেন, গতিক সেই রকমই। বর্ষা পড়ে গেল। লোকের অর্ধেক জমি আবাদ হয়ে গেল। আর আমি ওই আধখানা মোষ নিয়ে কি করি বলুন তো!

—মোষ কি আর পাওয়া যাচ্ছে না?

—কি করে বলব মশাই! এক একবার আসি, আর এক এক রকম · হুঁ। কিছুই বুঝি না।

দত্ত মহাশয় হতাশভাবে হাত নাড়িলেন।

টেলিগ্রাফের কলটা বাজিয়া উঠিতেই মাস্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বলিলেন, যাক্‌গে। ভিজে কাপড়ে আর বসে থাকবেন না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন যে!

দত্ত মহাশয় সর্বাঙ্গ নজর করিয়া দেখিলেন, সত্যই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন কিনা। দেখিলেন, কাঁপিতেছেন বটে। গল্প করিতে করিতে বাড়ি যাওয়ার কথাটাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চমক ভাঙিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রতনের কথাটাও মনে পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,···ইয়ে আমাদের রতন আসে নি মাস্টার মশাই?

মাস্টার মহাশয় টকাটক্ টেলিগ্রাফটা সারিয়া বলিলেন, রতন? আপনাদের সেই চাকরটা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কালো মতন···

—ক্ষেপেছেন মশাই? সে আসবে এই ঝড় বৃষ্টিতে? আপনার যা বাবু

চাকর! দিন রাত্রি গায়ে ফুঁ দিচ্ছে।

দত্ত মহাশয় দুই হাতে দুটি পোটলা তুলিয়া লইয়া বিব্রতভাবে বলিলেন, তাইত! আলোটা?

অর্থাৎ দুইটা হাতই বন্ধ, আলোটা কি করিয়া লইয়া যাইবেন? তার উপর একটি ছাতাও আছে!

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন পোটলা দুটো বরং রেখে যান। কাল সকালে আপনার রতনকে পাঠিয়ে দেবেন। সে নিয়ে যাবে।

হাঁফ ছাড়িয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন,...ইয়ে, সেই ভাল। সব হয়েছে · হুঁঃ!

শ্বেতছত্র মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় সেই দুর্যোগে স্টেশন হইতে নামিলেন।

স্টেশন হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ি মিনিট পনেরোর পথ। স্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া, বাঁয়ে আল ভাঙিতে হয়। ও দিক দিয়া একট কাঁচা সড়কও আছে বটে, কিন্তু সে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ওটা গরুর গাড়ির রাস্তা। সহজ হয় বলিয়া যাহারা হাঁটিয়া যায়, তাহারা সাধারণত এই আল-পথ দিয়াই যায়।

সোনাটিকুরীর বিল গ্রামের ওধারে। ওধারে বান আসে নাই বটে, কিন্তু যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই মাঠ ভাসিতেছে। সরু আল। কোথাও দেখা যায় কোথাও যায় না! ধূম-মলিন হারিকেনের আলো যে সাহায্য করিতেছে তাহা অতি সামান্য। ও দিকে ভাঙা ছাতা দিয়াও অজস্র ধারায় জল পড়িতেছে। দত্ত মহাশয় কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত বেশ সামলাইয়া পরিয়া আন্দাজে পা টিপিয়া পথ চলিতে লাগিলেন! চাষীরা জমির জল-নিকাশের জন্য মাঝে মাঝে আল কাটিয়া দিয়াছে। সে দিক দিয়া প্রবল স্রোতে জল নামিতেছে। দত্ত মহাশয় সেই সব জায়গায় একটু থামিয়া হিসাব করিয়া পার হইতেছেন।

মাঝে মাঝে খালে পা পড়ায় দত্ত মহাশয় উল্টাইয়া পড়িতেছেন। কোথাও বা পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইতেছেন। বড় জোর ছাতাটা ছিটকাইয়া পড়িতেছে। এমনি একটা দুর্ঘটনায় মধ্যপথে আলোটা নিভিয়া গেল। দত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে নির্বাপিত আলোটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পকেটে দেশলাই ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজিয়া অকেজো হইয়া গিয়াছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখের সম্মুখে নিজের হাতখানাই দেখা যায় না। চারিদিকে গ্যাঙোর গ্যাং শব্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে। কিন্তু এই দারুণ দুর্যোগে জনশূন্য প্রান্তরে মত্ত দাদুরী সম্বন্ধে দত্ত মহাশয়ের কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না।

বরং দূরে কোথায় একটা গো-সাপ এমন ভীষণ গর্জন করিতেছে যে, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিষধর সাপের ভয়ও যথেষ্ট, কিন্তু উপায় কি? এই মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়াও যা, আগাইয়া যাওয়াও তাই। তাছাড়া দত্ত মহাশয় বাহিরে যেরূপ নির্জীব, ভিতরেও সেইরূপ নিস্পৃহ। জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের সম্বন্ধেই সমান উদাসীন।

তথাপি তাঁহার রতনের উপর রাগ হইল। লোকটার আসা উচিত ছিল। অবশ্য এই জল এবং কাদা ভাঙিয়া পথ হাঁটিবার যে দুঃখ, সে তো আছেই। রতন কিছু তাঁহাকে কাঁধে করিয়া পার করিত না। তবু এমন একলা তো চলিতে হইত না। কথা বলিবার একজন লোক তো পাওয়া যাইত।

গো-সাপটা সমানে গর্জন করিতেছে। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া কয়েকটা ব্যাঙ টুপ্ টুপ্ করিয়া নিচের জলে লাফাইয়া পড়িল। বাঁ দিকের লোকাল-বোর্ডের রাস্তার কাল্‌ভার্ট হইতে হুড় হুড় শব্দে জল নামিতেছে। তবে ভরসার কথা এই যে, পনেরো মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা লাগিলেও রাস্তা ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। গ্রামের কোলে এখানে-ওখানে সেখানে প্রায় একশ'টা আলো দেখা যাইতেছে। বেশি দূরে নয়। সেই আলোতে অবশ্য মানুষগুলিকে চেনা না গেলেও, তাহাদের চলাফেরা দেখা যাইতেছে, এবং উল্লাসের চিৎকারও শোনা যাইতেছে।

আর একটু আগাইতেই দত্ত মহাশয় তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! দত্ত মহাশয় কবি নন, তবু এক মিনিট দাঁড়াইয়া দেখিলেন। মাথায় মাথালি, পরণে একখানা করিয়া গামছা, মালসাট মারিয়া পরা, ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের কৃষ্ণবর্ণ দেহ, এক একখানা পলুই হাতে লইয়া মহানন্দে ব্যাঙের মত লাফাইয়া বেড়াইতেছে। আর মাঠের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত শতখানেক আলোর মালা। লোকগুলা 'পাউষে' মাছি ধরিতে বাহির হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের মনে হইল, দেরি যা হইবার হইয়াছে। ভিজারও চূড়ান্ত হইল। এই পথে একবার সাতবিঘার বাকুড়িটা ঘুরিয়া নিজের ডহরের বড় আড়াটা দেখিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আড়াটা বড়। সব্ জিপুকুরের জল বাঁধ ছাপাইয়া ডহরে পড়ে। বাঁধের গায়েই আড়া, বেশ ভাল মাছ পড়ে। নিজস্ব আড়া। কড়া-ক্রান্তির অংশীদার নাই। সেজন্য একটা কই, কি দু'টা মাগুর মাছ লইয়া ফৌজদারী বাধে না। ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দত্ত মহাশয় সেখানে গিয়া দেখিলেন, রতন লাঠি হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দুইটা ছেলে দুই খালুই মাছ লইয়া বাড়ি

যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। অন্ধকারে দত্ত মহাশয়ের আগমন তাহারা টের পায় নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে পড়িয়া ভয়ে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এত কাছে যে, থালুই লুকাইবারও উপায় নাই।

খানিকটা পিছনেই রতন আলোর সামনে বসিয়া আড়া পাহারা দিতেছে। সম্মুখে আলো থাকায় দত্ত মহাশয়কে চিনিতে পারিল না। অন্য কাউকে ভাবিয়া গম্ভীর মেজাজে হাঁকিল, কে রে বঙ্কা? দাঁড়ালি কেন?

বঙ্কার উত্তর দিবার শক্তি নাই। কিন্তু দত্ত মহাশয় তাহাদের যেন দেখিয়াও দেখিলেন না, এমনি ভাবে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, রতন নাকি?

মনে মনে রতনও শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দত্ত মহাশয়কে তাহার চিনিতে বাকি নাই। লাফাইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বলিল, বড় বাবু? অন্ধকারে যে?

অন্ধকারের কথাটা বড় বাবু নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হাতের নির্বাপিত হারিকেনের দিকে চাহিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন, হাওয়ায় নিভে গেল।

রতন গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, তাইতো বলছি, বড় বাবু ঠিক আসবেন। মাঠাকরুণকে বললাম, স্টেশনে যাই। তা মা ঠাকরুণ বললেন, হ্যাঁ, এই দুর্জোগে আবার মানুষ আসে! তুই বরং আড়ার কাছে দাঁড়াগে। লোকের তো ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আড়ার মাছ শেষ করে ছেঁকে নিয়ে যাবে। তাই এই দিকে এলাম। কিন্তুক, আমার মন বলছিল...আসতে বড় কষ্ট হয়েছে তো? একটা আলোও নাই।

লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীনতা, কিংবা পথের কষ্ট সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় একটা কথাও বলিলেন না। বঙ্কা এবং তাহার সহোদর ইতিমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও নিরুত্তর রহিলেন। কেবল রতনের আলোটা লইয়া আড়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াসন্তোষ সহকারে বলিলেন, মাছ তো নিতান্ত মন্দ পড়েনি রতন!

হাত কচলাইয়া রতন বলিল, তাই দেখছেন বটে। কিন্তু আমি না এসে পড়লে, শালারা এতক্ষণে সাবাড় করে দিত। চিহ্নটি রাখত না।

রতন ভিজা মাটিতে লাঠিটা ঠুকিয়া গর্বের সঙ্গে হাসিল।

—তোমার শরীর তো ভাল দেখছি না। জ্বর-টর...!

—আজ্ঞে, জ্বর পেরাই হয়। ম্যালোয়ারী জ্বর কি না।

—আর সব খবর ভাল তো? তোমার পরিবারের...

পরিবারের কথায় রতন বিগলিত হইয়া গেল। হাত জোড় করিয়া সকাতরে বলিল, আজ্ঞে পরশু থেকে মাগী সেই যে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে, আর

রামও বলে না, গঙ্গাও বলে না।

পরিবারের অমর্যাদা করা রতনের অভিপ্রায় নয়। তাহার এবং তাহার সমশ্রেণীর লোকের কথা বলিবার ধরনই এই।

দত্ত মহাশয় বিচলিত হইয়া বলিলেন, তাই তো! চিকিৎসা কি হচ্ছে? ডাক্তার-কবরেজ···

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—আজ্ঞে, সিদিকে তুটি নাই। দু' একখানা পেতল-কাঁসা যা ছিল সব বন্ধক দিয়েছি।

দত্ত মহাশয় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রতনের পারিবারিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই তো! আর...ইয়ে, মোষের ব্যবস্থা কি রকম হল?

রতন মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, আজ্ঞে, মোষ পাওয়া যাবে বই কি।

—যাবে?

—যাবে না? হাটে গেলেই মেলা মোষ! এই ডাউরিটা যাক্, তারপরে ক'টা নেবেন?

দত্ত মহাশয় মেঘের দিকে চাহিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, ইয়ে···দিন সাতেক হল লেগেছে, সহজে কি এ ডাউরি যাবে বোধ হচ্ছে?

রতন হাসিয়া বলিল, দেখুন দিকি! যাবে না তো থাকবে? কাল-পরশুর মধ্যে দেখুন তো আকাশ ফটফটে হয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, গেলেই ভাল। মোষের জন্যে আমার তো ঘুম বন্ধ। লোকের আবাদ সারা হতে চলল, আর আমাদের ..হুঁ!

রতন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইলে কি হয়, চালাকিতে তাহার জোড়া নাই। বরং ম্যালেরিয়ায় দেহ যত সূক্ষ্ম হইতেছে, চালাকিও তত সূক্ষ্ম হইতেছে। তাছাড়া দিবার মত কৈফিয়ৎও তাহার ছিল না। সে শুধু মাথাটা দুলাইয়া বলিল, দেখুন তো!

বলিয়া আলোটা তুলিয়া আড়ার স্বল্প জলের মধ্য হইতে অদ্ভুত কৌশলে খপ্ করিয়া একটা বড় মাগুর মাছ তুলিয়া দত্ত মহাশয়কে বলিল, ঠাণ্ডায় আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না বড় বাবু। এই মাছটা নিয়ে যান। মা ঠাকরুণকে দেবেন, গরম গরম হাতাভাজি করে দেবেন।

মুখে ঝোল টানিয়া বলিল,—ভিজে ভাতের সঙ্গে বড্ডাই সোয়াদ লাগে।

দত্ত মহাশয় মাছটিকে সযত্নে ধরিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। রতন আলোটা লইয়া কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়িতে দত্ত মহাশয়ের আশা সকলে ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। ন'টার গাড়ি কখন চলিয়া গিয়াছে। এখনও যখন আসিলেন না, তখন আর আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাবার আশায় অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া ছিল। আর পারিল না। একে একে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। দত্ত-গৃহিণী আপনমনে গজ্‌গজ্‌ করিয়া দশবার হেঁসেল উঠাইলেন, আর দশবার হেঁসেল নামাইলেন। ছেলেগুলা সন্ধ্যা হইতেই আহারে বসে। একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাথরের থালায় ভাতে ডালে দত্ত গৃহিণী মাখিয়া লন। একটা রেকাবিতে থাকে তরকারি। ছেলেমেয়েরা গোল হইয়া থালার চারিদিকে বসে। আর দত্ত-গৃহিণী রূপকথা বলিতে বলিতে তাহাদের পর্যায়ক্রমে খাওয়ান। সে গল্প এত মিষ্ট যে ভোক্তাদের আর ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। ভুলিয়া ভুলিয়া তাহারা এত আহার করে যে, এক একদিন এক একটা উঠিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তেমন করিয়া না খাইলেও উপায় নাই। দত্ত-গৃহিণী মাঝে মাঝে প্রত্যেকটার পেট টিপিয়া টিপিয়া দেখেন, কোনটার কোনখানে কোন ফাঁক আছে কিনা।

ছেলেরা ও-বেলার ভাতই খায়। দত্ত-গৃহিণী নিজের জন্য কিছু আর গরম ভাত চড়াইতে পারেন না। ও-বেলার শাক তরকারি যা কিছু পড়িয়া থাকে না থাকিলে শুধু নুন দিয়াই কাজ সারেন। শনিবারে স্বামী বাড়ি আসেন। সেদিন সকাল হইতেই বাড়ির নানা রকম জিনিস কেনার ধূম পড়ে। রাত্রে উনুন জ্বলে। দু' একখানা তরকারিও বিশেষ করিয়া রাঁধা হয়। শনিবার রাত্রে তিনি হাঁড়িতে নিজের জন্য দুটি চাল নেন। একদা, ছেলেপুলে যখন হয় নাই, তখন ঠাণ্ডার অর্জুহাতে দ্বার বন্ধ করিয়া দু'জনে একই থালায় আহার করিতেন। সে সবের কিছু আর নাই। কেবল এক হাঁড়িতে দু'জনের চাল লওয়ার সনাতন অভ্যাসটুকু আজও আছে।

ও-দিকের বারান্দায় অন্ধকারে বসিয়া দত্ত মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী মালা হাতে হরিনাম জপ করিতেছিলেন। ছোট নাতনীটি তাঁহার আঁচলের একাংশে গুঁড়িসুড়ি হইয়া শুইয়া ছিল। তিনিও অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন।

বলিলেন, দিবু আজ আর আসবে না বোধ হয়। তুমি খেয়ে নাও বৌমা। কচি ছেলের মা, কতক্ষণ বসে থাকবে?

বৌমা কি করিবেন দিশা না পাইয়া আপন মনেই খানিকটা গজ্‌গজ্‌ করিলেন। হাঁড়ির গরম ভাত লইলে সমস্ত ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে। যদিই স্বামী আসেন! কিছু বলা তো যায় না! ইতিপূর্বে আরও কতদিন এমনি ঝড় জলের রাত্রে তিনি আসিয়াছেন। ভদ্রমহিলা অবশেষে নানা চিন্তার পর নিজের জন্য ঠাণ্ডা ভাতই বাড়িয়া লইয়া রান্নাঘরের এক কোণে আহারে বসিলেন। সত্যই

তো, কচি ছেলের মা। বেশি রাত্রে খাওয়া ঠিক নয়।

এমন সময় ঝপ্ ঝপ্ করিয়া ছাতা মাথায় দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক হাতে একটা মাগুর মাছ। সেটাকে এমন করিয়া টিপিয়া ধরিয়াছেন যে, রাস্তাতেই তাহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। মাছটা রান্নাঘরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে দাওয়ায় উঠিলেন। এতটা পথ ধীরে সুস্থে ভিজিয়া বাড়িতে আসিয়া ব্যস্ততা বড় বাড়িল।

বৃদ্ধা জননী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এই বিষ্টিতেও বার হয়েছিস? ধন্যি ছেলে বাবা! অ বৌমা! দিবুর জন্যে একটা গামছা নিয়ে এস তো! সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্ সপ্ করছে। কাপড়টা ছেড়ে ফেল। ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ে থাকিস নি। একখানা কাপড় দিয়ে যাও বৌমা।

দত্ত-গৃহিণী স্বামীর পায়ের সাড়া পাইয়াই ভাতের থালা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পাশেই একটা ভাঙা কড়াই ছিল। সেইটা দিয়া থালাটা ঢাকা দিলেন। হাত মুখ ধুইয়া একটা গামছা আনিয়া স্বামীর কাঁধের উপর ফেলিয়া দিলেন। ও ঘর হইতে একখানা শুকনা কাপড় আনিয়া পাশে রাখিলেন। তারপরে পা ধোয়ার জন্য এক ঘটি জল আনিতে রান্নাঘরে গেলেন।

দত্ত মহাশয় মাথা মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে, আগুন আছে?

—আগুন, কি হবে?

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আড়া থেকে রতন একটা মাগুর মাছ দিলে। হাতাভাজি হয় না?

—আগুন বসে আছে এখনও! আর হাতাভাজি খেতে হবে না।

এ কথাটা দত্ত-গৃহিণী বলিলেন অস্ফুট স্বরে। কিন্তু এ-ঘর হইতেও শোনা গেল। বৃদ্ধা জননী তবু যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। বলিলেন, দুমুঠো খড় জ্বেলে দিক্ না হাতাভাজি করে। অ বৌমা, মাছটা কুটে দাও তো গা ভেজে। কতক্ষণই বা লাগবে? তুই কাপড় ছেড়ে খেতে খেতে হয়ে যাবে। দত্ত-গৃহিণী ইহার উত্তরে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না। কিন্তু খড় আনিবার জন্য তাঁহাকে গোয়াল ঘরের দিকে যাইতে দেখা গেল। দত্ত মহাশয় বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দু'টি টাকা মায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। এটি তাঁহার বরাবরের প্রথা। বৃদ্ধা জননীর এ বয়সে আর সংসার পরিচালনার শক্তি নাই। সেজন্য সংসার-খরচের টাকা দত্তমহাশয় মাসকাবারে স্ত্রীর হাতে জমা দেন। মা দু'টি টাকা পরম আহ্লাদে তুলিয়া লইয়া পুত্রকে বহু আশীর্বাদ করেন। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

গৃহিণী ও-ঘর হইতে হাঁকিলেন, ভাত দেওয়া হয়েছে।

জননী বলিলেন, যা বাছা। রাত হয়েছে, ডুটি খেয়ে নিগে। বাবা আসবে, বাবা আসবে, বলে ছেলেমেয়েগুলো অনেকক্ষণ জেগে ছিল। এই দেখ না, একটা এখানেই শুয়ে পড়েছে। তুই যা রাত করলি!

—রাত...মানে, য···ইয়ে...

এইটুকু বলিতে বলিতেই দত্ত মহাশয় রান্না ঘরে পৌছিয়া গেলেন; বাকিটুকু আর বলা হইল না। একটা 'হুঁঃ' দিয়াই সারিলেন।

স্বামীর জন্য ভাত বাড়িয়া দিয়া দত্ত-গৃহিণী হেঁসেলের পাশে হাঁটুর উপর তুই হাত মেলিয়া বসিলেন। বলিলেন, এত দেরি হল যে!

ভাতের গ্রাস কোঁৎ করিয়া গিলিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন··· ইয়ে, যা কাদা! যেমন কাদা তেমনি···হুঁঃ।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, আর একটু দেরি করলেই হয়েছিল।

উদ্বিগ্নভাবে দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

—আমি আমার ভাত বাড়তে যাচ্ছিলাম। আর একটু দেরি করলেই হেঁসেল তুলে ওপরে যেতাম।

দত্ত মহাশয়ের উদ্বেগ দূর হইল। টুক্ টুক্ করিয়া মাথা নাড়িয়া হাসিলেন।

—আবার আড়ার দিকে যেতে বললে কে? মাছ না আনলেই চলত না?

দত্ত মহাশয় হাতাভাজি মাছের একটুখানি কোলের দিকে টানিয়া বলিলেন, সব আমাকে দিলে না কি? তোমার জন্যে রাখ নি?

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, না, সব তোমাকেই দিয়েছি।

আহারান্তে হাত চাটিতে চাটিতে দত্ত মহাশয় বাহিরে আসিলেন। এটি তাঁহার পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়ার লক্ষণ। ছেলেবেলার অভ্যাস প্রৌঢ় বয়সেও যায় নাই।

আচমন সারিয়া তিনি উপরে গেলেন। তিনটি ছেলেতেই অতবড় বিছানায় এমনভাবে শুইয়া আছে যে, আর একটা মানুষের শোয়ার স্থান নাই। দত্ত মহাশয় প্রত্যেকের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। সকলেই ভাল আছে দেখিয়া সন্তোষ সহকারে একটি "হুঁঃ" ছাড়িলেন। রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া ইতিমধ্যে গৃহিণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকাকড়ি এনেছ?

—টাকা···হুঁঃ।

কিন্তু এই দুটি কথা বলিতে দত্ত মহাশয় যতখানি সময় লইলেন, ততক্ষণে গৃহিণী তাঁহার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়াছেন।

—মোটে তিনটি? কি হবে এতে? গয়লাকে একটা টাকা দিতেই হবে। ধোপাকে আট আনা না দিলেই হবে না। বাকি রইল দেড়টি টাকা। তা পরান মুদি কি দেড় টাকায় ছাড়বে?

দত্ত মহাশয় একটু থামিয়া টানিয়া টানিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, তিনটে মানে···ইয়ে। যাবার ট্রেনভাড়া রইল না আর কি! ও তিনটে···হুঁ!

অর্থাৎ ওই তিনটি টাকাই তাঁহার সম্বল। ও টাকা লইলে তাঁহার ফিরিবার ট্রেনভাড়া পর্যন্ত থাকিবে না।

গৃহিণী টাকা তিনটি বাক্সে তুলিয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, ট্রেনভাড়া রইল না মানে? তুমি কি যাওয়া-আসার টিকিট করে আসনি? আমাকে ন্যাকা বোঝাচ্ছ?

গৃহিণীর উষ্মায় দত্ত মহাশয় ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার স্বাভাবিক নিম্ন-স্বর নিম্নতর অনুনাসিকে পরিণত হইল। কোন প্রকারে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, যাওয়া-আসা মানে ..হুঁঃ! মেম সায়েবকে বললাম, তা···

গৃহিণী ধমক দিলেন, থাক্, থাক্।

দত্ত মহাশয় চুপ করিলেন। গৃহিণী ওদিকে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। মিনিট পনেরো পরে দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

গৃহিণী পিছন ফিরিয়াই বলিলেন, না।

উদ্বেগে দত্ত মহাশয় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আবার হল?···ইয়ে, জ্বর?

—ইয়ে, জ্বর, নিউমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইয়ে···

দত্ত মহাশয়ের ছোট মাথাটি ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে লাগিল। আশঙ্কায় নয়, গৃহিণী যে পরিহাস করিতেছেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, তাই হোক। আমি ভেবেছিলাম,···হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন, হুঁ! আর ভাবতে হবে না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শোও দিকি!

দত্ত মহাশয় উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্বস্থানে শুইয়া পড়িলেন। এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

চাটুয্যেদের বড় গিন্নী দিয়াছিলেন এক শিশি 'পাইরেক্স' আনিতে। তাঁহার বড

নাতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কাঁটাখানি সার করিয়াছে। বছর দুই ধরিয়া ভুগিতেছে। বয়স যোল বৎসরের কম নয়, কিন্তু দেখিলে নয় দশ বৎসরের বেশি বলিয়া মনে হয় না। সকালেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঘোষেদের ছোট বৌ দিয়াছিল 'উল্‌' আনিতে। তাহার বছর দশেকের ভাসুরঝি আঁচলে করিয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হাজির। গৃহিণী পুঁটলি খুলিয়া তাহার জিনিসগুলি বাহির করিয়া দিলেন।

একটু পরেই দত্ত মহাশয় ঠুক ঠুক করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মা তখন চাটুয্যে-গিন্নীর কাছে পুত্রের গুণপণা শতমুখে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একালে অমন মাতৃভক্ত পুত্র যে নিতান্ত দুর্লভ, এ বিষয়ে চাটুয্যে-গিন্নীর অনুমাত্র সংশয় ছিল না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন, এবং পুত্রের যে সব কাহিনী মা-ও ভুলিয়া যাইতেছিলেন, সে সব স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় নামিয়া আসিলেন।

চাটুয্যে গৃহিণী মুখখানি বিকশিত করিয়া বলিলেন, এই যে বাবা, ভাল ছিলে তো? তাই বলছিলাম তোমার মাকে। ধন্যি তোমার কোঁক বোন, অনেক তপিস্যে করে ছেলে পেয়েছিলে! বেঁচে থাক বাবা, আমার মাথার যত পাকা চুল, তত বচ্ছর পেরমাই হোক। বৌমা আমার জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করুন।

বৌমার সম্বন্ধে চাটুয্যে-গিন্নীর ভয় ছিল। নাতির ঔষধটা আসিয়াছে বটে, কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় নাই। দত্ত মহাশয় হয়ত তাগাদা করিবেন না, কিন্তু গৃহিণী সাতবার লোক পাঠাইয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাকেও খুশি করার প্রয়োজন।

তিনি একখানা চওড়া লালপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ছেলেদের জন্য মুড়ি বাহির করিয়া দিতেছিলেন। সেদিকে একটা কলরব উঠিয়াছে। আজ মুড়ির পরিমাণ অন্যদিন অপেক্ষা বেশি। মিত্র বাড়ির ছোটবৌমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। বড় ঘটা করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হইবে। অন্যান্য আরও পাঁচটি স্বজাতীয়া মহিলার সঙ্গে দত্ত গৃহিণীকেও এখনই রান্না করিতে যাইতে হইবে। পল্লীগ্রামে উড়িয়া ব্রাহ্মণদের এখনও অভ্যুদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ বাড়িতে তো নয়ই। দত্ত-গৃহিণী ভোরেই স্নান সারিয়া একবার সেখানে দর্শন দিয়া ছেলেমেয়েদের জলখাবার দিবার জন্য আসিয়াছেন। আবার এখনই বাহির হইয়া যাইবেন। তাঁহার বড় তাড়াতাড়ি।

দত্ত মহাশয় নম্রকণ্ঠে চাটুয্যে-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল তো, খুড়িমা ?

—আর ভাল বাবা ! নাতিটার জ্বর তো এই দু'বছরের মধ্যে কিছুতেই ছাড়ছে না। কত ওষুধ খাওয়ালাম, বাবার থানে কত মানসিক করলাম, কিছুতেই কিছু না।

দত্ত মহাশয় গাড়ুটা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। খবরটা ভাল নয় শুনিয়া বিব্রতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। চিন্তিতভাবে বলিলেন, তাইত···ইয়ে, রজনী ডাক্তারকে ·

—কত ডাক্তার দেখালাম বাবা। ডাক্তার-বদ্যি আর বাকি রাখিনি।'

তবু জ্বর ছাড়িল না ? দত্ত মহাশয় গাড়ুহাতে অকুল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্বরের কোনই কিনারা করিতে না পারিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, একটু তেল দিও তো। এই সঙ্গে একটা···হুঁঃ !

দত্ত-গৃহিণী তেলের বাটিটা স্বামীর কাছে নানাইয়া রাখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, এই সাত সকালে তেল মেখে কি হবে ?

—সাত সকালে মানে···ইয়ে। বিলের জমিটা একবার·· হুঁঃ, সেই সঙ্গে নদীর ঘাটে একটা · হুঁঃ !

দত্ত-গৃহিণী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, সেই সঙ্গে আমার মাথাতেও একটা···হুঁ। বেশি দেরি কর না যেন মিত্রিবাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।

দত্ত মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, না। যাব আর আসব। শুধু বিলের জমিটায়···

দত্ত মহাশয় তেল মাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাষের সঙ্গে সঙ্গে বিলে বিঘা কয়েক জমি বন্দোবস্ত করার কথাও উঠিয়াছে। কতদূর পর্যন্ত বান আসে, নিজের চোখে তাহা পরীক্ষা করিয়াই বন্দোবস্ত পাকা করিবেন, সকাল বেলায় এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছিল। স্থির করিয়াছেন, এই সঙ্গে তেলটা মাখিয়া গেলে আসিবার সময় নদীর ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসা যায়, তাহাতে অনেকটা সময় অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচিবে।

দত্ত মহাশয়ের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা পূর্বমুখে নদীর দিকে খানিকটা গেলেই বড় অশথতলা। গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া তাহার নিচে বেশ উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে। গ্রামের যত নিষ্কর্মা মাতব্বর

ব্যক্তি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেইখানে বসিয়া তাস-পাশা-দাবা খেলেন, এবং অপর্যাপ্ত পরিমাণে খরসান তামাক পোড়ান। দত্ত মহাশয় প্রথমে সেইখানে আট্‌কাইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, একটু তামাক ইচ্ছা করিতেই হইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বিলের জমি লওয়ার সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় অভিজ্ঞ বন্ধুদের সঙ্গে কেবল আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দূরে দেখা গেল, একটা লোক কতকগুলি মহিষ তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছে। দত্ত মহাশয় পাশের লোকটিকে টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখতো হে মহিন্দির, পাইকের বলে মনে হচ্ছে না?

মহিন্দির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পাইকেরই বটে। উলোপাড়ার হাটে যাচ্ছে। তোমার একটা মোষ দরকার, না?

উলাপাড়ার হাটে যাইবার এই রাস্তা। পাইকার কাছে আসিতে তাহাকে থামানো হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মহিষের শিং টানিয়া, দাঁত দেখিয়া এখান-ওখান টিপিয়া মহিষ পছন্দ করিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় তাহাদের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চাহিতে লাগিলেন। বিচক্ষণেরা একটা মহিষ পছন্দ করিল। মহিষটা ভাল; সবে চার দাঁত। এটা হইলে দত্ত মহাশয়ের মহিষটার সঙ্গে জোড়া মেলে ভাল।

কলিকাটা হুঁকা হইতে নামাইয়া দিয়া মহিন্দির বলিল, তোমার মোষের দর কি রকম হে, পাইকের? বল দেখি শুনি।

—ঠিক এক দর বলব?

দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক দর। দরদস্তুর আমি পছন্দ করি না।

কলিকাটা হাতে ধরিয়া দু'টা টান দিয়া পাইকার বলিল, ছোটটা নেবেন তো?

—ছোটটাই নোব, কি বল মহিন্দির?—বলিয়া দত্ত মহাশয় মহেন্দ্রের দিকে তাকাইলেন।

মহেন্দ্র পাকা লোক। কোন্‌টা লওয়া হইবে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে চাহিল না। বলিল, সব ক'টারই দর শুনি। আচ্ছা, ছোটটারই আগে বল।

কলিকায় বেশ করিয়া একটা শোঁ-টান দিয়া পাইকার কলিকাটা নামাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। একটু পরে বলিল, একদর বলছি, এক কুড়ি আট টাকা। এক আধলা কম দোব না।

মহেন্দ্র বিজ্ঞের মত উপেক্ষাভরে হাসিয়া নিঃশব্দে হুঁকায় মন দিল। পাইকারের কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। দত্ত মহাশয় একবার মহেন্দ্রের দিকে একবার পাইকারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা

কহে না দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজেই আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,—ইয়ে! আটাশ—ফাটাশ বুঝি না! ন'টি টাকা·· হুঁঃ!

এবারে মহেন্দ্র এবং পাইকার দুজনেই অবাক হইয়া গেল। মহেন্দ্র অনুমান করিয়াছিল বাইশ টাকায় লওয়া যায়। পাইকারও আঁচিতেছিল চব্বিশ টাকা বলিলে দিয়া দিবে। এবারে মহিষের বাজার নাই। খড়ের অভাবে লোকে মহিষ বিক্রী করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে জায়গায় একেবারে নয় টাকা!

পাইকার আর দাঁড়াইল না। বেশ কয়েছেন কর্‌তা, বলিয়া মহিষ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে দত্ত মহাশয়ও গাড়ু হাতে চলেন। নয় হইতে দশ, এগারো, সাড়ে এগারো পর্যন্ত উঠিলেন, পিছনে পিছনে মাইল দেড়েক আসাও হইল, কিন্তু পাইকারের মন তথাপি দ্রব হইল না। লোকটা মহিষের পিঠে দুইটা বাড়ি দিয়া বলিল, আর কতদূর আসবেন কর্‌তা? ফিরে যান। এবারে ছাগল দিয়ে চাষ করুন। মোষ কেনা আপনার কর্ম্ম নয়।

নিরাশ হইয়া দত্ত মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গ্রামে নয়, মাঠে মাঠে একেবারে বিলে।

ভাল বান আসিয়াছে। এখনও হু হু করিয়া বাড়িতেছে! যে জায়গাটা দত্ত মহাশয়ের লওয়ার কথা, তার অনেকখানি বন্যার গর্ভে। কিন্তু ঠিক সমস্তটা পর্যন্ত বান আসে কিনা, না দেখিয়া পাকা বন্দোবস্ত করা কাজের কথা নয়। দত্ত মহাশয় গামছাটা মাথায় দিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক আঙুল বান বাড়ে, আর উনি এক আঙুল পিছাইয়া আসেন। আবার এক আঙুল বাড়ে, আবার এক আঙুল পিছান। এমনি করিয়া যখন বেলা চারটা কি সাড়ে চারটা, তখনও দেখা গেল বিঘা দশেক জমিতে বান আসিতে বাকি আছে।

এমন সময় রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, বড় বাবু, আপনি এখানে? আমি পিরথিমীটা খুঁজে এলাম।

বলিয়া হাত ঘুরাইয়া পৃথিবীটা দেখাইয়া দিল।

বলিল, গাঁ'র ষোলো আনা মিত্রিবাড়িতে এসেছে। আপনার জন্যে বসতে পারছে না। এখনও চান হয় নি আপনার?

দত্ত মহাশয় তাহার পিছন পিছন নদীর ঘাটের দিকে চলিতে চলিতে বলিলেন, বিলের সবটায় তো বান আসে নি! এখনও বিঘে দশেক, হুঁঃ?

—আজ্ঞে, এই তো আসতে আরম্ভ করেছে। কাল সকাল নাগাদ সবটা ডুববে।

রতন দত্ত মহাশয়কে তিষ্ঠাইতে দিল না। নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্নান

করাইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল, মহিন্দির বললে, পাইকেরের পেছু পেছু গেছেন। ভাবলাম, হাটে গিয়েই বা উঠলেন হয় তো!

দত্ত মহাশয় চলিতে চলিতে বলিলেন, হাটে মানে·· ইয়ে। তা প্রায় হাটের কাছাকাছিই·· হুঁ! কিছুতে দিলে না রতন! না দিবার কারণ রতনের অজ্ঞাত নয়। মহেন্দ্রের মুখে মুখে সে ইতিবৃত্ত সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

একটা সুবিধা হইয়া গেল, দত্ত-গৃহিণী যজ্ঞবাড়িতে। মা একা বাড়ি আগলাইয়া বসিয়া ছিলেন। দত্ত মহাশয় বাক্যবাণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া যখন তিনি মিত্রবাড়িতে পৌঁছিলেন, তখন সকলের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিষ্টি পড়িতেছে। দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা গায়েই মাখিলেন না। উঠানের একাংশে গোলাব এক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, তা হোক, তা হোক। আমাকে এইখানেই দুটো···হুঃ! খাওয়া নিয়ে কথা।

বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, সে কি হয় বাবা! তোমার জন্যে ঘরের ভেতরে জায়গা করে দিক। ওরে!

কিন্তু দত্ত মহাশয়ের মনে অভিমানেরও স্থান নাই, অহঙ্কারেরও না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঘরে মানে·· ইয়ে! এই বেশ হবে।

সেইখানেই পরিতোষ সহকারে আহার সারিয়া দত্ত মহাশয় হাত চাটিতে চাটিতে উঠিয়া আসিলেন।

কলিকাতা ফিরিবার গাড়ি রাত্রি দুইটায়। কলিকাতায় পৌঁছায় পোনে দশটায়। ডাকগাড়ি নয়, প্যাসেঞ্জার। এটায় গেলে দিনের বেলায় দত্ত মহাশয়ের ভাত জোটে না। স্টেশন হইতেই অফিস ছুটিতে হয়। ট্রামে গেলে ছুটাছুটি কমে বটে, কিন্তু দত্ত মহাশয় পারৎপক্ষে ট্রামে বাসে চড়িতে চান না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিয়া চলিয়া যান।

কিন্তু সে যাক, এখন ট্রেনভাড়ার কি করা যায়? মেমসাহেব তো···হুঁ, এদিকে গৃহিণীও...হুঁ। দত্ত মহাশয় জননীর শরণ লইলেন। মাসের মধ্যে অন্তত দুইবার এই রকম হয়। গৃহিণীর ব্যাঙ্কে যাহা একবার জমা হইয়া যায়, তাহা আর বাহির হয় না। মাকেই দুই টাকা প্রণামী লইয়া তিন টাকা আশীর্বাদ দিতে হয়। সেকেলে মানুষ হিসাব-নিকাশের জ্ঞান কম। অত ভাবিয়া দেখেন

না। শুধু ছেলের হাতে টাকা নাই শুনিয়াই ব্যাকুল হন। এবারেও দত্ত মহাশয়কে তিনটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। রাত্রি একটার সময় বাহির হওয়ার কথা থাকিলে দশটার সময় হইতে গৃহিণীকে তাগাদা দিতে হয়। এইরূপে দত্ত মহাশয় কোন প্রকারে যথাসময়ে স্টেশনে এবং তারপরে অফিসেও পৌঁছিলেন।

অফিসে পৌঁছিয়া একশত আটবার যাবতীয় দেবতার নাম একটা ফাঁস কাগজে লিখিয়া কপালে ঠেকাইলেন। বেয়ারা হইতে বাবু পর্যন্ত যে কেহ আসিল, তাহারই কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অবশেষে একখানা চিঠির খসড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিবানিদ্রা বলিয়া নয়, হাঁটিতে হাঁটিতেও ভদ্রলোক ঘুমাইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে লোকের ধাক্কা খাইয়া চমক ভাঙে।

এক দফা ঝিমাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় পাশের ঘরের সহকর্মীর খোঁজ লইতে গেলেন। তিনি তো অবাক!

—কি খবর দত্ত? বুড়ো মা...

সহকর্মীর মুখ দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তার উপর বুড়ো মা! তাঁহার মাথা কলসীর মত দুলিতে লাগিল।

—বুড়ো মা...মানে চিঠিপত্র কিছু এসেছে নাকি?

—কেন? তুমি বাড়ি থেকে আসছ না? ভাল আছেন তো তিনি?

দত্ত মহাশয় জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, ভাল মানে, হাঁ ভালই তো দেখে এলাম।

—তবে তোমার মাথা অমন উস্ক-খুস্ক কেন? পায়ের জুতো কি হল?

দত্ত মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া হাসিলেন। বলিলেন, জুতো মানে...ইয়ে। বাড়ি থেকে যখন বেরুলাম, মনে হল জুতোটা হাতেই আছে। স্টেশনে এসে পা ধুতে গিয়ে দেখি, হুঁ। তা হলে বাড়িতেই বোধ হয়. তোমার বাড়ির খবর ভাল? ছেলেপুলে সব...

—হাঁ ভাল।—বলিয়া ভদ্রলোক কলম তুলিয়া লইলেন। দত্ত মহাশয় খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার কাছে ইয়ে, দুটো টাকা হবে?

—টাকা? কি করবে?

মাথা চুলকাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, যাওয়ার পথে...হুঁ, জুতো এক জোড়া...

ভদ্রলোক দুটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। দত্ত মহাশয় আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। তারপর অফিসের কাজ আরম্ভ হইল। একটা খসড়া সাতবার কাটেন। অবশেষে সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লেখেন। সেটা পছন্দ না হইলে আবার কাটেন, আবার লেখেন। এমনি

করিয়া যখন খান পাঁচেক খসড়া শেষ হইল, তখন বেয়ারা আসিয়া জানাইল রাত নয়টা বাজে। বাবুর জন্য সে বেচারাও বাড়ি ফিরিতে পারিতেছে না। বাবু উঠিলেই আলো নিবাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পারে।

বাধ্য হইয়া দত্ত মহাশয়কে উঠিতে হইল। কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। অগত্যা সেগুলি বাঁধিয়া বাসায় লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। অফিসে আসিয়া টিফিনের সময় খান দুই পুরি আর একটা সন্দেশ মুখে দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে পেটে আর কিছু পড়ে নাই। কিন্তু সেজন্য বিশেষ অসুবিধা হইতেছে না। উপবাসে তিনি 'সিদ্ধ-উদর'—এক আধ বেলা না খাওয়ার কথা মনেও পড়ে না।

অফিসের ফাইল বগলে দাবিয়া ছাতা মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় রাস্তায় নামিলেন। রৌদ্র-বৃষ্টি থাক আর না থাক, দিনেই হোক অথবা রাত্রেই হোক, ছাতাটি ভদ্রলোকের মাথায় দেওয়াই চাই, এবং এই ছাতাটি-ই। এ তাঁহার বহু কালের অভ্যাস। ছাতাটি মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসেন।

বাসায় যখন ফিরিলেন, তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। অবশ্য বাসা একটু দূরেই। হাতিবাগানে। সাধারণ মানুষের তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগে না। দত্ত মহাশয়ের দেড় ঘণ্টা।

বাসার সকলে তখন নিদ্রামগ্ন। উড়িয়া ঠাকুর তখনও বাবুর প্রতীক্ষায় একটা পিঁড়িতে বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া একটা উড়িয়া গান মক্স করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া চাকরটা বিড়ি মুখে দিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। দত্ত মহাশয় দরজায় উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভালো তো ঠাকুর ?

চাকরটা বিড়ি পিছনে লুকাইল। ঠাকুর সঙ্গীত বন্ধ করিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিল, আজ্ঞা হাঁ বাবু। ঈশ্বর প্রসাদাৎ খবর ভাল। আপনার খবর ভাল ? বাড়ির সব মংগল্ ?

দত্ত মহাশয় বাড়ির চারিদিক ভাল করে দেখিয়া লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, বাড়ি মানে···হুঁ।

উপরে আসিয়া ছাতাটি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া একটি কোণে ঠেস দিয়া রাখিলেন। পায়ের জুতা খুলিতে গিয়া মনে পড়িল বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় রাস্তায় এক জোড়া কিনিয়া লওয়ার কথা ছিল। তাহাও হয় নাই। ভুল হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয় আপন মনেই একটা হুঁ দিলেন।

তাঁহার বড় ছেলে এইখানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে পড়ে। গ্রামের আরও দুইটি ছেলে তাঁহার ঘরেই থাকিয়া কলেজে পড়ে। জামা খুলিয়া আলনায়

রাখিয়া দত্ত মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকে একবার দেখিয়া লইলেন। সব কয়টিই আছে, এবং অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সকলের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কাহারও জ্বর হয় নাই। ভাল বলিয়াই বোধ হইল।

হাত-মুখ ধুইবার জন্য নিচে নামিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন ইয়ে। আমার জন্যে রুটি হয়েছে তো?

—আজ্ঞা হুঁ।

—তবে আর কি?…ইয়ে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তোমরা খেয়ে নাও। আমার…হুঁ। জপ-তপ সেরে খেতে দেরি হবে।

ঠাকুর খাবার বাড়িতে লাগিল। দত্ত মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত মনে জপে বসিলেন।

অনেক রাত্রে দত্ত মহাশয়ের ছেলে উপেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া দেখে আলো জ্বলিতেছে। দত্ত মহাশয় কুশাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন। অর্থাৎ মাথাটা ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে একবার গঙ্গাজলের পাত্র স্পর্শ করিতেছে, আবার উঠিয়া আসিতেছে।

—বাবা, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

—উঁ!—দত্ত মহাশয়ের চমক ভাঙিল।

—ঘুমুচ্ছেন নাকি?

—ঘুম মানে—একটুখানি হুঁ!.. ইয়ে—

কোশার গঙ্গাজল লইয়া দত্ত মহাশয় চোখে দিলেন। বলিলেন, তোমরা সবাই ভাল তো? ক'টা বাজে?

ঘড়ি দেখিয়া উপেন বলিল, তিনটে পাঁচ।

—তা হলে আর…ইয়ে।· দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি নিচে ছুটিলেন।

সিগারেটের টুকরো

রাজনৈতিক অপরাধে রণধীরের সাত বছরের জেল হয়েছিল। ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস পরেই সে আন্দামান থেকে ছাড়া পেলে।

সন্ধ্যার মুখে জাহাজ এসে লাগল জেটিতে।

জাহাজ থেকে নামবার আগে রণধীর একবার চেয়ে দেখল পশ্চিমের সূর্যাস্ত-শোভার দিকে, একবার চেয়ে দেখল শেষ অপরাহ্ণের আলো ঝলমল কলকাতা শহরের দিকে। তার বুকের রক্ত দ্রুত-তালে নেচে উঠল। সামনের পথ দিয়ে চলেছে অগণিত মোটর-রিক্সা-ঘোড়াগাড়ি, কত কলহাস্যপরায়ণ নর-নারী। একবিন্দু বৃষ্টির মতো যদি সে ওই জনস্রোতে মিশে যেতে পারত।

কিন্তু তার উপায় নেই।

দিনের আলো দ্রুত নিবে আসছে। এর পরে আসবে রাত্রি, তার নৈষ্কর্মের ক্লান্তি নিয়ে। সেই দীর্ঘ রাত্রি তাকে কাটাতে হবে কলকাতার জেলে। ছাড়া পাবে পরের দিন সকালে।

রণধীরের মনে হচ্ছে, সেই পরের দিনটা আর ইহজীবনে বুঝি আসবে না। এই নিস্তরঙ্গ ক্লান্ত শর্বরী, সমুদ্রের মত এরও যেন তলও নেই, পারও নেই।

হতাশায় সে চোখ বন্ধ করলে।

কিন্তু পরের দিন সত্যই অবশেষে এল।

দুপুরে দেখা গেল, রণধীর তার সুটকেশটি নিয়ে নিঃশব্দে হাওড়া স্টেশনে একটি ট্রেনের কামরায় বসে। দুচোখে তার বিস্ময় আর ব্যস্ততা। তার সদ্যোজাত স্বাধীন সত্তা ছোট শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যত দেখছে, দেখার তৃষ্ণা যেন আর মিটছে না।

আরও ঘণ্টাকয়েক পরে ট্রেনখানি তাদের গ্রামের স্টেশনে এসে লাগল।

প্লাটফর্মে নেমে রণধীর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, চেনা লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু একটি চেনা মুখও দেখা গেল না। তার আসবার কথা কেউ জানে না। কেউ তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই।

রণধীরের মনে পড়ল শর্বরীকে। কে জানে এখন কি করছে সে।

কোথায় আছে তাই বা কে জানে? জেলে যাবার বছর তিনেকের মধ্যেই তার মা বাবা দুইই মারা যান। তারপরেও শর্বরী এইখানেই ছিল। মাস চারেক আগে আন্দামানে থাকতে তার কাছ থেকে সর্বশেষ চিঠি যা সে পেয়েছে, তাতেও এইখানকারই ঠিকানা ছিল।

শর্বরীর কথা মনে হতেই রণধীর ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কে জানে গ্রামের লোকেরা তাকে চিনবে কিনা। সে কিন্তু আলাপ করবার জন্যে দাঁড়াল না। হাল্‌কা স্যুটকেসটি হাতে করে একেবারে নিজের বাড়ির উঠানে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

কিন্তু কোথায় শর্বরী?

পলকের মধ্যে রণধীর ঘেমে উঠল। বাড়ি অন্ধকার, দরজা বন্ধ। সে শর্বরীর নাম ধরে ডাকতে যাবে, এমন সময় পিছনে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠল।

- মা গো!

এ কণ্ঠস্বর রণধীরের ভুল হবার নয়। বুঝলে, উঠানের মাঝখানে হঠাৎ অপরিচিত লোক দেখে শর্বরী ভয় পেয়ে গেছে।

—আমি, আমি, শর্বরী, চিনতে পারছ না?

শর্বরী চিনতে পারলে। কিন্তু কথা কইতে পারলে না। শুধু স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

রণধীর বুঝলে, এতখানি আকস্মিকতার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। সে ভয় পেয়ে গেল। ওর একেবারে কাছে গিয়ে একটা ঝাঁকি দিলে।

বললে, চিনতে পারছ না শর্বরী আমি যে? ছাড়া পেয়েছি।

ওর স্পর্শে শর্বরী একবার চমকে উঠল।

তারপর শান্তভাবে বললে, ঘরে চল।

শর্বরী আগে আগে চলল। বারান্দায় উঠেই বললে, একটু দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।

শিকল খুলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শর্বরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রণধীর ফিরেছে। তার কারাজীবন শেষ হয়েছে। এইটুকু ভাবতেই তার অনেকক্ষণ লাগল। এই দুটি কথাই যেন সে কিছুতে ভাবতেই পারছে না।

বাইরে থেকে রণধীর বললে কি হল? দেশলাই নেই?

শর্বরী সম্বিত ফিরে পেলে।

বললে, আছে বইকি। এই যে জ্বালি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, তার পরণের শাড়িখানি যেমন ছেঁড়া তেমনি মলিন। এতদিন পরে রণধীর ফিরল, এই বেশে কি ওর সামনে দাঁড়ানো যায়! কাপড়টা আলো জ্বালবার আগেই বদলাতে হয়।

তাড়াতাড়ি বললে, এক মিনিট দাঁড়াও না। আমি হারিকেনটা খুঁজছি।

শর্বরীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতায় রণধীর আশ্বস্ত হল।

বললে, খোঁজ। আমি একটু বাইরে বসি।

শর্বরী সাড়া দিলে না। সে তখন অন্ধকারেই বাক্স খুলে শাড়ি বাছচে।

কিন্তু কত দেরি করে? রণধীর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। আলো জ্বালতে এতক্ষণ লাগছে কেন?

পকেট থেকে দেশলাই বের করে ও ঘরের ভেতর ঢুকেই দেশলাই জ্বালাল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ শুনলে: ওকি! বাইরে যাও, বাইরে যাও।

শর্বরী কাপড় বদলাচ্ছে।

অপ্রস্তুত হয়ে রণধীর বেরিয়ে এল। তার একটু পরেই শর্বরীও আলো জ্বেলে বাইরে এল। তার মুখে তখনও তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো সলজ্জ একফালি হাসি লেগে রয়েছে।

ছ'বছর সময় বড় কম নয়।

রণধীর এই দীর্ঘকালকে ক্ষয় ও ক্ষতির মধ্যে শর্বরীর দেহে যেন প্রত্যক্ষ করলে: সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে আজ চব্বিশে পা দিয়েছে। দেহ শীর্ণ, কিন্তু সে হয়তো অন্য কারণে; চোখের কোলে ক্লান্তির কালি, সেও হয় তো অন্য কারণে; কিন্তু প্রথম যৌবনের সে চঞ্চলতা কোথায় গেল? শর্বরী কেমন যেন ভারিক্কি হয়েছে। কথায় কথায় হাসির সে উচ্ছলতা নেই। বাঁকা ভ্রূতে ক্ষণে ক্ষণে কৃত্রিম কলহের মেঘ আর ঘনিয়ে আসে না, বাঁকা হাসি নোঙর বাঁধা পানসির মতো একটু দুলেই থমকে থাকে। সংকীর্ণ ললাট অজ্ঞাতপূর্ব স্নেহ ও প্রসন্নতায় মসৃণ।

শর্বরী হাত মুখ ধোবার জল এনে দিয়ে উনান ধরাতে গেল। রণধীর হাতমুখ ধুয়ে রান্না ঘরের দরজায় উঁকি দিলে।

শর্বরী বললে, এই ধোঁয়ায় গরমে বসতে এলে?

—তা হোক।

শর্বরী একটা পিঁড়ি পেতে শাড়ির আঁচলে ঝেড়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবে তো?

—আছে?

—একটুখানি চা আছে বোধ হয়। সেজদার জন্যে আনিয়েছিলাম সেদিন।

—সেজদার জন্যে? তুমি নিজে খাও না?

—ছেড়ে দিয়েছি।

রণধীর আর প্রশ্ন করতে সাহস করলে না। শুধু নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সে জানে, ছ'বছর আগেও চা ছিল শর্বরীর প্রাণ। সেই চা যদি সে ছেড়ে থাকে, অনেক দুঃখেই নিশ্চয় ছেড়েছে। হয় তো অর্থের অভাবেই। সেই অপ্রিয় উত্তরটা শোনবার ভয়ে ও-নিয়ে আর সে প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, সুশীল এসেছিল? কি করছে সে?

—কি আর করবে। মাস্টারী করে বেড়ুড়ে। ছুটি থাকলে আসে মাঝে মাঝে। কাছেই তো!

তবু ভালো। সুশীস শর্বরীর চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়। দু'জনে পিঠোপিঠি। তবু ভালো সে সঙ্গীহীনা বোনের মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায়। শুনে রণধীর অনেকটা আশ্বস্ত হোল।

বললে, বাড়ি ঢুকে তোমায় না দেখতে পেয়ে, ঘর দোর বন্ধ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

পেয়ালাটা রণধীরের সামনে নামিয়ে দিয়ে শর্বরী বললে, কেন?

— ভাবলাম তুমি বুঝি এখানে নেই।

শর্বরী চুপ করে রইল।

পরে বললে, বাবা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। মধ্যে ক'দিনের জন্যে একবার গিয়েওছিলাম। কিন্তু

—কিন্তু?

শর্বরী জবাব দিলে না। মনে হল, তার ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি খেলে গেল।

রণধীর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে।

বললে, এখানে একা, সেই যা ভয়।

—ভয় আর কি? সবাই আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ছেলেরা তো সমস্ত দিন এখানেই থাকে। রাত্রে ওবাড়ির পিসিমা শুতে আসেন। বাইরের ঘরে ছেলেরা কেউ-না-কেউ শোয়।

রণধীর নিঃশব্দে চা খেতে লাগল।

শর্বরী হঠাৎ বললে, পিসিমা আজও বোধ হয় শুতে আসবেন।

বলেই হাসি চাপবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নিলে।

রণধীরও হাসল।

হাসি থামলে শর্বরী বললে, সত্যিই যদি আমি না থাকতাম এখানে, কি করতে তুমি?

—কি জানি।

—কিন্তু তুমি তো চেয়েছিলে আমি বাপের বাড়িতেই থাকি।

—আমি তোমার একলা থাকার জন্যেই ভয় পেয়েছিলাম। এখন দেখছি,

—কে বৌমা? কার সঙ্গে কথা কইছ?

পিসিমার কণ্ঠস্বর!

শর্বরী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসল।

—আমি পিসিমা। ভালো আছ?

রণধীর উঠে পিসিমাকে প্রণাম করলে

—রণু? ওমা, কি হবে? তুই কখন এলি? তোর চেহারা কত বদলে গেছে! গলার স্বর পর্যন্ত ভারি হয়েছে। আমি ভাবলাম, বৌমার দাদাদের কেউ বুঝি। বোস, বোস!

বলতে বলতে পিসিমার গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল।

—ভালো আছিস?

—হঁ্যা, পিসিমা।

—ক'দিন থেকেই এ বাড়িতে কাক কল্ কল্ করছিল। বললাম বৌমাকে, দেখো আমার রণু এবার আসবে। দেখলে বৌমা?

শর্বরী সম্মতি জানাবার জন্যে তার ঘোমটা-ঢাকা মাথাটা নাড়লে।

—লক্ষ্মী-জনার্দন ছেলেকে আমার ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে এনেছেন, কাল ভালো করে ঠাকুরের ভোগ দিও বৌমা। বুঝলে?

শর্বরী আবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে।

পিসিমা একগাল হেসে বললেন, সে আমার মা-লক্ষ্মীকে বলতে হবে না। জানিস রণু, বৌ পেয়েছিলি বটে তপিস্যি করে।

—বল কি পিসিমা!

ঘোমটার আড়ালে শর্বরীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

পিসিমা গলা বড় করে বললেন, একশোবার! তপিস্যে করার মতোই বৌ। তোর বাবা মারা গেলেন। বৌমার দাদা এল নিতে। বললে, আমার এখন যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না দাদা। শাশুড়ী শোকে তাপে শয্যাশায়ী। আমি

গেলে তাঁকে দেখবে কে ? শেষে তোর মাও গেল। তোর শ্বশুর নিজে নিতে এলেন। বাপের কাছে যাবে না বলতে লজ্জা হল। গেল, কিন্তু মাস শেষ হতেই আবার বাপের সঙ্গে ফিরে এল। বাপের সে কী কান্না! আমাকে ডেকে বললেন, ও তো কিছুতে সেখানে থাকতে চায় না বেয়ান। তাই আপনাদের কাছেই আবার নামিয়ে দিয়ে গেলাম। রণধীর না ফেরা পর্যন্ত এ বাড়ি ও কিছুতে ছাড়বে না। আপনারা দেখবেন ওকে।

পিসিমার গলার স্বর আবার ভারি হয়ে উঠল।

আঁচলে চোখ মুছে বললেন, তা আমাদের কিছুই করতে হয়নি বাবা। ওযে কোথা থেকে কি করেছে, কি করে সংসার চালিয়েছে, কাউকে কোন দিন বুঝতেই দেয়নি। তাছাড়া বলব বৌমা ?

বৌমা সাড়া দিতে পারলে না। কেবল আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

পিসিমা বললেন, তুই বোধ হয় শুনিসনি, এরই মধ্যে ছেলেদের কাছ থেকে পড়া দেখিয়ে নিয়ে ও একটা পাশ পর্যন্ত দিয়েছে।

বিস্ময়ে রণধীর এক মুহূর্ত কথা কইতে পারলে না।

তারপরে বললে, বল কি পিসিমা! ম্যাট্রিকুলেশন ?

—ওই তো বললাম বাবা। এমন বৌ অনেক তপিস্যেয় মেলে। এই বয়সে অনেক দুঃখ ও পেলে রণু। দেখিস যেন আর দুঃখ না পায়।

পিসিমা চলে গেলেন।

আগের রাত্রে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে শুতে যেতে রণধীরের অনেক রাত হয়েছিল। সকালে যখন সে উঠল, তখন বেলা হয়েছে। উঠানে রোদের বান এসেছে।

শর্বরী হেসে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুম ভাঙল ?

রণধীর ঘাড় নেড়ে সাড়া দিলে। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে হাসতে পারলে না। বাড়ির একি শ্রী হয়েছে!

রাত্রের অন্ধকারে তার চোখে পড়েনি। এখন দেখলে, ঘরের চাল জরাজীর্ণ। চিররুগ্নের পাঁজরার মত চালের বাঁকারিগুলো পাৎলা খড়ের উপর দেখা যাচ্ছে।

এখানে-সেখানে পাঁচিলগুলো পড়ে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ির ভিতরটা দেখা যায়। বৃষ্টির ছাটে ঘরের দেয়ালগুলো ক্ষয়ে গেছে। সম্ভবত অর্থাভাবেই তার সংস্কার হয়নি।

বাড়ি তো নয়, যেন শ্মশান।

শুধু কবে একদিন রণধীর ফিরবে বলে এই শ্মশানে শর্বরী কি করে যে এতদিন একা কাটালে ভাবতে বিস্ময় লাগে।

কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নয়। রণধীর ফিরেছে সত্য, তাতে শর্বরীর প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে, কিন্তু সমস্যার নয়। এর পরেই বা তাদের দুজনের কি করে চলবে? সংসার প্রতিপালন তো নিতান্ত সহজ নয়।

পিসিমার একটা কথা রণধীরের মনে দাগ কেটেছে: এই ক'বছরে এই বয়সে অনেক দুঃখ শর্বরী পেয়েছে। আর দুঃখ যেন সে না পায়। পিসিমার আরও একটা কথা তার মনে মাঝে-মাঝে উঁকি দিচ্ছে: শর্বরী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। শর্বরী আর বোকা নয়, সে শুধুই তার গৃহের গৃহিণী নয়, শুধুই সহধর্মিণীও নয়,—তার সহকর্মিণীও হতে পারে।

রণধীর শর্বরীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। স্থির করলে তারা দুজনেই কলকাতা যাবে, দুজনে মিলে অর্থোপার্জন করবে। তাছাড়া আর উপায় নেই। এ বাজারে একজনের রোজগারে ভদ্রভাবে সংসার চলা অসম্ভব। শর্বরীর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগ্রহ অর্থোপার্জনের জন্যে ততটা নয়, যতটা স্বামীর সঙ্গলাভের লোভে। আসল কথা, ছ'বছর তার রণধীরকে ছেড়ে কেটেছে। আর সে ছেড়ে থাকতে রাজি নয়।

স্থির হল, এখানে অনাবশ্যক কালহরণ করে লাভ নেই। যত শীঘ্র সম্ভব ওরা দুজনেই কলকাতায় যাবে।

বছর কয়েক পরের কথা।

সন্ধ্যার কিছু পরে রণধীর অফিস থেকে ফিরল। অফিস নয়, একটা বড় স্টেশনারি দোকান। কিন্তু রণধীর এবং শর্বরী তাকে অফিসই বলে। অনেক ঘাটে ঘুরে ঘুরে সে আপাতত এইখানে এসে লেগেছে। ঝক্‌মারি কাজ। কিন্তু ঝক্‌মারি আর কোন কাজে নেই?

থাকে তেতলার ছোট একটি ফ্ল্যাটে। দুখানি মাঝারি ঘর। একখানি শোবার ঘর, একখানি বসবার। এরই ভাড়া লাগে পঁচিশ। এর বেশি তাদের আর দরকারও নেই, সামর্থ্যও নেই।

শর্বরীর রুচি আছে। তাদের অল্প আয়ের মধ্যেই একটু একটু করে ঘর দুখানিকে সাজিয়েছে মন্দ নয়। বাইরে থেকে দেখলে তাদের অবস্থা স্বচ্ছল বলেই

এই বয়সে অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, আর যেন দুঃখ না পাও। আমি তোমাকে সেই দুঃখের হাত থেকে বাঁচাতে চাই।

পিসিমার কথায়? শর্বরী অকস্মাৎ হা হা করে হেসে উঠল,—চল ফিরে যাই পিসিমার কাছে। তুমি সেখানে স্কুলে একটা পণ্ডিতি নেবে, আর আমি রাঁধব বাড়ব, তোমার সেবা করব। যাবে ফিরে?

শর্বরী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে বললে, তোমার সঙ্গে বসে বসে তর্ক করার সময় আমার নেই। তুমি ধীরভাবে ভেবে দেখো।

তারপর আঁচল উড়িয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রণধীর নিঃশব্দে বসে রইল।

এতখানি সে শর্বরীর কাছে প্রত্যাশা করেনি। তার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। দেহ যেন ভারি হয়ে গেছে। এমনি করে অনেকক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে সে উঠল। কুঁজো থেকে জল ঢেলে ঢক ঢক করে আকণ্ঠ জল খেল। আঃ, তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

আলো নিবিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সে শুয়ে পড়ল।

নাঃ! গ্রামে আর ফিরে যাওয়া যায় না! কিন্তু এই ডাক্তার! এও অসহ্য!

সকালে ঘুম থেকে উঠে সে শর্বরীর প্রতীক্ষায় বসে রইল। যেদিন শর্বরীর রাত্রে ডিউটি থাকে, সেদিন সে ফিরে এলে দুজনে একসঙ্গেই চা খায়। শর্বরী নিজের হাতে চা করে।

একটু পরেই দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে।

রণধীর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

শর্বরী নয়, দারোয়ান। তার হাতে একখানা চিঠি।

শর্বরী লিখেছেঃ এখন থেকে কড়া নিয়ম হয়েছে, নার্সদের হাসপাতালেই দিনরাত্রি থাকতে হবে, খালি ছুটির দিন বাসায় যেতে পাবে। রণধীর যেন শর্বরীর বিছানা ও বাক্স এই দরোয়ানের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

রণধীর কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিখানা বার বার পড়লে, যেন তার মানে ঠিক বুঝতে পারছে না। তার পরে শর্বরীর বিছানা আর বাক্স বার করে দিলে।

নিঃশব্দে সে বাইরের ঘরে এসে বসল।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল, আধ-পোড়া সিগারেটের টুকরোটার দিকে। মনে হল, সেটা যেন মুখ কালো করে হাসছে।

অজ্ঞাতসারে রণধীরও হাসলে। তারপরে উঠে চা তৈরি করতে গেল।

নিবারণের মৃত্যু

রেল লাইন থেকেই দেখা যায় কতকগুলি ছোট-বড় গাছের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ি, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ির চারিদিকে, ঘেঁটু, আশ-শ্যাওড়া আরও কত কিসের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। বাড়ির ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। নোনা-ধরা দেওয়াল স্থানে স্থানে এত ক্ষয়ে গেছে যে, কি করে অমন বাড়িতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ির চারিদিকের পাঁচিল মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অন্দরের উঠোন পর্যন্ত দেখা যায়। খোয়া-ওঠা উঠোন। তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তার ঝোলানো। তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, ভিজে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অন্দরের মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ডোবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ভেঙে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুঁজে নামতে পারে। এই ঘাটটিই এ পাড়ার খিড়কি। ছোট ছোট পানায় তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।

সকাল বেলা। সবে সূর্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের পৈঠায় বসে তামাকের গুল দিয়ে যে ক'টি দাঁত এখনও অবশিষ্ট আছে সেই ক'টি সযত্নে মার্জিত করছিল। আর একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মাথায় আধঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে ঘাড় হেঁট করে নিঃশব্দে বাসন মাজছিল। চারিদিকে গাছের ঝিমিয়ে-আসা পাতায় কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। তারই বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে ডোবার নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি বউ ভাঙা বাড়ি থেকে মন্থরপদে বেরিয়ে এসে ঘাটের মাথায় মুখ ঢেকে থমকে দাঁড়াল। কতই বা তার বয়স হবে? কুড়ি-একুশ, কি তারও কম। ছিপছিপে শরীর, কিন্তু তারও বাঁধন যেন আলগা হয়ে পড়েছে। গাছ থেকে লতার বাঁধন আলগা হয়ে গেলে লতার যে অবস্থা হয় তেমনি। যেন এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই দুটি মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কচি ঘাসের মতো রঙের লাবণ্য যেন কোথায় উবে গেছে। কোমল ত্বকে কর্কশতা এসেছে। মুখে কলঙ্ক রেখা দেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে, কিন্তু লাল, রক্তের

মত লাল। আর তার ঘন পল্লবে বিশ্বের শ্রান্তির ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। তারই ওপর মাথার রুখু চুলগুলি বারে বারে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের কালিমা।

বউটি ঘাটের মাথায় থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু তবু থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বুড়ী শাশুড়ীর কাল থেকে কোমর যেন ভেঙে গেছে। আর উঠতে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। তবু কান্নার এখনই হয়েছে কি? বলতে গেলে এখনও তো শুরুই হয়নি! এখনও মানুষটির শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে। কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়। হয় তো আজ দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ-চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো দুপুরেই, কিম্বা বড় জোর সন্ধ্যায়। তার বেশি নয়। কান্নার শুরু হবে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর · সমস্ত জীবন-ভোর · সমস্ত জীবন-ভোর···

এর বেশি তরুবালা আর ভাবতে পাবে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত বাকি জীবনগুলি সমানে চলতে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। যাকে প্রত্যহ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করছি, অকস্মাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—একথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিস্বাদ ঔদাসীন্যে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোন মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা পিছন ফিরে দন্তধাবন করছিল, তরুবালাকে সে লক্ষ্য করে নি। তরুবালা তখন ঘাটের শেষ পৈঠায় পৌছেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে যেন তরুবালাকে দেখে সমীহ করে একটু সরে বসল। বৃদ্ধার দৃষ্টিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু সরে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখীও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু কেউ তাকে কোনো দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটেই বাসন মাজা নিয়ে কত জনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিনজন নামলেই চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার

জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে করে ঠায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায় কে পৈঠার ওপর চিবোনো ডাঁটা ফেলে গেছে; কার পাতের ভাত ঘাটের কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে; কলহের কারণের কি অভাব আছে? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ করে এই বউটির সঙ্গে কিছুতে নয়। ওর সিঁথির সিঁদুর এখনও জ্বল জ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিঁদুর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—মর্মান্তিক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল গৌরব আর কিছু পরেই পথের ধুলোয় মিলিয়ে যাবে, তাকে প্রতিবেশিনীরা সকল গৌরব নিঃশেষ করে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে ক'দিন আগে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভালো লক্ষণ যা ছিল, একটি একটি করে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বৌমা উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে মাথাটা নেড়ে ডান হাত দিয়ে ললাটের চুলগুলি সরিয়ে ফেললে। এই ক'দিনের রোগী-সেবায় আর দুর্ভাবনায় তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। শীর্ণ কর প্রকোষ্ঠে চুড়ি দু'গাছি ঢল ঢল করছে। ওই দু'গাছি সরু চুড়িই আজ তার সম্বল। চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের পর তার গায়ের গহনা অবশেষে ওই দু'গাছিতে এসে ঠেকেছে।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাজ তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। জলে এখনও শীত রয়েছে বেশ।

এই ডোবায় নামলে চারিদিকের উঁচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরুবালা যেন বেঁচে গেল। মুমূর্ষ রোগীর অস্ফুট আর্তনাদ, পাণ্ডুর চোখের কাতর দৃষ্টি, শিশুপুত্রের কখনও দাপাদাপি, কখনও চিৎকার, বৃদ্ধা শাশুড়ীর ভাষাহীন বিহ্বল দৃষ্টি—জরা-মৃত্যু-ব্যাধিগ্রস্ত বিপুল পৃথী তার সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে এই গোষ্পদের সুগভীর

নির্জনতায় তলিয়ে গেল।

তরুবালা মুখ ধোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। সমস্ত রাত ছটফট করে এখন একটু নিস্তেজ হয়ে স্বামী ঝিমুচ্ছে। এখনই উঠবে বোধ হয়। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে শাশুড়ী ও ঘরে এলিয়ে পড়েছেন। ছেলেটা সকালে উঠে পূজোর রঙীন পাঞ্জাবীটা গায়ে দেবার জন্যে বেজায় ঝোঁক ধরেছিল। সেটা বের করে দিতেই ছুটতে ছুটতে পাড়ায় বেরিয়ে গেছে। স্বামীর কাছে কেউই নেই। রোগীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে ওষুধ দিতে হবে। একটুখানি বেদানার রস করে খাওয়াতে হবে। গায়ের ঢাকাটা খুলে গিয়ে থাকলে আবার ভালো করে গায়ে দিয়ে দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গয়লা দুধ দিয়ে গেছে, সেটুকু গরম করে রাখতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ছেলেটা কাঁদবে। কাল শাশুড়ীর একাদশী গেছে। তাঁর দ্বাদশীর ব্যবস্থা করতে হবে! আর নিজের জন্যে না হলেও, ওদের দুজনের জন্যেও তো দুটো ভাতে-ভাত চড়িতে দিতে হবে। মাত্র একটি মানুষেরই জীবনের তেল ফুরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর গতি তো আর বন্ধ হয় নি! যে যাবে সে যাবে, যারা থাকবে তাদের খেতেও হবে, খাটতেও হবে, সবই করতে হবে।

তরুবালার অনেক কাজ।

কিন্তু ডোবার ঠাণ্ডা জল তাকে লোভ দেখাচ্ছে। সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের তরুবালা আর পারে না। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে এই সুশীতল একাকিত্বে যেন মগ্ন হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর খেয়াল রইল না।

খেয়াল রইল না রুগ্ন স্বামীর মুখ, শাশুড়ীর দ্বাদশী-পর্ব, ক্ষুধার্ত শিশুর কাতরতা ঘর-কন্নার আরও সহস্রবিধ খুঁটিনাটি।

খেয়াল রইল না নিজের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অসংখ্য দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের দুর্ভাবনা। বুড়ি শাশুড়ী মরি-মরি করেও আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতকালের পরমায়ু নিয়ে এসেছে। ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে,—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাতত এই তিনটি প্রাণীর দৈনন্দিন দুবেলা দুটি গ্রাসের অন্ন কে জোগাবে সেই তো সমস্যা।

কিন্তু তরুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধরে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার দেহ-মন ভেঙে গেছে,

মস্তিষ্কের ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে ! একটু সে বিশ্রাম চায়। একটু বিস্মৃতি।

ডোবার নীল জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উঁচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা—অবিশ্রান্ত। ঝোপে ঝোপে ক'টি পাখী তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কূজন। তরুবালার সব ভুল হয়ে গেল...

সে ডোবার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আপন মনে খেলা করতে লাগল।

নিবারণ মস্ত বড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিভৃত কোণটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যাবে না। না বেরুবে খবরের কাগজে ছবি, না লেখা হবে ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানা রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক যদি কোনো বড়লোকের মোটর চাপা পড়ে মরতে পারত, কিম্বা পুলিশের গুলিতে, তাহলেও হত। কিন্তু সে মরছে নিতান্ত মামুলি ধরণে—দীর্ঘকাল ধরে রোগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে—আরও কোটি কোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর রাখার উৎসাহ বোধ করে ! আর কি উৎসাহই বা বোধ করবে ? কেউ কি তাকে চেনে ? মানব-সভ্যতায় তার দান কি ?

নিবারণ ক্যানভাসার। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে সে ট্রেনে ফেরি করে বেড়ায়—জি. সি. দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজনের, জয়পুরের মান সিং গুলির, নারকেল তেলের মসলার, সুগন্ধী ধূপকাঠির, আর মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা ঝম্ ঝন্ কন্ কন্ করার অব্যর্থ ও একমাত্র ওষুধ মাথলিনের !

তার বয়স পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে তার বয়স বলা শক্ত। নিবারণ সাধারণ বাঙালীর চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে, রোগা। সে তুলনায় গোফজোড়া যথেষ্ট বড়। আর জুল্‌ফি নামাতে নামাতে গালপাট্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাংসহীন। চোয়াল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নাকের গোড়াটা চ্যাপটা, কিন্তু ডগাটা বর্তুলাকর। হাঁ-মুখ অসম্ভব রকম বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কণ্ঠ ? নিবারণ পাশের গাড়িতে কথা বললেও এ গাড়ি থেকে শোনা যায়।

লোকটি ওরই মধ্যে একটু সৌখীন ! গায়ে থাকে একটি সিল্ক, নয়তো লংক্লথের পাঞ্জাবী। পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত। হাতে রিস্ট-ওয়াচ। মাথার চুলে পরিপাটি টেরি ! এর সঙ্গে মিলত না তার জুতো। সময়াভাবে জুতোয় কালিও দিতে পারত না, মেরামতও করাতে পারত না। আর সময়ের অভাব

ঘটত ক্ষৌরকর্মে। ক্যানভাসারের রবিবারও নেই, দোল দুর্গোৎসবও নেই। সেই কারণে মুখমণ্ডল প্রায়ই শ্মশ্রুকণ্টকিত হয়ে থাকত।

ন'টার সময়ে যা-হোক-দু'টি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হত। এই যা-হোক-দু'টির ব্যবস্থা করতেই তরুবালাকে উঠতে হত ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিদ্রাবিলাসী। উঠতে তার সাড়ে সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে? তরুবালা চা নিয়ে এসে কত সাধ্যসাধনা করে তবে ওঠাত। চোখ বুঁজে বুঁজেই নিবারণ চা-টুকু খেয়ে নিত। তারপরে একটু অবসাদ কাটলে, উঠে তেল মেখে, একেবারে দাঁতন করতে করতে নাইতে যেত—কি শীত, কি গ্রীষ্ম। স্নান করে এসেই খেতে বসা, তারপরে ন'টা-সাতের ট্রেন ধরতে স্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় তরুবালা হাসিমুখে দুটি পান দিত—প্রত্যহ। এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে বাপের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কোন দিন প্রসাদ পেত, কোন দিন পেত না।

তারপরে?

—জি. সি. দত্তের বিখ্যাত নিমের মাজন চাই? মাজন? আপনারা অনেক দামি দিশি ও বিলাতি মাজন ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিমের মাজনও একবার ব্যবহার করে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মাজনে কোন অদ্ভুত জিনিস নেই। এ আমাদের দিশি গাছ-গাছড়ায় তৈরি। এতে আছে আমলা, হরিতকী, বহেড়া··দাঁত নড়া, দাঁতে রক্ত পড়া দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করা, দাঁতের পোকা প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ একদিনেই আরোগ্য হবে! এ আমার বাজে কথা নয়, মহাশয়গণ। যাঁদের দাঁত হল্ হল্ করে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মাজন পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি। এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক কৌটার দাম মাত্র দুপয়সা। এক সঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। যাঁর দরকার হবে চেয়ে নেবেন।

মুখের গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। যাদের দাঁত হল্ হল্ করে নড়ে তারাও এই ট্রেনে, মুখ ধোবার জল নেই কিছু নেই, এমন মহৌষধ ব্যবহার করে দেখতে সম্মত হয় না। তবু প্রয়োজন মত কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

নিবারণ বিখ্যাত মাজন ব্যাগে পুরে আবার একটা নতুন জিনিস তুলে চিৎকার আরম্ভ করে:

—জয়পুরের মানসিং গুলি। চাই কারও? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি. একটু দয়া করে শুনবেন।

হয়ত কোন ভদ্রলোক একটু ঝিমুচ্ছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলেন, দয়া না করেও শুনতে পাচ্ছি মশাই, একটু আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটুও না নামিয়ে বলে চলে,—মুখস্থ বলার মতো :

—মহারাজা মানসিংহ এই গুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়গণ, আপনাদের দেশে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যাতে বিলিতি ওষুধের দোকানের ছাপমারা নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন। আমার মুখের কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলা ধরা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টন্সিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো গুলির শিশি মাত্র চার আনা। আমার কাছে নমুনার ছোট শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। যাঁর আবশ্যক হবে, চেয়ে নেবেন।

তারপর নারকেল তেলের মসলা। তারপরে মাথলিন।

সবই পরের পর নিবারণ তোতাপাখীর মতো গড় গড় করে বলে। যাদের ওষুধ, কি বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ বলে যায়। তার নিজের 'অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে দেওয়ায়।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধী ধূপের বেলায়। সেই জন্যে এইটে সে সব শেষে বলে :

—ধূপ চাই? মহীশূরের ধূপ? বাসর-মজান, রতিবিলাস ধূপ আছে!

সকলের দিকে চেয়ে আবার বলে :

—রতিবিলাসও বটে, আরতিবিলাসও বটে! যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'বাসর-মজান', 'রতি-বিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতিবিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই 'সাহিত্যিক' প্রচেষ্টায় সে বেশ গর্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ধূপ বিক্রী করে, কিন্তু তারা শুধু বলে মহীশূরের সুগন্ধী ধূপ। নিবারণের 'ট্রেড-মার্ক' যেন কেউ ব্যবহার না করে সেজন্যে তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

নিবারণ তার 'ট্রেড-মার্কের' ফল শ্রোতৃবৃন্দের ওপর কি রকম হল—চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে :

—যাঁরা অনেকদিন পরে বাড়ি যাচ্ছেন তাঁরা অন্তত এক প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করবে, 'মানুষের' মুখে হাসি ফুটবে, সুখে নিশি প্রভাত হবে, আর আমার ধূপের জয় জয়কার হবে। বাসর-মজান ধূপ। সুগন্ধে বাসর রাত্রির কথা মনে পড়বে। নিয়ে যান। রতিবিলাস ধূপ, আরতিবিলাসও বটে,—যাঁর যেমন দরকার। এক প্যাকেট মাত্র দু'পয়সা, পাচ পয়সায় তিন প্যাকেট। এক রাত্রেই দামের চতুর্গুণ উশুল হবে।

নিবারণ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক ধূপটা বিক্রি হয় বেশ, মানে অন্য জিনিসের চেয়ে বেশি।

প্রায়ই কামরায় দু'একজন পরিচিত লোক থাকেন। ছ'বছর ধরে এই লাইনে সে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রসিকতা হয় :

—এই যে বাবুদাদা, আবার অনেকদিন পরে যে! কলকাতায় বাসা করেছেন? বেশ, বেশ, তা, হোক, বাসর-মজান ধূপ দু'প্যাকেট নিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না!

বাবুদাদার 'না' বলবার উপায় থাকে না। ততক্ষণে নিবারণ তাঁকে দু' প্যাকেট ধূপ গছিয়ে দিয়েছে।

বাবুদাদা কেবল একবার বলেন, দু'প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয়? কলকাতায় বাসা করেছেন আবার কবে দেখা হবে···কি রকম! বড়বাবু নাকি? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মসলা। আজ শনিবার। জানি কি না, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই ছ'বছরের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে।

—ক' প্যাকেট দোব! দু'টো? চারটে?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও ফুরোয়নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্যে স্পেশাল তৈরি করে রেখেছিলাম বাড়ি নিয়ে যান, যিনি সমঝদার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো করে হাসলে।

প্রতি কামরাতেই এমনি দু'একজন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বাবু। কিন্তু কারও নাম সে জানে না তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পাতিয়ে নিয়েছে নতুন করে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্বিঘ্নে। প্রতিদিনের লেন-দেনে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভালো করে চেনবার জন্যে কোনো পক্ষেরই কৌতূহল এর চেয়ে বেশি এগোয়নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই! ঘরে মা, স্ত্রী, একটা শিশুপুত্র,—আর বাইরে এরা। তার নামের কারবার নেই! মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয় নি। যে যা খুশি তাই বলে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু। এই নামের পৃথিবীতে তার কারবার একটু অদ্ভুত ধরনের। যত নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ পেলে, কেউ পেলে না। কেউ জানলে, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে একবার বোধহয় অনুভব করলে।

তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে তো রয়েইছে।

ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মতো আপনমনে জল নিয়ে খেলাই করছে, খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।

ঘোষাল-গিন্নি ঘাটে এসে সশব্দে বাসন নামালেন। তরুবালার কানে এশব্দ পৌঁছুলই না। তাকে অমন নিশ্চিন্তভাবে জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ঘোষালগিন্নি ভাবলেন, নিবারণ বোধহয় ভালোই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

নিবারণ? নিবারণ কে? তরুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারে নি এমনি করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তারপরে বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ···যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, ভায়ের চোখের সুমুখে মরে ভাই

নিষ্ঠুর, কদর্য পৃথিবী।

তরুবালার চোখের পল্লবে আবার ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ ছায়া, ঠোঁটে জাগল নিরতিশয় অসহায়তা, আর দুই চোখে ভরে উঠল অসীম শূন্যতা।

তরুবালা মাথায় ভালো করে ঘোমটা দিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললে, ভালো নেই খুড়িমা।

সামনের মরা আমড়া গাছের শুকনো ডালে একটা কাক এমন করে ডেকে উঠল যে, দুজনেই ভয়েভাবনায় শিউরে উঠল।

সেদিন আর নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সকালেই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঘোষালগিন্নি চটপটে মেয়ে। ব্যাপার বুঝে সকালেই নিবারণের ছেলেকে দুটো ভাতে-ভাত নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জেদাজেদিতে তরুবালাকেও অমন অবস্থায় স্বামীকে ফেলে রেখে একবার থালার সামনে বসতে হয়েছিল, এক টুকরো মাছও মুখে দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশিনীরা তাকে জোর করে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল বাড়ির রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন এক টুকরো মাছও তার মুখে গুঁজে দেয়। এ নাকি লক্ষণ!

তখনই তরুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু কথা নিবারণের সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। চোখ মেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা।

সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ চলে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই অতি সামান্য। ট্রেনের জনৈক সহযাত্রীর মুখে এই ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেক দিন আগের। কিন্তু আমাদের ট্রেন সেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল নিবারণকে, অনেক দিন পরে।

এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পথ দিয়ে হাজার ট্রেন এসেছে, গেছে। হাজার হাজার যাত্রী। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে কচিৎ কারও হয়তো তাকে মনে পড়েছে, একটি মুহূর্তের জন্যে। তেমনি করে আমারও তাকে মনে পড়ল অনেক কাল পরে। ওই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখে-দেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি

কোথাও বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

একবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনো একজন লোকের জন্যেও নয়। একবার শুধু মনে হল যাদের চিনতাম তাদের মধ্যে কত মানুষই নেই। চকিতে সমস্ত মন কেমন উদাস হয়ে গেল।

ট্রেন চলেছে ঝড়ের বেগে।

শ্রীরামপুর,···শ্রীরামপুর···

নতুন স্টেশন। সে পানাপুকুরের চিহ্ন মাত্র নেই। আবার নতুন জগৎ, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের মন পাচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তারও হল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বসন্ত-রাত্রির স্মৃতি

সুচরিতার সঙ্গে যে এখানে দেখা হইতে পারে কমলেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। বস্তুত পক্ষে সুচরিতার কথাই সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। দৈব আর কাহাকে বলে! কোথায় কলিকাতা, আর কোথায় রামটেক পাহাড়! দেখা হইল সেইখানে···সুচরিতার সঙ্গে···পনেরো বৎসর পরে!

চারিদিকে পাহাড়ের বেষ্টনী, মধ্যে একটি ঝিল। পাহাড় আর ঝিলের মধ্যে শুধু এক ফালি লাল রাস্তা আংটির মতো ঝিলটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। পাহাড়ের চুড়ায় শ্রীরাম-সীতার মন্দির। নিচে হইতে উঠিবার জন্য চমৎকার সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির দুধারে সারি দিয়া অগণিত বানরের দল বসিয়া থাকে।

বৃদ্ধ পিতার পাশে বসিয়া সুচরিতা পরম কৌতুকভরে ইহাদেরই কতকগুলিকে ছোলা খাওয়াইতেছিল। এমন সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল, উপর হইতে ইংরাজি পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে অত্যন্ত ঢিলাভাবে নিচে নামিয়া আসিতেছে!

কৌতুক বন্ধ করিয়া সুচরিতা শান্তভাবে পিতার পাশে বসিল। বানরগুলা খেলা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুণ্ণভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল।

অমন দীর্ঘ দেহ এবং গৌরবর্ণ সাধারণ বাঙালীর মধ্যে দেখা যায় না। যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে তাহার আর কমলেশকে ভুল করিবার উপায় নাই। অত দূর হইতেও সুচরিতা তাহাকে চিনিতে পারিল।

ঠিক চেনা নয়,—তাহার কেমন মনে হইল, ভদ্রলোক কমলেশ নয় তো? কিন্তু কমলেশ···এখানে?

আরও কাছে আসিলে সুচরিতা নিশ্চয় করিয়া চিনিতে পারিল। সেই কমলেশ! কেবল মুখের ভাবে একটা গাম্ভীর্য আসিয়াছে, সেই সঙ্গে কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়াও যেন নামিয়াছে! দেহ একটু স্থূল হইয়াছে, আর মাথায় পড়িয়াছে টাক।

সুচরিতার হাসি আসিল! এই চল্লিশ বছরেই টাক!

সুচরিতা তাহার পিতার গা-টিপিয়া মৃদুস্বরে বলিল, কমলেশ নয়?

কমলেশ? মিঃ ঘোষ ভাবিতেছিলেন, তাঁহার ব্যাঙ্কের কথা। এখনও অনেক

দূর যাইতে হইবে,—সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত। আরও অনেক টাকার দরকার। সেটা ঠিক কোথায় পাঠাইবার জন্য ব্যাঙ্ককে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে সে এক সমস্যার ব্যাপার। আসল কথা এখান হইতে তিনি বোম্বাই যাইবেন, না জব্বলপুর যাইবেন, সেইটাই এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মেয়ের প্রশ্নে তিনি যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। বিস্মিতভাবে শুধু বলিলেন, কমলেশ?

কিন্তু সুচরিতা এবার আর কোন উত্তর দিল না। হয়তো পিতার কথা তাহার কানেও প্রবেশ করে নাই। কমলেশ তখন একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সুচরিতা তাহার সুমুখে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিল।

কমলেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতাকে সেও প্রথমে চিনিতে পারিল না। না পারারই বা অপরাধ কি? পনেরো বছর দেখা নাই। এতদিন পরে রামটেক পাহাড়ে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে এ কথা কে ভাবিয়াছিল?

কমলেশ থমকিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সে এক মিনিটও নয়। তারপর শ্লথকণ্ঠে বলিল, মি সে স রা য়!

অতীত দিনের মত ললিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সুচরিতা দ্রুত মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমি সুচরিতা।

তারপরে বাপের দিকে চাহিয়া সহজভাবে বলিল, তুমি বাবাকে চিনতে পারলে না?

তাড়াতাড়ি মিঃ ঘোষের কাছে গিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া কমলেশ বলিল, হঠাৎ এদিকে যে! আমি তো···

পাশের একটা জায়গায় হাত দিয়া নির্দেশ করিয়া ঘোষ বলিলেন, বোসো।

তারপর মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বেরিয়েছি দেশভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে এইখানে। তারপর তুমি এদিকে যে!

—আমি তো নাগপুরেই থাকি আজকাল। এ জায়গাটা আমার বড় ভালো লাগে। তাই মাঝে মাঝে আসি। কিন্তু আপনাদের যে দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

বলিয়াই সুচরিতার পানে চাহিল। এই পনেরো বছরে সুচরিতা কেবল একটু মোটা হইয়াছে, নহিলে ত্বকের সে মসৃণতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই,—অমন সুন্দর রঙেও বার্ধক্যের ম্লান ছায়া পড়ে নাই। আর তাহার নিজের?

কমলেশ আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

মিঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর ? এখানে প্র্যাকটিসের অবস্থা কি রকম ?

অবস্থা যে ভালো নয় কমলেশ শুধু ঠোঁট উল্টাইয়া ঘাড় নাড়িয়া সে কথা জানাইয়া দিল।

— ভালো নয় ? দিনে দিনে কি যে হচ্ছে ! আর আমাদের কালে···

সুচরিতা মনে মনে কেন জানি না চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সে কালের কথা ঘোষ সাহেব একবার তুলিতে পারিলে আর নিস্তার নাই ! দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে সুরে বৃদ্ধ অনর্গল বকিয়া চলিবেন। সুচরিতা তাহা জানে। তাই সেকালের কথা উঠিতেই সে সশঙ্কিত ভাবে কথাটা ঘুরাইবার জন্য বলিল,

—এইবারে কিন্তু তোমাকে উঠতে হবে বাবা। তোমার 'স্যানাটোজেন' খাওয়ার সময় হল।

বৃদ্ধের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। তবু নিতান্ত ভালোছেলের মত বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবারে ওঠা যাক।

কমলেশের পানে চাহিয়া সুচরিতা বলিল, তুমি কোথায় উঠেছ ?

কমলেশ তাহাদের সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, একই জায়গায় ! এখানে ওই ধরমশালা ছাড়া আর ওঠবার জায়গা নেই।

সুচরিতা উল্লসিত বিস্ময়ে বলিল, বাঃ ! এক জায়গায় রয়েছি, অথচ দুজনে দেখা নেই !

কমলেশ হাসিয়া বলিল. না হওয়ারই কথা। আমি এসেছি কাল রাত্রে, আর ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু তোমরা মন্দির দেখতে যাবে না ?

ঘোষ সাহেব কন্যার মতামতের জন্য জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিলেন।

সুচরিতা কহিল, এখন থাক, বাবা। বেলা হয়ে গেছে। বরং বিকেলের দিকে ওঠা যাবে।

সুচরিতা নয়, মিসেস রায়।

তখন সুচরিতা অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছে। নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া সকলেই তাহাকে মিসেস রায় বলিয়াই ডাকিত। এ নামেই কমলেশের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয়। দেখিতে দেখিতে সেই মিসেস রায় সুচরিতা হইল এবং তাহাদের সমাজে ব্যাপারটা লইয়া বহু প্রকারের সরস গবেষণা চলিতে লাগিল।

সুচরিতার আতিথ্যে কমলেশের দিনটা আজ মন্দ কাটিল না। মধ্যাহ্ন আহারের পর শুইয়া শুইয়া কমলেশ সেই সকল পুরাতন কথাই ভাবিতেছিল।

সেই বসন্তরাত্রির কথা তাহার বেশ মনে পড়ে। পনেরো বছর আগের ঘটনা, কিন্তু আজ কমলেশের মনে হইল সে যেন গত কালের কথা।

কি একটা উপলক্ষ্যে ঘোষ সাহেবের বাড়িতে পার্টি হইয়াছিল। বাড়ির সুমুখের প্রশস্ত লনে মজলিস বসিয়াছিল। কমলেশ তখন সবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে। তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বন্ধুগণের অনুরোধে সেখানে সে এস্‌রাজ বাজাইয়াছিল!

বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি। সমস্ত লনটি স্বপ্নলোকের মতো নীলাভ হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে-মাঝে কয়টি ফুল ফুটিয়াছিল—রক্তের মতো টক্‌টকে লাল। কমলেশের এস্‌রাজের সুর যেন সেই লাল ফুল, নীলাভ-কৃষ্ণ বৃক্ষপত্র ছুঁইয়া ছুঁইয়া অসীম শূন্যে, উর্ধ্বলোকে গলিয়া যাইতেছিল। কখনও তারে-তারে ওঠে ঝঙ্কার,—সে ঝঙ্কার যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মত ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, ফেনায়িত হইয়া উত্তাল হইয়া ওঠে। আবার পরমুহূর্তেই অতি মৃদু, করুণ আর্তনাদে মেঘের বর্ণচ্ছটার মতো ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। উর্ধ্বের স্বর্গলোক সুরের সূতায় ভাসিতে ভাসিতে স্বপ্নালু চোখের সুমুখে নামিয়া আসিল। স্বর্গে মর্ত্যে মিশিয়া সে এক অপূর্ব লোকের সৃষ্টি হইল।

বাদ্য শেষ হইল। সমস্ত লোক, সুমুখের প্রসারিত লন, টক্‌টকে লাল ফুল কয়টি যেন ঘুমঘোরে ঝিমাইতে লাগিল।

সেই রাত্রে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর সুচরিতা তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমাকে আপনি এস্‌রাজ শেখাবেন?

সুচরিতার বড় বড় আয়ত আঁখি,—তাহাতে যেন স্বপ্নের কাজল লাগিয়াছিল। সে চোখে তাহার পঁচিশ বৎসরের জীবনের অভিজ্ঞতার কোন চিহ্নই ছিল না। এ যেন নিতান্ত অনভিজ্ঞ একটি কিশোরী মেয়ে, তাহার কাছে বাজনা শিখিবার আব্‌দার করিতেছে।

তারপরে আরও কত কৌমুদীস্নাত বসন্তরাত্রি আসিয়াছে,—আরও কত বর্ষা রাত্রি, কেয়াগন্ধ-ভারাতুর। দুজনের জীবন ভরিয়া আসিয়াছে কত আনন্দ—কখনও ললিত-ছন্দ-চঞ্চল, কখনও বিরহ-বেদনা-মন্থর।

তারপরে?

তারপরে ধীরে ধীরে কখন যে আনন্দের ছন্দে তাল কাটিল কেহ জানিতেও পারিল না। পনেরো বছর পরে আজ সকালে আবার দুজনে দেখা!

কমলেশের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। সুচরিতা হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত

সহজভাবে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া অদূরে বসিল।

অকারণে একবার মুখ মুছিয়া বলিল, তারপরে? শুনি তোমার কথা।

কমলেশ বালিশে ঠেস দিয়া আর একটু উঁচু হইয়া শুইয়া বলিল, আমার কথা? আমার তো আর কোন কথাই নেই সুচরিতা। তুমি যতদূর পর্যন্ত জানো, সেই আমার কথা। তারপরে যা ঘটেছে সে কথাও নয়, কাহিনীও নয়, কিছুই নয়।

সুচরিতা আর কমলেশ। কিন্তু কে বলিবে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা! এ যেন দুটি নিকট আত্মীয়ে অকস্মাৎ দেখা হইয়াছে,—দেখা হইয়াছে ট্রেনের কামরায়। সময় তো বেশি নাই। তাই তাড়াতাড়ি কুশল প্রশ্ন সারিয়া লইতেছে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে তো করেছ?

—করেছি।

সুচরিতা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, তারপরে?

—ছেলেপুলে হয়েছে।

—ক'টি?

—তিনটি ছেলে, চারটি মেয়ে।

এবারে সুচরিতা জোরে জোরেই হাসিয়া ফেলিল।

কমলেশ অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া বলিল, হাসছ যে!

—না হাসিনি। আচ্ছা, তোমার সেই ক্যারম খেলার সখ এখনও আছে?

—আমার? পাগল! এই বুড়ো বয়সে···হুঁঃ!

সুচরিতা আর কোন কথা কহিল না। আপন মনে আপনার শাড়ির প্রান্ত লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

একটু পরে কমলেশ বলিল, তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি সুচরিতা। ঠিক তেমনি আছ। কেবল একটু স্থূল হয়েছ। কিন্তু সে কিছুই নয়।

অপাঙ্গে দৃষ্টি হানিয়া সুচরিতা হাসিয়া বলিল, সত্যি?

—সত্যি।

—সবাই তাই বলে।—বলিয়া সুচরিতা মুখ নিচু করিয়া এক অপূর্ব ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কমলেশ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

—সবাই মানে? অপূর্ব বাবু?

এবারে সহজ চোখে সুচরিতা সোজা তাহার পানে চাহিল। বলিল, অনেক বাবুই বলেন। তাঁদের নাম জেনে আর কি হবে?

কমলেশ এক মিনিট তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। কিন্তু তখনই কি

ভাবিয়া আবার ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল। বলিল, যাও, এ তোমার সেই পুরোনো কৌশল।

বিস্মিত ভাবে সুচরিতা বলিল, পুরোনো কৌশল!

—হ্যাঁ, পুরোনো কৌশল। মনে নেই অপূর্ববাবুর কথা বলে তুমি কেমন করে আমার ঈর্ষা উদ্রিক্ত করতে? আমি জানতাম, অপূর্ববাবু তোমারও ভালোবাসার যুগ্যি নয়, আমারও ঈর্ষার যুগ্যি নয়। তবু তুমি যখন তোমার স্বভাব-সুন্দর নিস্পৃহভাবে তার কথা বলতে, আমি ভাবতাম, তোমার মন বুঝি বাঁধা রয়েছে সেইখানে,—আমার আর কোন আশাই নেই। অপূর্ববাবুর চিন্তা কীটের মতো আমাকে দিবারাত্রি দংশন করত! সে দংশনে জ্বালা যত না ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল অস্বস্তি।

সুচরিতা হাসিয়া বলিল, আমার কি এ সবই কৌশল?

—আমার তাই মনে হয়।

সুচরিতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। কহিল, কৌশল নয়, ও আমাদের একটা বিলাস। তোমাদের দুঃখ দিতে আমাদের ভালো লাগে তাই দিই।

সুচরিতার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কমলেশ এই কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর কহিল, আচ্ছা, তুমি যে আরও অনেক নতুন বন্ধুর খবর দিলে সে কি সত্যি?

সুচরিতা ঈষৎ বিরক্ত হইল। তবু সে বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কেন সত্যি নয় শুনি। আমার দেহে রূপ আছে, পূজারী আসবে না? অনেক ভক্তই আসে। কেউ বাঞ্ছিত, কেউ বা অবাঞ্ছিত। তা হোক। যে ভগবান এত রূপ দিয়েছেন তাঁরই পরে কৃতজ্ঞতা স্মরণ করে আমি সবাইকে সহ্য করি।

তর্কের উত্তেজনায় কমলেশও ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। বলিল, এত ভক্ত দিবারাত্রি তোমার চারিদিকে গুঞ্জন তুলছে, এতে কি কোন গ্লানি তুমি বোধ কর না?

—গ্লানি? কিছুমাত্র না। মনে হয়, আমার দেহ যেন দেবতার মন্দির। বহু ভক্ত রোজ এসে পূজা দিয়ে যায়। কিন্তু সে তো আমার ব্যক্তিকে নয়। মানুষের মনে আছে রূপের পিপাসা। আমার দেহের মেঘে অনন্ত রূপের আভা এসে পড়েছে—সকল পূজা, সকল স্তবস্তুতি সেই অসীমের! সহ্য করি সেই জন্যে।

কমলেশ ব্যারিস্টারী করে। মানুষের লোভ, মানুষের পাপ, মানুষের কদর্যতা এই লইয়া তাহার কারবার। একটা কথা সুন্দর করিয়া বলিলেই ভুলিয়া যাইবে এমন সহজ পাত্র সে নয়।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া সে শুধু বলিল, চিরদিন তোমার একরকমেই গেল। আমি ভেবেছিলাম,

তাহার কথাটা লুফিয়া লইয়া তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সুচরিতা বলিল, তুমি ভেবেছিলে আমার টাক পড়ে গেছে, গায়ের চামড়া লোল হয়ে গেছে, দেহ আর ঋজু নেই, কেমন? কিন্তু তা নয়। আমার চিরদিন এক রকমেই গেল। যেদিন রকম-ফের হবে সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।

সুমুখের জানালা দিয়া চাহিলেই একটা পাহাড় নজরে পড়ে। দেখিলে মনে হয়, এখান হইতে কয়েক পা গেলেই পাহাডটা ছোঁয়া যাইবে। কিন্তু কমলেশ জানে পাহাডটা কাছে নয়, অনেক দূরে।

কমলেশ সেই দিকেই অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া ছিল। সুচরিতার কথায় তাহার চমক ভাঙিল। চকিতে একবার তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ও সুগঠিত দেহশ্রীর পানে চাহিয়া কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারিল না।

একটু পরে কমলেশ জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে তোমরা কোথায় যাবে?

সুচরিতা হাসিয়া বলিল, সেইটেই এখনও ঠিক করতে পারি নি। চল না, তোমার ওখানেই যাওয়া যাক। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে তো?

এবারে কমলেশ হাসিয়া বলিল, না।

—কেন বল তো?

—আমার টাক দেখেই যে ঠাট্টা করলে, তাকে দেখলে তো হেসে গড়িয়ে পড়বে।

বাঁ হাত দিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া সুচরিতা বলিল, আহা, তোমার বউকে যেন আমি কখনও দেখিনি কি না?

—দেখেছ?

—দেখব না কেন? আমাদের কলেজেই তো পড়ত। খুব ভালো নাচতে পারত। কেমন কি না?

অলসভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কমলেশ বলিল, তা জানি নে, নাচ কখনও দেখিনি। কিন্তু তখন কি ভুঁড়ি ছিল?

সুচরিতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, ভুঁড়ি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুঁড়ি। উদর প্রদেশের স্ফীতি। ছিল?

—ভুঁড়ি হয়েছে না কি?

কমলেশ গম্ভীরভাবে কহিল, হয়েছে। আর দেহের ওজন দাঁড়িয়েছে দু'মণ পনেরো সের।

হাসিতে হাসিতে সুচরিতার মাথা কমলেশের বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

—ভুঁড়ি কি গো?

কমলেশ শুধু একটু হাসিল, এবং অতি সন্তর্পণে সুচরিতার মাথার উপর দক্ষিণ করতল রাখিল। সুচরিতা তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার জন্যে বড় দুঃখ হয়।

—দুঃখ? দুঃখ কেন?

সুচরিতা উত্তর দিল না, শুধু অবনত মুখে অপাঙ্গে একবার চাহিল।

কমলেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুঃখ আমার কিছুই নেই সুচরিতা। একদিন আমারও রূপের সবাই প্রশংসা করত। সেদিন এই দেহের সেবাও কম করি নি। আজকে আমার টাকের উল্লেখ করলে কিছু দুঃখ হয় না। দুঃখ হয়, কেউ যদি বলে আইনে আমার জ্ঞান নেই।

—কিন্তু আইনের চর্চা করেই তো একটা লোকের দিনরাত্রি কাটতে পারে না।

—তা পারে না। কিন্তু আমি তো শুধুই ব্যারিস্টারী করি না। বড় ছেলে-মেয়ে দুটোর পড়া দেখি মাঝে মাঝে। ছোটগুলির সঙ্গে খেলা আছে··· কিন্তু এ সব তুমি বুঝবে না সুচরিতা। আমার দিনরাত্রি কাজে আর অবকাশে ভরাট হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

কিন্তু এ সকল কথায় সুচরিতা কোনো আগ্রহ অনুভব করিল না। সে বলিল, পনেরো বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। একটা অনুরোধ করলে শুনবে?

—কি অনুরোধ শুনি?

তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া বলিল, তোমার এস্‌রাজ শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। শোনাবে? আনব আমার এস্‌রাজটা?

এস্‌রাজের কথা শুনিয়া কমলেশ ম্লানভাবে একটু হাসিল। বলিল, এসরাজ তো আর আমি বাজাই না সুচরিতা। আর পারিও না, হাত ভারি হয়ে গিয়েছে।

বিস্ময়ে সুচরিতার প্রথমটা মুখে কথা জোগাইল না। এস্‌রাজ বাজায় না! কিন্তু তখনই কথাটা পরিহাস ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল। উঠিতে উঠিতে বলিল,—

—আচ্ছা, দেখি তো কেমন হাত ভারি হয়ে গিয়েছে!

সুচরিতার ও-ঘর হইতে এস্‌রাজ আনিতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগিল না। কমলেশের দেওয়া সেই এস্‌রাজটি,—হাতির দাঁতের কাজ করা। একটি

কোণে সোনার উপর মীনায় দুজনের নামের আদ্যাক্ষর পাশাপাশি বসানো। সুচরিতা এস্‌রাজটি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। কমলেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই দুটি অক্ষর বারে বারে দেখিতে লাগিল।

—বাজাও।

কমলেশ তাহার হাতে এস্‌রাজটি ফিরাইয়া দিল। মনে হইল, যেন তাহার চোখ ছলছল করিতেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তোমাকে আমি মিথ্যে বলিনি, সুচরিতা। আমার হাত ভারি হয়ে গেছে,—ছড় টানতে হাত কাঁপে। সে আর তুমি নিজের চোখে নাই দেখলে। বরং তুমি একটু বাজাও, আমি শুনি।

সুচরিতা বাজাইতে লাগিল। সুচরিতার হাত আরও চমৎকার খুলিয়াছে। সে কমলেশের পাশে বসিয়া তাহারই সেখানো একটি গৎ তাহারই মত সুন্দর করিয়া বাজাইতে লাগিল। চোখ বন্ধ করিয়া কমলেশ গৎ শোনে।

বাজনা শেষ করিয়া সুচরিতা তাহার পানে চাহিল।

কমলেশ শুধু বলিল, চমৎকার!

সুচরিতা আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া কমলেশের বুকের উপর মাথা রাখিল। বলিল, তুমি যতই বল, তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে,

সুচরিতা একটু থামিল। কহিল, মনে হচ্ছে, তুমি যেন আত্মহত্যা করেছ।

দক্ষিণের জানালা দিয়া এক ঝলক হাওয়া আসিয়া সুচরিতার মাথার স্বল্প গুণ্ঠন স্থানচ্যুত করিয়া দিল। তাহার কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে কমলেশ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। এবার আর সে কোন প্রতিবাদ করিল না।

অকস্মাৎ তাহার নজরে পড়িল...

নজরে পড়িল একগাছি পাকা চুল!

কমলেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, এ কি! তোমার মাথায় পাকা চুল!

সুচরিতা যেন জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিট্‌কাইয়া দূরে চলিয়া গেল।

—পাকা চুল! তুমি কি পাগল হয়েছ! পাকা চুল আবার কোথায় দেখলে। পাগল আর কি!

সুচরিতা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু সুচরিতা আর ফিরিয়া আসিল না।

কমলেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিল।

তাহার কোলের কাছে এস্‌রাজখানি পড়িয়া আছে।

ওপিঠ

সেদিন কিন্তু বিকাল হইতে এমন ঝড়বৃষ্টি নামিল যে, অমল এবং বিলাস আড্ডা জমিবার সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া বসিল।

অকস্মাৎ রাত প্রায় আটটার সময় ছাতা মাথায় দিয়া ঝপ্‌ঝপ্‌ করিতে করিতে অশোক আসিয়া উপস্থিত। ছাতিটা দরজার এক কোণে রাখিয়া ভিজা পা দুইটা ঠুকিয়া অশোক বলিল, বাপ্‌!

অমল ও বিলাস উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, হুর্‌রে!

এই আড্ডাটির ওপর অশোকের মমতার সীমা ছিল না। কিন্তু এতটা পথ বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিলে সকলেই বিরক্ত হয়। সে ইহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল, হয়েছে, হয়েছে থাম। চ্যাঁচাসনে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ক্রোধে নিজেই লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঘরের মধ্যে আরামে বসে রয়েছ আর হুর্‌রে লাগাচ্ছ। কি যে বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেল তা তো আর টের পাচ্ছ না।—বলিয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া মাথাটি মুছিতে লাগিল।

অমল বলিল, ভিজেছিস্‌ তো কি হয়েছে? বিলাসদা—

বিলাস হাত নাড়িয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, হচ্ছে হচ্ছে। জিরিয়ে নিক একটু।

অশোক তাড়াতাড়ি বলিল, না, না, আজকে না।

অমল প্রতিবাদে একটা কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, না, না, ক'দিন থেকে বৌ-এর খুব অসুখ হয়েছে। প্রায় সমস্ত রাত জাগতে হচ্ছে।

বিলাস বলিল, রাত জাগতে হচ্ছে? তাহলে তো আরও বেশি দরকার। অমল!

Yes, sir, বলিয়া অমল ড্রয়ারের মধ্য হইতে একটা বোতল আর একটা গ্লাস বাহির করিল। তারপরে ফট্‌ করিয়া একটা সোডার বোতল ভাঙিয়া চক্ষের নিমেষে খানিকটা মিকশ্চার করিয়া অশোকের সামনে ধরিয়া বলিল,—Please, sir.

মাথা ঈষৎ হেলাইয়া অশোক বলিল, Thanks. তারপর ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া

সবটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া বলিল, চমৎকার জিনিস তো ? White Label ?

আর একটা মিকশ্চার তৈরি করিতে করিতে অমল বলিল, হুঁ, হুঁ বাবা, জিনিস চিনলে না আজও। আমি তো গন্ধ শুঁকেই বলতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধরিয়া ইহাই চলিল। অকস্মাৎ হুঁ, হুঁ, করিয়া একটা রাগিণী ভাঁজিয়া টেবিলে দুইটা তেহাই দিয়া অশোক বলিল, ভারি গান শুনতে ইচ্ছে করছে মাইরি।

বিলাস নবাবী চালে ঘাড়টা দোলাইয়া বলিল, কুছ্ পরোয়া নেই, ট্যাক্সি বোলাও, আমি দোব টাকা—বলিয়া এক তাড়া নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

অমল নোটগুলা বিলাসের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, টাকা দিবি তুই ? অশোক থাকতে !

অশোক উত্তেজিত ভাবে টেবিলে দুইটা ঘুসি মারিয়া বলিল, I say, ট্যাক্সি বোলাও !

একেবারে সটান কুন্দরাণীর বাড়ি।

কুন্দরাণী সাজিয়া গুজিয়া বসিয়াই ছিল। অমল তাহার রূপ, তাহার সজ্জা দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, বিউটিফুল !

কুন্দ সহাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

বিলাস বলিল, তোমার গান শুনতে এলাম, কুন্দ।

কুন্দ বলিল, কি গাইব হুকুম করুন।

অমল মধ্য হইতে বলিল, যা খুশি, যা খুশি,—বিরহ, মিলন, মান, অভিমান—anything.

অমলের অবস্থা দেখিয়া কুন্দ হাসিয়া ফেলিল। পয়সা যেখানে পরের পকেট হইতে ব্যয়িত হয়, সেখানে সে নিজের পেটের আন্দাজ রাখিতে পারে না।

কুন্দ গাহিল,—'বঁধু হে, আর কোর'না রাত।'

গান চলিল, বাজনা চলিল,—অনেক গান এবং অনেক বাজনা।

এমনি জমজমাটের মধ্যে কুন্দ অকস্মাৎ দেখিল, অমল ফরাসের একপ্রান্তে ফ্ল্যাট হইয়া একটা তাকিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া আছে এবং বিলাস ফরাসে বসিয়া খাটের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া গানের তালে তালে মাথা নাড়িতেছে।

গোড়ার দিকে এক একটি হৈ হৈ ও চিৎকার চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা যে কখন আপনা হইতেই থামিয়া গেছে তাহা কেহই টের পায় নাই।

বাহিরে তখনও বৃষ্টি একেবারে থামিয়া যায় নাই। অশোক রুদ্ধ কাচের জানালা দিয়া রাস্তার স্বল্পালোকে ঝাপসা বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত

কোন কথা সে কহে নাই। প্রতিদিনের মত কুন্দকে একটা সম্ভাষণও জানাইতে কোথায় যেন তাহার বাধিতেছিল। গানের মধ্যখানে একটা লাইন হারাইয়া গেলে গায়ক যেমন অস্বস্তি বোধ করে, তেমনি কিসের একটা অস্বস্তি যেন তাহার বুকের মধ্যে ছটফট করিতেছিল।

কুন্দ গান থামাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, শোন।

অশোক নির্বিকারভাবে বাহিরে আসিয়া রেলিঙে ঠেস দিয়া কুন্দের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কুন্দের মুখখানি সুন্দর এবং অশোকেরও নেশার বেশ আমেজ আছে।

কুন্দ একটা কড়া কথা বলিতেই আসিয়াছিল। অশোকের হাতখানা দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার পানে চাহিয়াই মুখ নামাইয়া ফেলিল। দূরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া যেন অর্ধস্বগত বলিল, আমি যে সুন্দর সে বুঝেছি তোমাকে পাওয়ার পর।

প্রথমটা অশোক চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই অকস্মাৎ রূঢ় ভাবে বলিল, থাক। কি তোমার কথা, তাই বল।

এই রূঢ়তায় কুন্দ তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি চারদিন এখানে আসনি।

অশোক বলিল, না।

কুন্দ বলিল, শোভনার অসুখ কি খুব বেশি?

— খুব নয়।

কুন্দ আবার বলিল,— তুমি এখুনি যাবে?

অশোক হাত ঘড়িটা দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ। দশটা বাজে।

কুন্দ তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই যাও।

তার পরে একটু হাসিয়া ঘরের ভিতর আঙুল দেখাইয়া বলিল, কিন্তু ওদের কি করবে?

অশোকও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তাই তো!

কুন্দ বলিল, এই অবস্থায় ওদের টানাটানি করতে পারবে?

সংশয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, অসম্ভব।

কুন্দ বলিল, তাহলে!

ঈষৎ হাসিয়া অশোক বলিল, থাক না এইখানেই।

কুন্দ সভয়ে পিছাইয়া গিয়া বলিল, বাপ্‌রে!

অশোক তাহার একখানি হাত ধরিয়া সুমুখের দিকে টানিয়া বলিল, একটা রাত্তির তো। পারবে না?

কুন্দ দ্বিধার ভঙ্গিতে কিন্তু নরম সুরে বলিল, তুমি থাকবে না, আমি একলা, সামলাতে পারব?

অশোক অসহিষ্ণুভাবে তাহার হাতখানায় ঝাঁকি দিয়া বলিল, কি ন্যাকামি কর কুন্দ,—এমন অবস্থায় লোক সামলান কি এই প্রথম?

কুন্দর মুখ সহসা ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া কুন্দ তীব্রভাবে বলিল,—প্রথম নয় তা জানি। কিন্তু এর আগে যারা রেখে গেছে, তারা মজুরি পুষিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার যে তাদের সোফারের মুরোদও নেই, এ কথা ভুলে যাও কেন?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া অশোক কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রশ্ন করিল, কত তোমার মজুরি?

কড়া কথা বলিয়া ফেলিয়াই কুন্দ নিজের মনেই অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। আব্দারের ভঙ্গিতে অশোকের আঙুলগুলা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে। রাগটুকু বেশ আছে।

স্থির হইল বিলাস ও অমল রাত্রিটা এখানেই কাটাইবে। অশোক বরং সকালে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে।

অশোক যখন বাড়ি পৌছিল তখন রাত প্রায় এগারোটা।

পীড়িতা স্ত্রী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ঘুমাইতেছে, এবং বৃদ্ধা মাতা শয্যার শিয়রের দিকে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন।

অশোকের পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। অশোককে শব্দ করিতে নিষেধ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, ঘুমোচ্ছে।

সেই রূপই মনে হইল। কিন্তু আহারাদি সারিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার বন্ধকরিয়া অশোক নিদ্রিতার দিকে সুমুখ ফিরিতেই শোভনা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল।

অশোক বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি, ঘুমোওনি তুমি?

শোভনা ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া অশোক বলিল, রাত যে বারোটা বাজে।

—বাজুক বারোটা।—আব্দারের সুরে শোভনা বলিল,—বাবা! তিনদিন ধরে ঘুমোচ্ছি, আর কত ঘুমোতে পারে মানুষ!

অশোক হাসিল। বলিল, ডাক্তার কি বলে গেছে শুনেছ ?

বিরক্ত হইয়া শোভনা বলিল, শুনেছি। বলে গেছে সাগু আর বার্লি আর কুইনিন খেতে, আর দিন রাত্তির ঘুমুতে। ডাক্তারের কি ? তাকে তো আর তিন দিন ধরে বিছানায় পড়ে থাকতে হচ্ছে না !

অশোক মুগ্ধনেত্রে রুগ্না স্ত্রীর বিবর্ণ, ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়াছিল। সে দৃষ্টি-পাতে সলজ্জভাবে মুখ নামাইয়া শোভনা পূর্বকথার অনুবৃত্তি করিয়া বলিল, নিজের কথা মনে কর তো ?

—কি করি আমি ?

—হয়েছে ! কি কর ? সেবারে গান গেয়ে, হেসে, কেঁদে, চিৎকার করে সাত-দিন পাড়ার লোককে তিষ্ঠুতে দাওনি। মনে নেই সেকথা ?

অশোক হাসিতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিবাহের মিছিলের বাজনা শোনা গেল। উস্‌খুস্ করিতে করিতে শোভনা বলিল, এই দিক দিয়েই আসবে বোধ হয়।

অশোক হাসিয়া বলিল, বোধ হয়। কিন্তু তুমি উঠ না।

মিনতির সঙ্গে শোভনা বলিল, একটুক্ষণ তো। তুমি বরং আমায় ধরে থাকবে।

এ মিনতি অশোক উপেক্ষা করিতে পারিল না।

দুজনে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখ দিয়া আলোয় ও বাজ-নায় রাজপথ সচকিত করিয়া মিছিল চলিয়া গেল।

বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। অল্প স্বল্প মেঘ স্থানে স্থানে আটকাইয়া আছে।

অশোক বলিল, চল।

এইটুকু দাঁড়াইয়া দেখিতেই শোভনা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। শ্রান্তিভরে অশোকের বাহু আশ্রয় করিয়া শোভনা ভিতরে আসিল।

অশোক মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলিল, দেখ তো কি দুর্বল হয়েছ ? বললাম তখন

সে শোভনার মাথার বালিশ ঠিক করিয়া তাহাকে শোওয়াইয়া দিল। শোভনা এবার বাধা দিল না। শুধু অশোকের একখানা হাত মুঠার মধ্যে লইয়া বুকের উপর রাখিল এবং অসীম শ্রান্তিভরে চোখ মুদ্রিত করিল। একবার যেন অশোককে বলিতেও চাহিল, তুমিও শোও। কিন্তু পারিল না।

স্বামীর গল্প শোনা শোভনার একটা রোগ। বোধ হয় এ তার বয়সের দোষ।

দুপুর বেলায় একবার করিয়া ভবসুন্দরীর আসা চাই-ই। গল্প

হয় তারই সঙ্গে। ভব একাধারে সখী ও সচিব! বয়স তাহার পঁয়ত্রিশের প্রায় কাছাকাছি। বছর তিনেক পূর্বে গুটি তিনেক ছেলে-মেয়ে লইয়া বিধবা হইয়াছে।

ভব বলে, তুই অমন করে অশোকের পেছনে-পেছনে দিন রাত্তির ঘুরিস কেন বল তো?

শোভনা হাসে! বলে, কেন তোমার কি হিংসা হয় নাকি?

ভব বলে, বুড়ির কথা এখন মিষ্টি লাগছে না। এর পরে দেখবি।

শোভনা ভবর কথার ভঙ্গিতে ভয় পায়। মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া যায়। ভবর পাশে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, কি দেখব? বল না ঠান্‌দি।

ভীরু মেয়ের গাল দুটা টিপিয়া দিয়া ভব বলে, অমন বরের ন্যাওটা হোসনে. বরের আদর কমে যায় তাহলে। বুঝলি?

অতঃপর ভব স্বামীর ভালবাসা আদায় করিবার যাবতীয় কৌশল তাহাকে শিখাইয়া দেয়।

এমন সময় হয়ত অশোক অফিস হইতে ফিরিয়া আসে। তাহার জুতার শব্দ কানে পৌছিতেই শোভনা দেয় ছুট। এক নিমেষে সকল কৌশল ভুলিয়া যায়। ভব হাসিতে হাসিতে মেঝেয় আঁচল পাতিয়া আবার শুইয়া পড়ে। ও ঘরে অশোক বলে, বেশ তো বসে গল্প হচ্ছিল। আবার ছুটতে ছুটতে এ ঘরে আসা কেন?

শোভনা একখানা চেয়ার টানিয়া তাহার উপর বসিয়া বলে, বেশ করেছি।

ভবর দুপুর বেলাটা শোভনাকে লইয়া কাটে। অসুখের ক'দিন রোগিণীর চেয়ে তাহারই হইয়াছিল মুস্কিল। রোগীর পাশে বসিয়া থাকা সে সহ্য করিতে পারে না।

দুদিন হইতে জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়াছে। শোভনা বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল।

ভব পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বলিল, আজ আর জ্বর হয় নি তো?

শোভনা রাগিয়া বলিল, হয়েছে, সান্নিপাতিক বিকার—

সকাল হইতে দশজন লোক না হ'ক দশবার তাহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছে।

ভব সস্নেহে তাহার কপাল স্পর্শ করিয়া বলিল, না, জ্বর আর নেই। বলিয়া একটা পাশ বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল এবং কটাক্ষে হাসিয়া বলিল, আঃ! তোর

ঘরের বিছানায় শুলাম ভাই। হিংসে করিসনে যেন।

এক মুহূর্তে শোভনার মনের সমস্ত উত্তাপ গলিয়া জল হইয়া গেল। ছোট মেয়ের মত খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল, কিন্তু এখন তুমি মিথ্যে শুলে ভাই ঠান্‌দি। বরং রাত্তির বেলায় এসো।

ভব বলিল, তা যেন এলাম। কিন্তু তুই কি করবি ? চামর ঢুলোবি ?

ভব তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। শোভনা তাহার কানে কানে বলিল, সত্যি ভাই ঠান্‌দি, ভারি হিংসে করে।

ভব গম্ভীর ভাবে তাহার কপালের কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, ভয় নেই, আমি তো আর সত্যিই আসছি না।

শোভনা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিল, আহা, তোমার কথাই যেন বলছি আমি। বেশ তো, এস না।

ভব ক্ষীণ ম্লান হাসিয়া বলিল, না ভাই, আর এসে কাজ নেই। একজন যা জ্বালিয়ে গেছে তাতে মনে মনে এই কামনা করি যেন আস্‌ছে বারে, নারী-জন্মও যদি হয়, বিয়ে যেন না হয়।

শোভনা চকিতে তাহার বুক ছাড়িয়া উঠিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। পরে রূঢ়ভাবে বলিল, ঠাকুর্দা যাওয়াতে তুমি তাহলে সুখী হয়েছ বোধ হয়।

ভব যেমন দূরের দিকে চাহিয়া ছিল তেমনি রহিল। যেন অর্ধস্বগত ভাবে উত্তর দিল, সুখ দুঃখের কথা তো নয় বোন, এ আমার নিজের মনের কথা। কিন্তু এ কথা যেন তোকে না বুঝতে হয় !

ইহার পর সেদিন আর গল্প জমিল না। দুটি প্রাণী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। বিকালের দিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভব উঠিয়া গেল।

চিরপ্রথা মত আজ আর বিদায় জানাইতেও শোভনার ইচ্ছা হইল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অশোক আফিস হইতে ফিরিবামাত্র শোভনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ঠান্‌দিন বর কি ঠান্‌দির ওপর খুব অত্যাচার করতেন ?

অশোক কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, অত্যন্ত।

অশোকের ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া শোভনা বলিল, যাও, ঠাট্টা ভালো লাগে না। সত্যি বল না ?

অশোক বলিল, সত্যিই তো বললাম।

জামাটা আলনার পরে রাখিয়া অশোক বলিল, কেন, ঠান্‌দির পিঠের মারের দাগ এখনও মেলায় নি। দেখনি ?

শোভনা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, আহা, সেই কথাই যেন আমি বলছি। ভদ্রলোক বুঝি আবার বৌকে মারে ?

অশোক টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মারে না ? শুধু কান মলে দেয় বুঝি ?

শোভনা গম্ভীরভাবে বলিল, না, সত্যি, ঠাট্টার কথা নয়। ঠান্‌দি আজকে দুঃখ করছিল। ঠান্‌দির বর নাকি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি।

শোভনা যখন গম্ভীর হয় তখন আর অশোক হাসি চাপিতে পারে না। তবু পাছে শোভনা চটিয়া যায়, এই ভয়ে গম্ভীর হইয়াই বলিল, ঠাকুর্দার স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল ছিল না।

শোভনা উত্তেজিতভাবে খাট ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সত্যি ভাল ছিল না ? সত্যি ?

অশোক একটু বিব্রতভাবে বলিল, তাই তো সবাই বলে।

শোভনা বলিল, আমি হলে কথনো এ সইতাম না, কক্ষনো না। কি আশ্চর্য !

অশোক হাসিয়া বলিল, কি করতে ?

—আমি তাহলে,—বলিয়া শোভনা বিব্রতভাবে থামিয়া পড়িল। কি যে করিত তাহা আর ঠিক করিতে পারিল না। শুধু পক্ষীশাবক যেমন ভয় পাইয়া জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি করিয়া এই ভীরু বালিকা স্বামীর একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিল এবং অসহায় ভাবে বলিল, তুমি তো তেমন নও।

মমতায় অশোকের মন ভরিয়া উঠিল। তবু প্রশ্ন করিল, কেমন করে জানলে ?

এবার গরবিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া শোভনা বলিল, সেটুকু বুঝতে পারি, মশাই। তোমাদের স্পর্শ থেকে বুঝতে পারি খাঁটি কি মেকি।

অকস্মাৎ অশোকের মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধিল। ঠোঁটে শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিল, তবে আর কি ? এইবার চা নিয়ে এস।

ওমা, তাই তো !—বলিয়া অপ্রস্তুতভাবে শোভনা তাড়াতাড়ি চা আনিতে নিচে ছুটিল।

চা আনিয়া বলিল, তুমি এক্ষুনি বেরুবে ?

অশোক বিস্মিতভাবে বলিল, কেন বল তো ?

শোভনা কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু নতমুখে কাপড়ের একটা প্রান্ত আঙুলে জড়াইতে লাগিল।

অশোক হাসিয়া বলিল, আজকে আর কোথাও বার হব না।

আনন্দে শোভনার মনে হইল সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে।

কিন্তু অশোকের বাহিরে যাওয়ার বিশেষ দরকারই ছিল।

কয়দিন ধরিয়াই কুন্দর বাড়ি যাওয়া হয় নাই। কাল কুন্দ একখানা কড়া চিঠি লিখিয়াছে। আজ অফিস ফেরং সটান ওখানে না গেলে আত্মহত্যা করিবার ভয়ও দেখাইয়াছে।

অফিস ফেরৎ আর যায় নাই। ভাবিয়াছিল শোভনা কেমন থাকে দেখিয়া সন্ধ্যার দিকেই যাইবে

তারপর এই বাধা।

কুন্দ লিখিয়াছে, যে দিন অশোকের কেহ ছিল না, সেদিন ছিল কুন্দ। সেদিন আফিসের ছুটি হওয়া পর্যন্ত অশোকের তর সহিত না। আর আজ সপ্তাহে এক দিন করিয়া এক ঘণ্টার জন্য দর্শন দিবারও অবকাশ পাইতেছে না! এ সমস্তই তাহার অদৃষ্ট।

তারপরে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী অতীত দিনের বিবিধ সুখ-দুঃখের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেঃ পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে লাভ নেই। তবু লোভ হয়, তাই লিখলাম। তোমায় শুধু একটি প্রশ্ন করি, জয় করেছ বলেই কি আমার ওপর অত্যাচার করবার অধিকারও জন্মেছে? কিন্তু কাল আমার জন্মতিথি। শুধু দু'মিনিটের জন্য একবার এস। তাতে সম্ভবত তোমার চরিত্র নষ্ট হবার ভয় নেই।

চিঠিতে খোঁচা ছিল যথেষ্টই। অশোকের যাওয়ার ইচ্ছাও কম ছিল না। তবু এই একান্ত নির্ভরশীলাকে 'না' বলিতে বাধিল।

এমন সময় বিলাস ও অমল বাইরের দরজায় হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

অশোক বলিল, একটু বোস, লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষুণি আসছি।

নিচে আসিয়া অশোক বিরক্তভাবেই বলিল, কি?

অমল বলিল, কি বাবা, সাপের পাঁচ-পা দেখেছ না কি?

বিলাস তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আঃ। তুই থাম না অমল, আমি বলছি।

অমলের বুদ্ধি এবং দৃষ্টি দুইটাই স্থূল। সে চিৎকার করিয়া বলিল, তুই আবার বলবি কি? বলাবলির আছেই বা কি? বাবা অশোকচন্দ্র, তুমি জামাটি গায়ে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মত আমাদের সঙ্গে চল। কুন্দরাণীর হুকুম। জীবিত কি মৃত তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া চাই।

অশোক দৃঢ়ভাবে বলিল, আজকে যাওয়া হতে পারে না। তাকে বোলো কালকে বরং

অমল চিৎকার করিয়া বলিল, বরং-টরং বুঝি না, আজকেই যেতে হবে।

অশোক ধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বিলাস গম্ভীর ভাবে বলিল, না যেতে চাও নাই গেলে। তোমায় জোর করে ধরে নিয়ে যেতে আমরাও চাইনে। শুধু একটা কথা বলে যাই, কুন্দ শুধু তোমারই প্রতীক্ষায় এতক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত বসে রয়েছে। এর পরেও যদি তোমার মনে হয়, তোমার যাওয়া সঙ্গত নয়, যেওনা তুমি।

অশোক দ্বিধাভরে একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

অমল পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিল, তুমি যাবে কিনা শুনতে চাই।

অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিল, চ্যাঁচাস নে।—বলিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইসারায় জানাইয়া দিল উপরে তাহার স্ত্রী শুনিতে পাইবে।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, পেলই বা শুনতে। আমার স্ত্রী তো সব জানে। আমি নিজেই সব কথা বলেছি।

অশোক বিরক্ত ভাবে বলিল, অতি উত্তম করেছ।

বিলাস বলিল, তাহলে আমরা ফিরে যাব ?

অশোক অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। শোভনার ভীরু সুকুমার মুখখানি কেবলই তাহার মনের সামনে ভাসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, আজ কোনমতেই যেতে পারব না, কালকে যাব নিশ্চয়।

অমল ও বিলাস চলিয়া গেল। কিন্তু অশোক আর শোভনার ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। পাশের পড়ার ঘরে গিয়া সামনেই যে বইখানি পাইল তাহাই খুলিয়া একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কথা সমস্তই শোভনার কানে গেল। অমলের অট্টহাস্য ও চিৎকার, বিলাসের কটু গাম্ভীর্য এবং অশোকের ভীত ত্রস্ত ভাব সমস্তটা মিলিয়া ব্যাপারটাকে এমন সহজ সরল ও বীভৎস করিয়া তুলিল যে শোভনা কাঠ হইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘটনাটি অত্যন্তই আকস্মিক।

তাহার অতীত মিথ্যা হইয়া গেছে, বর্তমান ভূয়া হইয়া গেল, ভবিষ্যৎ স্বপ্নসৌধ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল। সমস্ত দিন কাঁদিয়া এই কথাটাই বার বার মনে করিতে লাগিল।

অশোক আসে-যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। শোভনা সমস্ত দিন লুকাইয়া লুকাইয়া ফেরে। তাহার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হইয়া গেছে, এই লজ্জাতেই সে যেন কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছিল না। অশোককেও না। বস্তুত কাল রাত্রে সে অশোক আসিবার পূর্বেই এমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, অশোক ঠেলাঠেলি,

হাঁকাহাঁকি করিয়াও কোনো মতে তাহার নিদ্রা ভাঙাইতে পারে নাই।

দুপুর বেলায় ঠান্‌দি আসিয়া একলাই খানিকটা দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া গেছে।

অপরাহ্ণের দিকে শোভনা অকস্মাৎ যেন কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া শয়নকক্ষে অশোকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশোক বলিল, কিগো, ঘুম ভাঙল? শোভনা হাসিয়া বলিল, ঘুমোইনি তো?

অশোক তার গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিল, দুপুরের কথা হচ্ছে না গো, আমি কা'ল রাত্রের কথা বলছি।

শোভনা নিজেকে মুক্ত করিতে করিতে বলিল, কি জানি, ভারি ঘুম পেয়েছিল।

অশোক উদ্বেগের সঙ্গে বলিল, শরীর খারাপ করে নি তো?

এ কথার আর শোভনা কোনো উত্তর দিল না। বলিল, একটু বোসো, তোমার চা আনি।

চা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শোভনা প্রশ্ন করিল, তুমি কি এখনই বেরুবে?

অশোক একটুকু ইতস্তত করিয়া বলিল, বেরুতে হবে একবার। একটু দরকার আছে।

বুঝি তাহার একটু ভয়ও হইল পাছে আজও শোভনা আব্দার করিয়া বসে। তাই কৈফিয়তের সুরেই বলিল, শিগ্‌গির ফিরে আসব'খন। দেরি বেশি হবে না।

অশোক বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শোভনা বলিল, ওকি, তুমি অমনি পোষাকে বাইরে যাবে নাকি?

অশোক হাসিয়া বলিল, তার মানে?

সমস্ত দিন ধরিয়া শোভনা বসিয়া বসিয়া তাহার কাপড় কোঁচাইয়াছে, একটা আদ্দির পাঞ্জাবী গিলা করিয়াছে এবং ভালো একটা জুতায় নিজেই কালি লাগাইয়া বার্ণিশ করিয়াছে। সেগুলি বাহির করিয়া সে অশোককে সাজাইতে বসিল। গলায় একটা জরিপাড় উড়ানি জড়াইয়া দিল, রুমালে এসেন্স মাখাইয়া দিল এবং জুতা পরাইয়া দিয়া অঞ্চল দিয়া আর তাহা একবার পরিষ্কার করিয়া দিল।

মাঝে মাঝে শোভনার এমনি এক একটা সখ চাপে। বারণ করিয়া থামান যায় না। সমস্ত শেষ হইলে অশোক তাহার মাথায় একটা হাত রাখিয়া নাটকের ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করিল, চিরায়ুষ্মতী ভব। কিন্তু এ অভিনয়ের মানে তো বুঝলাম না।

ম্লান হাসিয়া শোভনা বলিল, অভিনয় নয়।

কথার মধ্যে বোধ করি একটু বিষাদের সুর ছিল। অশোকের মনে পড়িল, বিবাহের পর প্রথম প্রথম শোভনা এমনি করিয়া প্রতিদিন তাহাকে সাজাইয়া সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে পাঠাইত। তখন সে কিশোরী। তার পর দীর্ঘ কয় বৎসরে এ ব্যবস্থা কেমন করিয়া লোপ পাইয়া গেল।

তার পরে আবার এই বুঝি আরম্ভ হইল।

সমস্তক্ষণ শোভনা মুখ নামাইয়া ছিল, একবারও তোলে নাই। এতক্ষণ পরে বলিল, তুমি তো খাওয়া দাওয়া করেই আসবে?

অশোক বলিল, তার মানে?

—তার মানে কালকে তোমার বন্ধুরা বলছিল কার নাকি জন্মতিথি।

অশোক যেন অকস্মাৎ চাবুক খাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিল। এবং আত্মরক্ষার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া কুকুর যেমন পলায়নের উপায় না পাইয়া মরিয়া হইয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করে, তেমনি ভাবে বলিল, বেশ তো, তার হয়েছে কি?

শোভনা কঠিন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

অশোক আবার বলিল, সেখানে গেলেই কিছু চরিত্র নষ্ট হয় না।

এ কথায় শোভনার হাসি পাইল। সে বলিল, এতদিন ধরে তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে এসেছ। আজ একটি সত্যি কথা বলবে? তোমার কি সত্যিই আমায় ভালো লাগে না?

উত্তরে অশোকের বলিবার অনেক ছিল। কিন্তু নিজের অপ্রস্তুত অবস্থায় সে ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাই রূঢ়ভাবেই বলিল, না।

—কেন ভাল লাগে না? আমি কি একেবারে পুরোন হয়ে গেছি?

এ সম্বন্ধেও প্রকৃতপক্ষে অশোক কোনো কথাই ভাবে নাই। কিন্তু সম্প্রতি সে একটা গল্প পড়িয়াছিল এবং তাহারই যতটুকু স্মরণ ছিল তাহাই আবৃত্তি করিয়া বলিল, আমি যা চাই, তার সব তোমার মধ্যে নেই। সমস্ত অন্তর দিয়ে যে তিলোত্তমা আমার কামনার বস্তু, তাকে পেতে হলে সহস্র নারীর শ্রেষ্ঠতম অংশ তিল তিল করে আমায় সংগ্রহ করতে হবে। এতে তোমার কি ক্ষতি? তোমায় তো আমি কখন অনাদর করিনি।

শোভনা স্বীকার করিল, তা কর নি।

জোর পাইয়া অশোক বলিল, তবে?

কঠিন মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া শোভনা বলিল, আজকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে তোমায় অভিসারে পাঠাচ্ছি। কিন্তু তিলোত্তমের লোভ আমারও তো থাকতে পারে। তার জন্যে আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে

অভিসারে পাঠাতে পার তুমি ?

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে বিহ্বলের মতো অশোক বলিল, তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে ?

—হ্যাঁ ? মনে কর আজকে একই মোটরে আমরা অভিসারে বার হব। তুমি যাবে তোমার কুঞ্জে, আর আমি আমার কুঞ্জে।

—একই মোটরে ?

—ক্ষতি কি ?

অশোক তীব্র দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষত

শঙ্কর ঘোষের বৈঠকখানায় জমাটি আড্ডা বসেছে। শঙ্কর অবশ্য জমিদার মানুষ, বড়লোক। তাকে চাকরি করতে হয় না। কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধব বলতে যারা, তাদের সবাই চাকুরে। তাদের কেউ ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। সকাল নটায় খেয়ে বেরোয় আর প্রায় রাত্রি আটটায় ফেরে। আবার কেউ বা কলকাতাতেই মেসে থাকে। শনিবার বিকালে বাড়ি আসে। রবিবারটা থেকে সোমবার সকালের ট্রেন ধরে অফিস করে।

সুতরাং রবিবারের সকাল এবং সন্ধ্যাতেই আড্ডাটা জমে বেশি। শনিবার সন্ধ্যা এবং রবিবার দুপুরটাও একেবারে নিরামিষ যায় না। কেউ না কেউ আসেই। প্রকাণ্ড হল-ঘরে লম্বা ফরাস পাতা। কোথাও তাস, কোথাও পাশা, কোথাও দাবা চলছেই। রাত এগারোটা, বারোটা, একটা পর্যন্ত। তার সঙ্গে চলেছে চা, পান, তামাক। এই সব যোগাতে রঘু চাকর হিমসিম খেয়ে যায়।

শঙ্করের যে তাস-পাশার বাতিক খুব বেশি তা নয়। লোকজন না থাকলে সেও অবশ্য খেলায় বসে। তারপরে কেউ এলেই তার হাতে খেলা দিয়ে একপাশে বসে। তার সঙ্গী মনোমোহন। মনোমোহনকে যুদ্ধ-বিশারদ বলা যেতে পারে। অতি নিরীহ এবং শীর্ণ চেহারা। কলকাতার অফিসে এবং পল্লীর গৃহের বাইরে তার গতিবিধি নেই। কিন্তু ব্রেস্ট-লিটভস্কে কি যুদ্ধ চলেছে, জার্মান কামানের ওজন কত, কাইটেলের যুদ্ধের নতুন টেকনিকটা কি, এই সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব তার নখদর্পণে। তার উপর তার গল্প বলবার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে, চোখেব তারা কখনও উপরে কখনও নিচে নামিয়ে, সে যখন যুদ্ধের বর্ণনা করে, তখন গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। মনে হয়, সঞ্জয়ের মত সে যেন দিব্যচক্ষে সমস্ত নিরীক্ষণ করছে আর তারই হুবহু বর্ণনা করছে!

কিন্তু যুদ্ধের সম্বন্ধেই যে শঙ্করের খুব আগ্রহ আছে তা নয়। তবু সেদিনের সান্ধ্যসংস্করণ খবরের কাগজখানা বগলে নিয়ে মনোমোহন যখন ঘরে ঢোকে, শঙ্কর তাকে সাদরে নিজের পাশে ডেকে নেয়: কি খবর বল মনোমোহন।

ব্যাস। এর বেশি আর শঙ্করকে কিছু বলতে হয় না। দম দেওয়া গ্রামোফোনের

মতো মনোমোহন অনর্গল যুদ্ধের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কথা শুনিয়ে চলে। গলা শুকিয়ে গেলে কখনও চায়ে, কখনও তাম্বুলরসে সিক্ত করে নেয়। তার আশ্চর্য গবেষণার কথা শঙ্কর কিছু শোনে, কিছু বা না। অন্যমনস্ক হলে মনোমোহনের কাঠির মত শক্ত আঙুলের ঠেলা খেয়ে মনোযোগের সঙ্গে শোনবার ভাণ করে মাত্র।

আসলে কিছুরই সম্বন্ধে শঙ্করের উৎসাহ, আগ্রহ বা আকর্ষণ নেই। তারা এই গ্রামের বহুপুরুষের জমিদার। জমিদারি চালের অঙ্গ হিসাবে যেমন দেউড়িতে দারোয়ান আছে, সদরে নায়েব-গোমস্তা-দারোয়ান আছে, আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পূজার দালানে বিগ্রহ আছেন, বারো মাসে তেরো পার্বন আছে, তেমনি বালাখানার এই আস্তানাটিও আছে। শঙ্কর থাকুক বা না থাকুক তাতে আড্ডার কোন অসুবিধা হয় না। চা-পান-তামাক অব্যাহত ভাবেই আসে। এও সেই পুরুষানুক্রমিক জমিদারির শৃঙ্খলা। যে শৃঙ্খলা কলের মধ্যে আছে সেই শৃঙ্খলা। তার মধ্যে খুঁত নেই। প্রাণও নেই। যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট ভাবে হয়ে যায়।

কিন্তু সমস্ত কিছুর সম্বন্ধে এই নিস্পৃহতার জন্যে শুধু যে তার জমিদারি নীলরক্তই দায়ী তা নয়। শঙ্করের বয়স পঁয়তাল্লিস অতিক্রম করেছে। সন্তানাদি হয়নি, আর হবার আশাও নেই। এই অট্টালিকা দাসদাসী পরিজন, জমিদারি, সমস্ত দেখতে দেখতে তার কাছে ফিকে হয়ে এসেছে। তারপর যদি বা কর্মশক্তি থাকত, দুর্দান্ত গৃহিণী তাও নিয়েছে হরণ করে।

সুকুমারী সত্যই দুর্দান্ত গৃহিণী এবং সুকুমারীই তার সংসারের কেন্দ্র। তারই আকর্ষণে প্রভু থেকে ভৃত্য পর্যন্ত সবাই ঘুরছে। কে কি খাবে, কে কি পরবে, কে কোথায় শোবে—সমস্তই স্থির করার ভার সুকুমারীর। সে যা স্থির করে দেবে তাই হবে। সুকুমারীর সন্তান নেই। তার তাড়নায় এই পরিবারের বুড়ো থেকে ছেলে পর্যন্ত সবাই খোকাতে পরিণত হয়েছে।

যে রবিবারের কথা বলছি, সেদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে অবিরত ধারায়। দেখতে দেখতে পথ বেয়ে হু হু করে জলস্রোত বইতে লাগল। আকাশে কালো মেঘে যেন মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে। আকাশ একেবারে মেঘে-মেঘে ঠাসা—কোথাও এতটুকু ছিদ্র নেই। বজ্রের গর্জনে, বৃষ্টির নর্তনে, বিদ্যুতের হাস্যে পৃথিবীর রূপ একেবারে বদলে গেল।

যারা পাশা খেলছিল তারা হয়ত বৃষ্টির কথা জানতেই পারলে না।

তাদের মুহুর্মুহু চিৎকারে বজ্রের গর্জনও ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু তাসের দল বাহিরের দিকে চেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল : তাই তো হে! বৃষ্টি সহজে ছাড়বে বলে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর হেসে বললে, নাই ছাড়ল। জলে তো পড়নি।

—যা বলেছ! খিচুড়ি লাগাও দাদা!

মনোমোহন সেই স্তিমিত আলোয় খবরের কাগজখানা চোখের পুরু চশমার একান্ত সন্নিকটে এনে বোধ করি জার্মানদের ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছিল। খিচুড়ির নামে সেও সোজা হয়ে বসল।

বললে, ঘাবড়াও মৎ ব্রাদার! অন্নপূর্ণার আশ্রমে যখন এসে পড়েছি, তখন উপোসে কাটবে না। লুচি হোক, পোলাও হোক, খিচুড়ি হোক, একটা কিছু হবেই। এমন বর্ষা মিথ্যে যাবে না।

মিথ্যে যায় না কোনদিনই। আজও গেল না।

শঙ্কর ভিতরে খবর পাঠাবার পূর্বেই রঘু চাকর এসে সুসংবাদ দিয়ে গেল : বাবুমশায়রা, কেউ যাবেন না। খিচুড়ি হচ্ছেন।

ক্রমাগত ভদ্র-সহবাসের ফলে রঘুর কথাবার্তায় ভদ্রতার পরিমান একটু বেশি হয়েছে!

উপস্থিত খেলোয়াড়বৃন্দ এই সংবাদে চিৎকার করে বাইরের দুর্যোগকে পর্যন্ত চমকে দিলে। সবাই বললে, এ আমরা আগেই জানতাম। অন্নপূর্ণার মন্দিরে এসে···ইত্যাদি।

তারা অত্যুক্তি করেনি। মাঝে মাঝে লোকজনকে খাওয়ান সুকুমারীর একটা রোগ বললেই হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, অন্ধ-আতুর, একজন দুজন প্রত্যহই আছে। আর স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের তো কথাই নেই। কখনও শীতের জন্যে, কখনও শীত না থাকার জন্যে। কখনও বর্ষার জন্যে, কখনও বর্ষা নেই বলে। তাদের জন্য একটা না একটা কিছু মাঝে মাঝে হচ্ছেই। ওরা যখন অন্নপূর্ণা বলে ডাকে, সুকুমারীর বড় ভালো লাগে। খেতে বসে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওরা যখন স্তুতি করে, আড়াল থেকে তাই শুনে ও খুব আনন্দ পায়।

বন্ধুদের উদ্দেশে ভুরিভোজনের সংবাদ জানিয়ে রঘু শঙ্করকে বললে, আপনাকে মা ওপরে ডাকছেন।

শোনামাত্র বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল।

বললে, কেন?

—তা জানি নে।

বন্ধুমহলে বসে থাকলে সুকুমারী যখন এমনি করে হুকুম পাঠায়, শঙ্কর তখন বড় লজ্জা বোধ করে। লজ্জায় সে বন্ধুদের মুখের দিকে চাইতে পারে না। তার মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সকলের ঠোঁট হাসিতে বঙ্কিম হয়ে উঠেছে, সকলের চোখে চোখে একটা কৌতুকের ইঙ্গিত খেলে যাচ্ছে।

শঙ্করের জীবনে এইটেই আশ্চর্য! ছ'ফুট দীর্ঘ তার দেহ। ধবধবে রঙ, কটা চোখ, মাথায় বড় বড় কোঁকড়া চুল, গালের আধখানা পর্যন্ত জুলফি, মোম দিয়ে মাজা গোঁফ। এ অঞ্চলে এত বড় শিকারি, আর এত বড় ঘোড়সোয়ার নেই। কর্মচারী এবং প্রজারা তার সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করে না। তার মোটা ভারি কণ্ঠের আহ্বানে সব তটস্থ হয়। আশ্চর্য এই যে, এত বড় রাশভারি এবং শক্তিমান্ লোক হলেও শঙ্কর সুকুমারীর কাছে একেবারে কেঁচো। অথচ সুকুমারীর চেহারা মোটেই জাঁদরেল গোছের নয়। সে নিতান্তই ছিপছিপে, বেঁটে একটি মেয়ে। তবু তারই ভয়ে শঙ্কর সব সময় সন্ত্রস্ত!

সুকুমারীর সামনে এসে দাঁড়ালেই শঙ্করের তেজ, দর্প এবং শক্তি কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়। তার সামনে অপরাধীর মতো সে যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সুকুমারীকে সে যে নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি মাতৃত্ব দিতে পারেনি, এইতেই সব সময় সে সন্ত্রস্ত এবং মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সাপের মত নিস্তেজ হয়ে থাকে, কিছুতেই মাথা তুলতে পারে না।

চাকরের মুখে সুকুমারীর আহ্বান শুনে সে সকলের দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে দ্বিধা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে তার লজ্জা করছিল।

মনোমোহন বললে, যাও না হে! তলব যখন এসেছে···ভয়টাই বা কি! মারবেন না তো!

শঙ্কর হাসতে হাসতে উঠে অন্দরে চলে গেল।

অন্দরে প্রবেশ করামাত্র সুকুমারী শঙ্করকে টানতে টানতে উপরে নিয়ে এল।

বললে, যত বুড়ো হচ্ছ, তত তোমার আক্কেল বাড়ছে না কমছে?

বিব্রত ভাবে শঙ্কর বললে, কি করলাম?

—কাল ভোর বেলায় ওই রকম করে কাশছিলে আর আজকেই ঠাণ্ডা লাগানোর খুব ধুম পড়ে গেছে, না?

—আমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই! ঘুমোও যখন জ্ঞান তো থাকে না! সে কী কাশি! আর এখন বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ওই পাংলা গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বেশ আড্ডা দিচ্ছিলে! লজ্জাও করে না!

শঙ্কর বুঝলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ভোরের বেলায় সে হয়তো কেশে থাকবে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই এমন কিছু নয়। সুকুমারীরও পরে আর এ নিয়ে খেয়াল ছিল না। এখন বৃষ্টি পড়তেই যখন খেয়াল হয়েছে তখন আর কোনমতেই নিষ্কৃতি নেই।

শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ঐ ফ্লানেলের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে হবে তো? দাও।

শঙ্কর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। সুকুমারী তার ললাটের উত্তাপটা পরীক্ষা করে নিজের হাতে তাকে ফ্লানেলের পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দিলে।

বললে, আর ঠাণ্ডায় নিচে যেতে হবে না। এইখানেই বসে থাক।

শঙ্কর আর্তকণ্ঠে বলে উঠল: বল কি? নিচে বন্ধুরা সব বসে রয়েছে যে!

—থাক গে বসে। ওদের জন্যে খিচুড়ি হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বৃষ্টি থামলে চলে যাবে এখন।

—ওরা নিচে রইল আর আমি এখানে বসে থাকব? সে কি হয়?

সুকুমারী অত্যন্ত চটে গেল।

বললে, বেশ হয়। তুমি আমাকে আর জ্বালিও না বলছি। যা বললাম তাই কর।

বলেই সে আর দাঁড়াল না। হন হন করে বোধ হয় রান্নার তদারক করতেই নিচে চলে গেল।

শঙ্করের আর একটা কথা কইতেও সাহস হল না। সে নিঃশব্দে টেবিলের উপর থেকে সুকুমারীর অর্ধপঠিত একখানা উপন্যাস টেনে নিয়ে আপন মনে পাতা ওলটাতে লাগল।

বাইরে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কাঁচের শার্শিগুলো বৃষ্টির ভয়ে বন্ধ আছে। তাতে বৃষ্টির ছাঁট পড়ছে ছিপ্ ছিপ্ শব্দ করে। শঙ্কর সেই রুদ্ধ গৃহকোণে ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে অসহায় ভাবে বসে বসে ঘামতে লাগল।

নিচে গিয়ে সুকুমারীর বোধ হয় দয়া হল। বালাখানা থেকে ওদের চিৎকার ও হাস্যকৌতুক অন্দরে এসে পৌছুচ্ছিল। উপরের শয়নঘরে শঙ্কর একা বসে। আহা বেচারা! কিন্তু সুকুমারী কি ইচ্ছা করে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? ভোরের দিকে কাশছিল যে! শরীর যে ওর মোটেই ভাল নয়! এতটুকু ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। এখনি হয়তো জ্বর হবে। ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় সে দিন তো ঘোষেদের অমন চাঁদের

মতো ছেলেটা মারাই গেল!

ঘোষেদের ছেলেটার কথা মনে হতেই সুকুমারী শিউরে উঠল। তখনই সওয়া পাঁচ আনা পয়সা মা সর্বরক্ষার নামে তুলে রেখে সুকুমারী উপরে এল।

শঙ্কর তখনও উপন্যাসখানির পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুকুমারী এসে হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে আর একবার ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করলে।

নাঃ, জ্বর নয়। মাঝে মাঝে এমন ভয় লাগে, মাগো! সুকুমারী মনে মনে আবার মা সর্বরক্ষাকে প্রণাম করলে। কালই ভোগটা পাঠিয়ে দিতে হবে।

আশ্বস্ত হয়ে সে স্বামীর পাশে এসে বসল।

—পড়ছিলে বইখানা? ভারি সুন্দর লিখেছে। পড়তে পড়তে কেঁদে আর বাঁচি না। নবদুর্গার শাশুড়ী, কি দজ্জাল মাগী বাবা! আচ্ছা, সত্যি অমনি হয়? এই যে লিখেছে,

সুকুমারী একবার অপাঙ্গে শঙ্করের দিকে চাইলে।

বললে, তোমার ভালো লাগছে না, না? নিচে অমন হৈ হৈ হচ্ছে, আর এখানে একা, বিরক্ত লাগছে, না?

শঙ্কর সাড়া দিলে না।

ওর মাথার চুলগুলো পরম স্নেহে ঠিক করে দিয়ে সুকুমারী বললে, আচ্ছা, যাও নিচে। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিও না। বেশিক্ষণ থেকোও না। বরং কম্ফর্টারটা বেঁধে নাও। কি বল?

সভয়ে শঙ্কর বললে, সর্বনাশ! এই গরমে ফ্লানেলের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়েই ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তার ওপর কম্ফর্টার! রক্ষা কর!

সুকুমারী আবার রেগে উঠল।

বললে, ওই তো তোমার দোষ! ঠাণ্ডা লাগিয়ে আমাকে খানিকটা কষ্ট দেবে এই তো তোমার মতলব? কিন্তু ভুগবে কে? তুমি না আমি?

হাসতে হাসতে শঙ্কর বললে, তুমি।

—তাই তো ভোগাচ্ছ! বিশ বচ্ছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে একটি দিনের জন্যেও তুমি যদি আমাকে শান্তি দিয়ে থাক! তোমাকে নিয়ে চিরটা কাল আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম!

সুকুমারীর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

বললে, কিন্তু কম্ফর্টারটা না জড়িয়ে নিলে আমি কিছুতে তোমাকে নিচে নামতে দোব না। তাতে তুমি রাগই কর, আর যাই কর।

শঙ্কর রাগ করে বললে, তাহলে থাক, আর নিচে যাব না।

সুকুমারীও রাগ করে বললে, সেই ভালো।

সে রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে শঙ্করের আর দেখাই হল না। বন্ধুরা খেলার শেষে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কলরব করতে করতে খেয়ে গেল। শঙ্কর নিচে নেমেই এল না। তার খাবার উপরে এল।

বন্ধুদের মধ্যে একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাবু কোথায় হে চক্রবর্তী?

চক্রবর্তী উত্তর দেবার পূর্বেই মনোমোহন বললে, বাবু কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে। খিচুড়িটা কেমন খাচ্ছ তাই বল।

—চমৎকার!

—বাস্‌। বাবু যেখানেই থাকুন. খিচুড়িটা চমৎকার হলেই হল।

ওরা শঙ্করের অনুপস্থিতির জন্যে আর অভিযোগ করলে না। তার জন্যে অপেক্ষাও করলে না। নিজেরা খেয়ে নিয়ে কেউ বা সেই বৃষ্টিতেই, কেউ বা বৃষ্টি থামলে বাড়ি চলে গেল।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল, শঙ্করের মাথাটা কেমন ভার বোধ হল। সেই সঙ্গে ঘাড়েও কেমন ব্যথা। ঘাড় ফেরাতে পারছে না।

কিন্তু সে কথা সুকুমারীকে জানাতে তার ভয় ভয় হল। এই নিয়ে সে এমন সমারোহ আরম্ভ করবে যে সে এক বিপদ। মাথা ভার হওয়ার জন্যে সে অবশ্য ভয় পায় না। মুখ-হাত ধুয়ে একটু গরম চা খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু ঘাড়ের যন্ত্রণাটা···যন্ত্রণার জন্যে নয়, সুকুমারীর কাছে লুকানো সম্ভব হবে কি না তাই ভেবেই সে চিন্তিত হয়ে উঠল।

চিন্তার কারণও আছে। আজকেই একটা গুরুতর ফৌজদারি মামলার তদারকের জন্যে তাকে সদরে যেতেই হবে। সদর দূরে নয়, মাইল দশেকের পথ। এই পথ সাধারণত সে ঘোড়াতেই যায়। ঘোড়ায় যাওয়াই সুবিধা। কিন্তু সেই যে ভোরবেলাকার ঘুমের ঘোরের কাশি, তারই জন্যে ঘোড়ায় যাওয়া বন্ধ হয়েছে। তাকে পাল্কিতে যেতে হবে।

পাল্কিই সই। শঙ্কর তার যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে চাকরকে হুকুম দিয়েছে।

রঘু পাল্কির ব্যবস্থা করে ফিরে এসে বললে, স্নান করতে মা নিষেধ করলেন। শুধু মাথাটা ধুয়ে ফেলুন। খাবার তৈরি হয়েছে।

শঙ্কর মাথাটা ধুয়ে খেতে বসল।

সুকুমারী পাশে বসে বাতাস করতে লাগল। ভদ্রলোক তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বোধ করি দুটি গ্রাস মুখে দিয়েছে, হঠাৎ সুকুমারী থমকে পাখার বাতাস বন্ধ করলে :

—তুমি অমন করছ কেন ? ঘাড়ে কি হয়েছে ? বেদনা নাকি ? দেখি দেখি ?

শঙ্করের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল।

শুষ্ককণ্ঠে বললে, কিছু হয় নি তো ?

সুকুমারী কপালে করাঘাত করলে, সে আঘাত যেন শঙ্করেরই গণ্ডদেশে এসে পড়ল।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, কিছু হয়নি বলে আমাকে ফাঁকি দেবে ? একটি চোখ আমি দিবারাত্রি তোমার অঙ্গে বুলোচ্ছি, দেখতে পাও না ? খুব জ্বালিয়েছ, ওঠ, আর খেতে হবে না।

বিব্রত ভাবে শঙ্কর বললে, শোয়ার দোষে ঘাড়ে অমন ব্যথা হয়। তাতে হয়েছে কি ?

—তাতে কি হয় না-হয় সে আমি বুঝব। তুমি ওঠ দেখি। ওরে, বাবুকে এইখানেই একটু হাত ধোবার জল দে।

—কী আশ্চর্য ব্যাপার, সদরে আমার কঠিন মামলা রয়েছে যে !

সুকুমারী রেগে উঠল। বললে, দেখ আমাকে রাগিও না বলছি। মামলা থাকে থাক। আমি এখনি সরকার মশাইকে ঘোড়ায় সদরে পাঠাচ্ছি। সেই সঙ্গে তিনি ডাক্তারও একজন ডেকে নিয়ে আসবেন।

—ডাক্তার !—বিস্ময়ে শঙ্করের চোখ কপালে উঠল—ডাক্তার কি হবে ? বালিশটা রোদ্দুরে দিলে ঘাড়ের ব্যথা সেরে যায়। তার জন্যে ডাক্তার আনতে হবে ! তুমি পাগল হলে না কি ?

শঙ্করকে হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে সুকুমারী বললে, পাগল এখনও হই নি, এইবারে হব। তোমার হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাই আমার অদৃষ্টে আছে। তোমার যদি ভালোমন্দ কিছু হয়, তাহলে পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।

ওর কণ্ঠ অশ্রুতে অবরুদ্ধ হল।

শঙ্করের আর বলবার কিছু রইল না। তেলাপোকা যেমন করে কাঁচ-পোকার অনুগমন করে, তেমনি করে সে সুকুমারীর পিছু পিছু শয়নকক্ষে গেল। সেখানে সেই ফ্লানেলের পাঞ্জাবি আর পশমী কম্ফর্টার তার জন্যে অপেক্ষা করেই ছিল। সেইগুলো যথাস্থানে চড়িয়ে সে শয্যাগ্রহণ করলে।

সন্ধ্যা নাগাদ শহর থেকে ডাক্তার এল। সারারাত তিনি রইলেন। ব্যবস্থা হল রকমারি ঔষধ এবং পথ্য, মালিশ এবং সেক। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার উৎপাতে শঙ্কর ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল। দিনে-রাত্রে তার নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। রোগের যন্ত্রণা তো আছেই, তার চেয়ে বেশি হল শুশ্রূষার যন্ত্রণা। ঔষধ যদি খাওয়া হল তো পথ্য আছে। মালিশ যদি দেওয়া হল তো সেক আছে। একটা শেষ হয় তো অন্যটা, দিনে এবং রাত্রে তার আর শেষ নেই। একটার পর একটা ঘড়ির কাঁটা ধরে পর্যায়ক্রমে আসছেই।

জেগে থাকলে সুকুমারী ঘুমোবার জন্তে মাথার দিব্যি দেয়। নিজের হাতে পাখা করে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু শঙ্কর চোখ বন্ধ করলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে : ওগো তুমি কথা কইছ না কেন? অমন অসাড় হয়ে রইলে কেন? এই যে আমি বসে—আমার দিকে চাও। ওগো, আমার ভয় করে যে!

তখনই শঙ্করকে নিদ্রাতুর রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইতে হয়। প্রমাণ দিতে হয় সে বেঁচেই আছে।

কিন্তু তাতেই কি রক্ষা আছে! শঙ্করের চোখ অমন লাল হল কেন? ওর স্বাভাবিক চোখ তো লাল নয়। এ আবার কী নূতন ব্যাধি! সুকুমারী আর পারে না। তারও বুক যেন কেমন করছে। স্নায়ু যেন ছিঁড়ে আসছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তার পরে চোখ মুছে উঠে তখনই ডাক্তারকে আনতে লোক পাঠায়।

সাত দিন এবং সাত রাত্রি শঙ্কর এমনি অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করার পর ডাক্তারে অবশেষে তাকে সুস্থ বলে ঘোষণা করলেন। রকমারি ঔষধ, মালিস এবং সেক বন্ধ হল। তার গলার কম্ফর্টার এবং গায়ের ফ্লানেলের পাঞ্জাবি খুলে নেওয়া হল এবং এই গরমের দিনেও যে লেপখানা সকল সময় তার গায়ের উপর চাপান থাকত, সেটাও তুলে নেওয়া হল।

সাত দিন পরে শঙ্কর সুস্থ হয়ে বাইরে এসে বসল। তার ঘাড়ের ব্যথা সেরে গেছে। এই সাত দিন ধরে দিবারাত্রি স্নেহের যে অত্যাচার সে সহ্য করলে, মনের কোথায় তা যেন একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। সে ক্ষত আর কিছুতেই সারল না। সে সারবার নয়ও। অবশিষ্ট জীবনভোর সেই ক্ষত সুকুমারীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখাই হল তার কঠিনতম কাজ—তার কঠোরতম সাধনা।

একটি ময়ূর

আমার বাড়ির ছাদে কোথা থেকে একটা ময়ূর এসেছে।

উলঙ্গ ছাদ। না আছে টবে-বসানো ফুলগাছ, না তরুলতার বাহার। এই সময় সেখানে প্রচুর ঘুড়ি উড়ে এসে পড়ে। আমার মেজ ছেলে পন্টু একটা লাঠির আগায় ঝাঁটা বেঁধে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সমস্তক্ষণ ঘুড়ি ধরছে। নিজে সে ঘুড়ি ওড়ায় না, কাউকে দেয়ও না, তবু অকারণে ঘুড়ি ধরাটা তার একটা নেশা—শিকারের নেশার মতো। গৃহিণী দিন রাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকেন, তাঁর সুবোধ পুত্র কখন উৎসাহের আধিক্যে ছাদ থেকে পড়ে যায়।

এমনি ছাদ। তার একমাত্র সার্থকতা—কাপড় মেলে দেওয়ায়, আর বড়ি শুকোতে দেওয়ায়। এ সংসারে যা আমার দ্বিতীয় পুত্রের শিকার-সঙ্কুল বৃক্ষ-লতাহীন অরণ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ছাদে—কাক নয়, চিল নয়—আস্ত একটা ময়ূর সাহারা মরুভূমিতে একতাল মেঘের মতোই অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর।

কলকাতা শহরে বন্য ময়ূরের আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয়ই কারো পোষা ময়ূর, কোনো গতিকে ছাড়া পেয়ে নগর-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার আর আবশ্যক হল না। গোটা নগর তাকে দেখবার জন্যে আমার এই ছোট বাড়িতে ভেঙে পড়েছে। সে ভিড় ছাদের দরজা থেকে নিচে এবং সেখান থেকে বহুদূর রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আর ক্রমেই আশঙ্কা ও উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

সে ভিড়ও দেখবার মতো। হিন্দুস্থানী ঝাঁকা-মুটে, মেসের উড়িয়া চাকর, আলখাল্লা পরিহিত কাবুলীওয়ালা, পাড়ার ছেলে, এমন কি কর্মক্লান্ত আফিসের বাবুও একবার ঊর্ধ্বমুখে চেয়েই ক্ষুৎপিপাসা ভুলে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। পথে গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম।

দাঁড়িয়ে দেখবার মতোই দৃশ্য। ছাদের আলসেতে বসে ময়ূরটা নিচের দিকে যেন আলগোছে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ। মাঝে মাঝে নিচের ঊর্ধ্বমুখ ভক্ত জনতার দিকে যখন গ্রীবা বেঁকিয়ে কৃপাকটাক্ষে চাইছে, তার অপরূপ গ্রীবা ঝিকমিকিয়ে উঠছে অপরাহ্ণের রঙিন আলোয়। আমার নিরাভরণ ছাদ যেন একটা সম্রাটের আবির্ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

বৈশাখের খররৌদ্রের পর এমনি একটি জীবের আবির্ভাব সকলের চোখ

যেন জুড়িয়ে দিয়েছে। নইলে মোটভারাবনত ঝাঁকা-মুটে কিম্বা মেসের চাকরের কথা ছেড়েই দিলাম, কাবুলীওয়ালা কখনও খাতকের সন্ধানে নিযুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্যমনস্কভাবে ময়ূরের দিকে নিবদ্ধ করত না। কাবুলীওয়ালার আত্মবিস্মৃতি সহজে ঘটে না।

সকলেই খুশি হয়ে উঠেছে। বিব্রত হয়েছি কেবল আমি। এই অত্যন্ত স্নিগ্ধদর্শন জীব আমার বাড়ির দরজা দিয়েছে খুলে। ভক্তবৃন্দের অনুদ্ধত নিঃসঙ্কোচ অভ্যাগমে আমার অন্দরের মর্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠিত। অথচ বহু চেষ্টাতেও এদের বিদায় করার কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পেরে আমি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলাম। ভগবান আমার কণ্ঠে যথেষ্ট শক্তি দেননি। ভিড় হঠাবার জন্যে যে রূঢ়তা প্রয়োজন, তা বহু চেষ্টাতেও আমি সংগ্রহ করতে পারি না। সুতরাং এমন একটা অপদার্থ লোকের মনে মনে উত্তপ্ত হওয়া ছাড়া সান্ত্বনা লাভের আর কি উপায় থাকতে পারে!

এমন সময় এ-বাড়ির মালিক ব্রজরাজবাবুকে হন্তদন্তভাবে এই দিকেই ছুটে আসতে দেখে আমি যেন অকূলে কূল পেলাম।

ব্রজরাজবাবুকে এ পাড়ার বাঘ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ রাস্তার অধিকাংশ বাড়ি তাঁর। লক্ষ্মীর করুণা যে তাঁর উপর কতখানি বর্ষিত হয়েছে তা তাঁর চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। স্থূলতনু, খর্বাকৃতি মানুষ— পরিধানে একখানি মলিন বোম্বাই চাদরের অর্ধাংশ। কখনও কখনও পায়ে জুতাও থাকে। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কিন্তু এদিকের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে পরিপুষ্ট গুম্ফে এবং উদাত্ত কম্বুকণ্ঠে।

আমি সাগ্রহে ডাকলাম, এই যে এদিকে, এদিকে।

ডাকবার আবশ্যক ছিল না। উনি এই দিকেই আসছিলেন এবং লক্ষ্য ওই ময়ূর।

বললেন, কি ব্যাপার?

করুণ কণ্ঠে বললাম, দেখুন তো কাণ্ড। কাজ-কর্ম, এমন কি রান্নাবাড়া পর্যন্ত বন্ধ।

আর বলতে হল না। পাশেই একটি বাঙালি পানওয়ালা ছোকরা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রজরাজবাবু প্রচণ্ড হিন্দিতে তাকেই ধমক দিলেন:

—এই উল্লু, কেয়া দেখতা হ্যায়?

—আজ্ঞে ময়ূর।

—অ্যাঁঃ! ময়ূর! ভাগো।

ব্রজরাজবাবু আর তার দিকে চাইলেনও না। জনতা উভয় পাশে যথাসম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত করে তাঁর জন্যে সঙ্কীর্ণ এক ফালি রাস্তা করে দিলে, আর ব্রজরাজবাবু চক্ষের পলকে তেতলায় উঠে এলেন। হতাশভাবে আমি আবার আমার নিজের নিভৃত জায়গাটিতে এসে বসলাম। শুনতে লাগলাম:

—ও-রকম করে নয়, ও-রকম করে নয়। আগে দুটিখানি ছোলা ছিটিয়ে দাও। সন্ধ্যে পর্যন্ত থাক বসে বসে।

—বেশ বললেন! খেয়ে-দেয়ে যদি পালায়?

—অন্ধকার হয়ে গেলে আর পালাতে পারবে না।

—কেন?

—ওরা অন্ধকারে চোখে দেখতে পায় না।

—তাই নাকি? ওরে, ছোলা নিয়ে আয় না কেউ। এ বাড়িতে ছোলা নেই?

—না থাকে নেই নেই। আমার নাম করে সামনের দোকান থেকে আধ পোয়া ছোলা নিয়ে আয় তো!

(অনেকগুলি পায়ের দুমদাম শব্দ হইল। বোধ হয় একাধিক লোক ছোলা আনতে ছুটল।)

আমার বড় ছেলে প্রসাদ এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। সে কোথায় গিয়েছিল। বাড়িতে ভিড় দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—কি ব্যাপার?

—ময়ূর।

—কোথায়?

—তোমাদের ছাদে।

—কাদের ময়ূর?

—কে জানে।

প্রসাদ উল্লসিত হয়ে উঠল:

—ময়ূর? ময়ূরব্যংসকাদি কর্মধারয়? আমাদেরই ছাদে? হুর্‌রে! (প্রসাদের কাছে ময়ূর কি ময়ূর-ব্যংসকাদি কর্মধারয়ে পরিণত হল অবশেষে?)

কয়েকটি বাঙালি ছোকরা কাবুলীওয়ালাকে নিয়ে আমোদ করছে ঃ

—ক্যায়সা চিড়িয়া ?

—আচ্ছা চিড়িয়া। ভালা, ভালা।

—ক্যায়সা রং ?

—রংগ্ ? বহুত খুবসুরৎ !

—তুমারা মুল্লুকমে হ্যায় ?

—হ্যায়।

—ময়ূর, ময়ূর হ্যায় ?

—হাঁ, হ্যায়। বউর হ্যায়।

—হাঁ হ্যায়, না আরো কিছু !

—জরুর হ্যায়। ইস্‌সে বড়া। এৎনা বড়া।

(বলে লাঠিটা মাথার উপর উঁচু করে দেখিয়ে দিলে কত বড়।)

—ওৎনা বড় !

(লোকগুলো হো হো করে হেসে উঠল।)

চোখে চশমা-পরা কয়েকটি ছেলে বলছিল ঃ

—এই সময় যদি মেঘ উঠতো ভাই !

—আঃ !

কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটি তটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত বিকশিত বয়নে,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে।

কি আনন্দই হোত তাহলে ! ওরা মেঘ দেখলেই নাচে, না ?

—কাদের ময়ূর কে জানে ? ছাদ যেন আলো করে দাঁড়িয়েছে ! এই সময় একবার পেখম মেলত !

—যদি বা মেলত, এত লোক দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কেন যে এরা দাঁড়িয়ে আছে! আশ্চর্য!

—হুজুগ আর কি!

—"ভবন-শিখীরে নাচাত গণিয়া গণিয়া।"

—পুরুষ-ময়ূর, না?

—হুঁ। ময়ূরী এত সুন্দর না।

ঠিক ওদেরই উপরে সামনের বাড়ির দোতালার বারান্দায় ক'টি তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কখনও দেখছিল ময়ূর, কখনও দেখছিল রাস্তার জনতা। ছেলে-গুলির কথা বোধ হয় তারা শুনতে পেলে। চুপি-চুপি একজন আরেকজনকে বললে:

—শুনছিস? পুরুষ-ময়ূর। ময়ূরী এত সুন্দর হয় না।

—হবার দরকার কি? ওদের তো আর আমাদের মতো এত বয়স পর্যন্ত আইবুড়ি থাকতে হয় না। যৌবন জাগতে জাগতেই দুয়ারে ময়ূর এসে পেখম তুলে দাঁড়ায়।

—আর আমাদের?

—আমরা কখন ময়ূর এসে ফিরে যায় বলে দিনরাত্রি পেখম তুলে দাঁড়িয়ে আছি। সাজ-সজ্জার আর বিরাম নেই।

দুজনে হাসল।

(ব্রজরাজবাবুর চোখ শিকারীর মতো একাগ্রতায় জ্বলছিল। ময়ূরের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও উপরে, কখনও নিচে ঘুরছিল।)

—আর ঘণ্টাখানেক বাবা, তারপরে একবার অন্ধকার হয়ে এলেই...

—আপনি ময়ূর বুঝি খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ!

—বড় বাড়ি নইলে ময়ূর মানায় না। তা আপনার বাড়িতে মানাবে। বেশ বড বাড়ি।

—অনেক দিন থেকেই আমার ময়ূর পোষবার সখ আছে। কিন্তু সুবিধামত...

(এতদিন সুবিধামত দরে পাচ্ছিলেন না বলেই মনের সখ মনে চাপা ছিল।

এতদিনে সুবিধা যদি হল, কিন্তু যে ভিড়! ময়ূরটা খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাইছিল।)

—ভয় পেয়ে গেছে বোধ হয়! এত লোক, ভয় পাবে না?

—বাস্তবিক।

—বাবাসকল, একটু আড়ালে যাও দিকি। ময়ূর ধরি, তারপরে আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিনরাত্রি দেখো। ওই সামনেই আমার বাড়ি, ১৪ নম্বর।

(কিন্তু বাবাসকলের সরবার লক্ষণ দেখা গেল না। তারা শুধু, যাকে বলে, গা মারলে।)

—যা হোক বাবা!

চশমা-পরা ছেলেটি বলছিল :

—আমার মামার বাড়িতে একটা ময়ূর ছিল। তার জন্যে গোছা গোছা সাপ নিয়ে আসতে হত।

—কেন?

—খেত।

—সাপ খায়! কি সর্বনাশ! ওকে দেখে দেখে যতগুলি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম, সব সুর কেটে গেল!

—কেন?

—যাবে না? তুই যদি দেখিস, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ডাস্টবিন থেকে খুঁটে খুঁটে…

—কি ভয়ানক! সেই উপকথার রাক্ষসী সুয়োরাণীর মতো? দিনে পরমাসুন্দরী রাণী, রাত্রে হাতিশালা থেকে হাতি, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া টপাটপ গিলছে! ভয়ঙ্কর কল্পনা!

—না, তুই ময়ূরের সম্বন্ধে ঘেন্না ধরিয়ে দিলি ভাই। অমন সুন্দর জন্তু সাপ খায়!

—আরও শোন্। অমন বিষধর সাপ পরমানন্দে ভোজন করছে, কিন্তু কুকুরে ছুঁলেই বাস্!

—মরে যাবে?

—হ্যাঁ। আর দেখতে হবে না।

দোতালায় বারান্দায় তরুণীটি বলছিল :

—আমাদের বারে ময়ূরের সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছিল। আমি লিখিনি। এখন একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে।

—কি কবিতা ?

—'ময়ূরের অপমৃত্যু'। মানুষের প্রেমে ময়ূর মরে গেল - যেমন করে মরল পদ্মিনী, মরল কৃষ্ণকুমারী। চেয়ে দেখ, লোকগুলো কি হিংস্র ভালোবাসায় থাবা গেড়ে বসেছে !

—লেখ তুমি। চমৎকার হবে।

সন্ধ্যা আর কিছুতে যেন হতে চায় না। ভয়ে অথবা কি জানি কি ভেবে ময়ূরটা ডেকে উঠল। ক'টি ছোট ছেলে, যারা এতক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপূর্ব জীবটিকে দেখছিল, এই অশ্রুতপূর্ব্ব কর্কশ শব্দে চমকে দু-পা পিছু হটে এল।

প্রসাদ আপন মনেই আর একবার বললে, হুঁ। ময়ূরব্যংসকাদি কর্মধারয়।

ময়ূর নামের সঙ্গে ব্যাকরণের এই ভীতিকর সমাস যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কেকাধ্বনিতে বুঝি তারই সাড়া মিলল।

—কি খোকাবাবু, নেবে ? (কথাটা বোধ হয় মুদি বললে।)

—না।

—না, কেন ? অমন সুন্দর দেখতে।

—আমার এগ্‌জামিন।

পাশের বাড়ির বৌটি অনেকক্ষণ ধরেই জানালার আড়াল থেকে দেখছিল। কাজকর্ম সেরে তার শাশুড়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন।

—ওমা, একটা ময়ূর যে !

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকেই ওইখানে রয়েছে। ধরবার জন্যে কত লোক ছুটেছে দেখুন। কি সুন্দর ময়ূর !

—ভারি সুন্দর ! আহা ! বলে, 'যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি'।

—সে ময়ূরকে নয় মা, নাচাত গোপালকে। (বৌটি হাসল।)

—সে একই কথা বৌমা। যে গোপাল সে-ই ময়ূর। নইলে কি আর ভগবান শিখীপুচ্ছ মাথায় নেন ? বৃন্দাবন যেতে কত ময়ূর দেখলাম মা, বন যেন আলো করে রয়েছে।

—অনেক ময়ূর ?

—ঝাঁকে ঝাঁকে। যমুনার ধারে…

—কদম গাছ আছে ?

—আছে বৈকি।

—সবই আছে, কেবল বৃন্দাবনচন্দ্র নেই।

—তিনিও আছেন মা। সবই যখন আছে তখন তিনিও আছেন বই কি! এসব ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারেন!

—ছবিতে যখন দেখি, যমুনার নীল জল ফুলে ভরা কদম গাছ, শ্রীকৃষ্ণ বাজাচ্ছেন বাঁশী আর ময়ূর-ময়ূরী নাচছে,—এমন অদ্ভুত লাগে আমার!

(বৌটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বোধ হয়)

মুদি জিজ্ঞাসা করলে ব্রজরাজবাবুকে :

—ময়ূরের মাংস খেয়েছেন কখনও ?

(ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে ব্রজরাজবাবু এবার প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চমকে বললেন :)

—ময়ূরের মাংস ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—খায় নাকি ?

—ওঃ! খুব পেয়ার করে খায়। এমন চমৎকার মাংস!

—তাই নাকি ?

(ব্রজরাজবাবু ময়ূরটার দিকে চেয়ে ওর কথার সত্যতা পরীক্ষা করলেন।)

—তুমি খেয়েছ ?

—অনেক। আমাদের মুল্লুকে…

কার ময়ূব কে জানে!

—কত সখের জিনিস! সেও ব্যস্ত হয়ে বেডাচ্ছে নিশ্চয়ই।

—তার আর কথা! কালই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে দেখবেন!

—নিশ্চয়।

—তখন তো যার ময়ূর তাকে ফেরত দিতে হবে ?

—তা ছাড়া আর উপায় কি ?

—চাই কি, এখনও এসে পড়তে পারে।

—তা তো পারেই।

—এলে ভালো হয়। বুড়োটা যে রকম তাক্ করে বসে আছে, ভাবি জব্দ হয়ে যায়।

(সেই সম্ভাবনায় দুজনে খুশির সঙ্গে হেসে উঠল।)

—এই, ও রকম করে হাসবেন না, হাসবেন না।

(অন্ধকার হয়ে এসেছে। ব্রজরাজবাবু বুড়োকেই ওস্তাদ স্থির করে তার উপরই ময়ূর ধরার ভার দিয়েছেন। মুদি ওস্তাদ শিকারীর মতো গুটি গুটি চলেছে।)

—এই, ওরকম করে হাসবেন না। ময়রটা উড়ে পালাতে পারে।

—পালাবে কি করে? অন্ধকারে দেখতে পায় না যে!

—না, পায় না আবার!

—সত্যি পায় না। শ্রীরাধার অভিশাপ আছে।

—আছে!

—নেই তো দেখতে পায় না কেন? তার উত্তর দাও।

(লোকটা তার উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে রইল।)

রাস্তার ভিড এখন অনেকটা হালকা হয়েছে। সেখান থেকে এখন আর অন্ধকারে ময়ূরটাকে দেখা যায় না। নিতান্ত যারা উৎসাহী তারা ছাড়া আর সকলেই চলে গেছে।

ব্রজরাজবাবু আছেন। আর আছে সেই মুদি। কখনও উত্তর দিক থেকে, কখনও দক্ষিণ দিক থেকে, কখনও সে গুটি গুটি এগুচ্ছে, কখনও পিছুচ্চে। অন্ধকারে তার কালো দেহের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কৃষ্ণকায় শিকারী কুকুরের মতো।

ব্রজরাজবাবু ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন।

হঠাৎ একটা ঝটপট শব্দের সঙ্গে মুদি চিৎকার করে উঠল : এইবার।

ময়ূরটা ধরা পড়েছে!

একটি সত্যকার প্রেমের গল্প

আষাঢ়ের প্রথম দিবসের দেরি আছে। কিন্তু আকুল করে মেঘ উঠল অপরাহ্নের দিকে। দেখতে দেখতে এল ঝড়। ম্যাকফার্সন কোম্পানীর আপিসে সামাল-সামাল রব উঠল। খাতা পত্র আর রাখা যায় না। বেয়ারাগুলো ছুটে ছুটে দরজা-জানালা সশব্দে বন্ধ করতে লাগল। তার পরে আরম্ভ হল যত ঝড়, তত বৃষ্টি। গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় মাতন লেগে গেল। নুয়ে নুয়ে পড়ে বড় বড় গাছ, বুঝি এখনই ভেঙে পড়বে। ঘন ঘন ডাকে বজ্র, ঝিলিক মারে বিদ্যুৎ—আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। দিনকে আর দিন বলে চেনবার উপায় রইল না।

এক ঝলক ভিজে হাওয়া ঘরে ঢুকতেই একটি ছোকরা কেরানী খুশি হয়ে বলল, আঃ! মন যেন জুড়ুলো।

—ওরে, জানালা বন্ধ করিস না রে। হাওয়া একটু আসতে দে।

—আজ্ঞে, সব উড়ে যাচ্ছে যে!

—উড়ুক, উড়ুক। সব উড়ুক। সেই সঙ্গে মনটাও উড়ুক।

কথাটা ছোকরা এমন করে বললে যে, তার নববিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করে অনেকেই হেসে উঠল। বর্ষার নবীন মেঘ এবং বিরহী চিত্তের কথা কে না জানে?

কথাটা বড়বাবু দামোদর সামন্তেরও কানে গেল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি একবার সেদিকে চাইলেন। আপন মনেই একটু হাসলেন। তারপর গম্ভীরভাবে আবার কাজে মন দিলেন।

বৃষ্টি ছাড়ল ছ'টার পরে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য সকলের ছিল না। কিন্তু বাতের কথা স্মরণ করে দামোদরকে অপেক্ষা করতে হল। পূবে হাওয়ায় বাত বাড়ার আশঙ্কা আছে।

তিনি যখন বার হলেন, তখন রোদনক্লান্ত শিশু-মুখের মতো আকাশে অপরূপ বর্ণসুষমা। বর্ষাস্নাত কলকাতা শহরের অতি কুৎসিত বাড়িগুলিও যেন সেই আলোয় হাসছে। কোথাও কোথাও ফুটপাতগুলি ঝরা ফুলে আর ঝরা পাতায় ঢেকে গেছে।

নতুন বাজারের কাছে বড়বাবুর বাসা। আফিস থেকে এই পথটা

তিনি বাতের ভয়ে আজ আর হাঁটতে সাহস করলেন না। ট্রাম বন্ধ। রাস্তায় স্থানে স্থানে জল জমে গেছে। দামোদর একখানি বাসে চড়লেন।

কিন্তু বাস তো নয়, যেন স্টিমার। হেলতে-দুলতে, থামতে-থামতে, দুদিকে জলের ঢেউ তুলে চলেছে।

নতুন বাজারের কাছে এসে দামোদর নামলেন।

লোকের পায়ে পয়ে জল-কাদায় স্থানটি এমন হয়ে আছে যে, দামোদর একবার ভাবলেন, ফিরে যাই। কিন্তু এই বর্ষা-সন্ধ্যায় ইলিশ মাছের লোভ শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করতে পারলেন না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে অতি সন্তর্পণে তিনি বাজারে ঢুকলেন।

বর্ষার হাওয়া দিলেই ইলিশ মাছের দর চড়ে যায়। বহু কষ্টে, অনেক দর কষে দামোদর রজতকান্তি এক জোড়া ইলিশ সওদা করলেন। তাঁর মনে হল সওদা সস্তাই হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ষার সুরের সঙ্গে তাঁর চিত্তের যেন যোগ ঘটল।

দামোদর খুশি হয়ে উঠলেন।

ফেরবার সময় তাঁর মনে হল, সেই বাজারেই যখন এলেন, তখন কালকের বাজারটা করে নিয়ে গেলে পারেন। তাহলে কাল সকালে আর আসতে হয় না। একটা মোটা ঝাড়ন সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকে। তিনি আলু কিনলেন, পটল কিনলেন, থোড়-মোচা-উচ্ছে-ঝিঙে সব কিনলেন এবং বোঝা বেশ ভারি হতে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

—চাই কেয়াফুল!

একটা রোগা-পট্‌কা লোক কেয়াফুল বিক্রি করছে।

—কেয়াফুল চাই বাবু?

দামোদর মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলেন।

কেয়াফুল!

দামোদরের হাসি এল। প্রথম যৌবনে কেয়াফুল আর বেলফুলের মালার পিছনে কি কম পয়সাটাই অপব্যয় করেছেন! আজ কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সেদিনের পুরনো বন্ধুদের কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর কারো সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না।

জানতো শুধু তারা। তখন মাথায় এমন টাক পড়েনি, শরীরে অনাবশ্যক মেদও জমেনি। আর বাত! সে তো সেদিনের।

আফিসের সেই ছোকরাটিকে মনে পড়ল। জোলো হাওয়ায় বেচারার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইট-কাঠ-কড়ি-বরগা-খাতাপত্রের রুক্ষতা থেকে কোমল হাওয়ায় সে মুক্তি চায়। কিন্তু আফিসের ঘরে জোলো হাওয়া ঢোকবার যো কি! খাতাপত্র সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে যে!

ছেলেমানুষি! দুদিনেই সেরে যাবে অখন!

ক্লান্তবর্ষণ শেষ অপরাহ্ণের এই অপূর্ব আলো!

ঝরা ফুল! ঝরা পাতা!

কিসের একটা মিষ্টি-মিষ্টি আবছা গন্ধ!

দামোদর ভাবতে লাগলেন, প্রেমের কত রকমের প্রকাশই না আছে! প্রথম যৌবনের সেই উচ্ছল দিনগুলি আজ কোথায়! সে-ছেলেমানুষি সেরে গেছে। সেই মূঢ়, অবোধ দিনগুলির কথা ভাবলেও এখন হাসি পায়! সত্যিকার প্রেমের সম্বন্ধে তখন তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

পূবে হাওয়া বইছিল। দামোদর বেশ করে চাদরটা গলায় জড়িয়ে নিলেন।

—এই যে! পাঁপর নিয়ে যান বাবু।

দামোদর চমকে চেয়ে দেখলেন, তাঁর সেই পুরনো পাঁপরের দোকান। দোকানদার সহাস্য বদনে তাঁকে আহ্বান করছে।

ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আজকের দিনে পাঁপরটা যে নিতান্তই চাই।

—কি পাঁপর দোব বাবু!

—যেটা রোজ নিয়ে যাই!

খিচুড়ি,—ইলিশ মাছ—পাঁপর ভাজা।

দামোদরের চোখে বর্ষার সমগ্র রূপটি জ্বল জ্বল করে উঠল।

কেয়াফুল! চাই কেয়াফুল!

দামোদর পাশ কাটিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলেন।

অন্ধকার সরু গলি।

নিচের বসবার ঘরে দামোদরের বড় ছেলে সুশোভন ইতিহাসের পড়া তারস্বরে মুখস্ত করছিল :

And then Mohammad Toghlak...and then...and then... Mohammad Toghlak...

দামোদর সশব্দে দুটি ইলিশ রান্নাঘরের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় নামালেন। তার সঙ্গে তরকারির বোঝা।

—কই গো!

শব্দ পেয়ে গৃহিণী তাড়তাড়ি নেমে এলেন।

—ও মা! ইলিশ মাছ এনেছ!

গৃহিণী পরম স্নেহে মৎস্যযুগলকে হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। খুশিতে তাঁর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—বেশ টাটকা। গঙ্গার ইলিশ?

—কি জানি! বললে তো।

কাঁচা সোনার মতো গৃহিণীর দেহের বর্ণ। মুখখানি ভারি হয়ে এসেছে। অনেকদিন পরে দামোদর চেয়ে দেখলেন, নাতি দীর্ঘ দেহ আগের চেয়ে একটু-খানি স্থুল হয়েছে। চোখের সে চটুলতাও নেই।

দামোদরের মনে হল, তার চেয়ে এ ভালো।

ছেলেমানুষি!

—পাঁপর আনান?

—কি মনে হয়?

—এনেছ।—গৃহিণী হাসলেন।

—কি করে জানলে?

—তা আর জানি না! তুমি পেটুক-চূড়ামণি যে!

দুজনেই হাসলেন।

—আজ খিচুড়ি হয়নি কিন্তু।

—যাও, যাও। গন্ধ পাচ্ছি স্পষ্ট।

—এর মধ্যে গন্ধও নাকে গিয়েছে?

—কিন্তু গন্ধ যদি নাও পেতাম, তবুও বলতে পারতুম সুরমা যে,...

অনেকদিন পরে স্বামীর মুখে নিজের নামটা শুনে সুরমা চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, চুপ। ছেলেরা রয়েছে।

দামোদর থমকে গেলেন। অনেকদিন পরে তাঁরও মুখ দিয়ে নামটা কি রকম অজান্তে বেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন।

ছেলেমান্‌ষি !

কথাটা ঘোরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, মণ্টু কেমন আছে ?

—ভালো। দুপুর থেকেই জ্বরটা নেই।

—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আর কি।

—তাই হবে। বিকেল বেলায় একটা বেদানার জন্যে কী কান্না! আনিয়ে দিলাম !

—বেশ করেছ।

দামোদর গামছা কাঁধে ফেলে কলঘরের দিকে চললেন।

—ওকি ! এই রাত্রে চান হবে নাকি ?

—না, চান নয়। মানে কাপড়টাতে এমন কাদা লেগেছে...

—কলতলায় ছেড়ে রেখে এস। আমি কেচে দোব এখন।

—কিন্তু গায়েও লেগেছে যে ! সেটা তো আর কলতলায় ছেড়ে রেখে আসা যাবে না !

—না। সেটা ভিজে গামছা দিয়ে নিজেই মুছে নিতে হবে।

—তাই বলছিলাম।

—কিন্তু চান চলবে না।

—না, চান কেন।

গরম-গরম চা আর পাঁপর-ভাজা।

দামোদরের শরীরটা সুস্থ হল। পূবে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ পড়েছে। সুরমা তোয়াজটা জানেন ! তাঁকে যেন ঠিক আঙুরের মতো তুলোয় শুইয়ে রেখেছেন। একটি দিন সুরমা না থাকলে তাঁর কি অবস্থা ঘটতে পারে, সেই কথাটা দামোদর চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করলেন। ওঃ! গ্রীষ্মের দিনে হাওয়া বন্ধ হলে যে অবস্থা হয় তেমনি। বাইরের দিক দিয়ে সুরমা একটু স্থূল হয়েছেন। কিন্তু ভিতরের দিক দিয়ে এমন সূক্ষ্মভাবে তাঁকে বেঁধে ফেলেছেন ! অত্যন্ত সূক্ষ্ম বাঁধন, মাকড়সার জালের মতো,—কিন্তু অত্যন্ত শক্ত।

দামোদর চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে পান মুখে দিতে যাচ্ছিলেন। নিচের থেকে সুরমা হেঁকে বললেন, পান মুখে দিও না কিন্তু।

—কেন ?

—দরকার আছে।

সুরমা একটা প্লেট হাতে উপরে এলেন।

—দেখ তো এই কাটলেটটা কি রকম হয়েছে?

—কাটলেট!—খুশিতে দামোদর যেন উথলে উঠলেন,—চিংড়ি মাছ আবার কখন আনালে?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি? আমি বুঝি তোমার ইলিশ মাছের ভরসায় বসেছিলাম?

সে ঠিক।

কেমন হয়েছে?

—চমৎকার!

সুরমার ঈষদুন্মুক্ত কটিদেশের ত্রিবলী দেখা যাচ্ছে। একটু স্থূল হয়েছে। তা হোক।

মণ্টু আস্তে আস্তে কোলে এসে বসল।

—বেদানা খেয়েছ?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানালে খেয়েছে।

—কখন খেলে?

—একটু পরে।

মানে, একটু আগে। আট বছরের ছেলে মণ্টু ওই রকম উল্‌টোপাল্‌টা কথা কয়।

অনুযোগের সুরে মণ্টু বললে, তোমার আফিস থেকে ফিরতে এত দেরি হয় কেন বাবা?

—বৃষ্টি হচ্ছিল যে।

মণ্টু ব্যাপারটা বুঝলে। বললে, হুঁ।

বললে, দিনে কি গরম পড়েছিল বাবা!

—হুঁ।

—মা কি বলছিল জান?

—কি বলছিল?

—বলছিল, অঘ্রাণের গরমে ঘরের ডাক বাইরে করবে।

দামোদর হেসে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ, অঘ্রাণে ভীষণ গরমই পড়ে!

মণ্টু কি শুনতে কি শুনেছে। ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ তার কাছে উভয়ই সমান অপরিচিত।

মিনতির সুরে বললে, তখন একখানা পাখা নিও বাবা।

—নিশ্চয়।

মণ্টুরও দোষ নেই। সারাদিন জ্বরাক্রান্ত দেহে অসহ্য গরমে বেচারা ছটফট করেছে। এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাবার কোলেই সে ঝিমুতে লাগল। দামোদর সন্তর্পণে তাকে ঘরের মধ্যে তার ছোট বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলেন।

এই ক'দিনের জ্বরেই বেচারার দেহে কাঁটাখানি সার হয়েছে। চলতে গেলে টলছে। চোখ সকল সময়ই যেন ঝিমিয়ে আসছে। কণ্ঠস্বর মৃদু এবং শ্রান্ত। ওর একটা ভালোরকম চিকিৎসা প্রয়োজন।

নিচে জ্যেষ্ঠ পুত্র তখনও মহম্মদ তোগলককে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। কিছুতেই সেই পরলোকগত দুর্দান্ত পাঠান সম্রাটকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারছে না। দামোদরের নিজেরও ঢুল আসছিল। কিন্তু পুত্রের চিৎকারে নিদ্রার সূত্র বারে বারেই ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। অভ্যাস বশে গড়গড়ায় টান দিলেন। আগুন নিবে গেছে।

অগত্যা দামোদর নিচে গেলেন।

সুরমা তখন হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে খুব ব্যস্ত। দামোদরের পায়ের শব্দে একবার পিছনে চেয়েই বললেন, আর দেরি নেই। ইলিশ মাছের ডিমের চাটনীটা ফুটছে। এইটে নামলেই হয়।

দামোদর চৌকাঠে দুই হাত দিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, তার জন্যে নয়, একলা বসে থাকতে কি রকম ভালো লাগল না। তাই নেমে এলাম।

সুরমা আড় চোখে চেয়ে হেসে একটা চুমকুড়ি কাটলেন।

বললেন, তুমি এক কাজ কর বরং। ওই আসনটা পেতে বোসো। তুমি খেতে খেতে চাটনী হয়ে যাবে।

—সেই ভালো। চুপ করে বসে থাকা যায় না।

—তা কি আর জানি না? তুমি যে একটি পেটুকরাম।

দামোদর পরমোৎসাহে আসন পেতে বসলেন। সুরমা থালায় করে খিচুড়ি বেড়ে দিলেন।

ওঃ! এ যে একেবারে বর্ষা-উৎসব! ইলিশ মাছ দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি,

আলু ভাজা, পটল ভাজা, কাটলেট, আলু-পটলের ডালনা, ইলিশ মাছ ভাজা, মাছের ঝাল, এর পরে চাটনী আছে।

দামোদর বললেন, পুঁই শাকের চচ্চড়ি খেয়েছিলাম রাঙা মামীমার কাছে। আজকের চচ্চড়ি খেয়ে সেই কথা মনে পড়ল।

—ভালো হয়েছে ?

—চমৎকার হয়েছে।

—নেবে আর একটু ?

—না, না ! সব রান্নাই চমৎকার হয়েছে।

পুত্রের মহম্মদ তোগলককে আয়ত্তে আনতে বেশি দেরি হল না। পড়া শেষ করে মায়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া তার বরাবর অভ্যাস। নইলে তার পেট ভরে না।

ঝির ঝিরে মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। দিনের প্রচণ্ড গরমের পরে ধরণী যেন শীতল হয়েছে।

সুরমা যখন শোবার ঘরে এল, দামোদরের তখন মহাসমারোহে নাক ডাকছে। ভোজন-শ্রান্ত দামোদর সুশীতল বর্ষারাত্রে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিদ্রামগ্ন। কোলের কাছে নরম পাশ বালিশ। গড়গড়ার নলটি তখনও মুঠোর মধ্যে।

নীড়ের মায়া

তিনদিনের জ্বরে যখন দ্বিতীয়া গৃহিনী কাঞ্চনমালাও বনমালীকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তখন বনমালীর বয়স একান্ন কি বাহান্ন। কচি কচি ছেলেমেয়ে-গুলোকে তিনি কোলে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু তারপরে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

বড ছেলেটি বছর পনেরোর। তার জন্যে ভাবনা নেই। নিজের খবরদারি নিজেই করবার বয়স তার রয়েছে। মেজটি মেয়ে, বয়সও বছর এগারো-বারো। তারও জন্যে না হয় ভাবনা নেই। কিন্তু পরের ছু'টি? তারা যে নিতান্তই বাচ্ছা! ছোটটি তো সবে হাঁটতে শিখছে।

ভগবান যাঁর সর্বনাশ করেন, বুঝি এমনি করেই করেন। বড়টি যদি মেয়ে হত তা হলে এত বিপদ হত না। পোনেরো বছরের বাঙালী মেয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত করতে পারত। কিন্তু ওই বয়সের একটা ছেলে নিতান্তই অকর্মণ্য। সংসারের বোঝা বইবার তার শক্তিও নেই, অবসরও নেই।

সম্বল একটি বৃদ্ধা পিসিমা। তিনি দিনে মরছেন, রাতে বাঁচছেন। মৃত্যু যদি এঁকে নিয়ে তাঁর কাঞ্চনমালাকে রেহাই দিত, কি সুখেরই না হত!

বনমালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই পিসিমারই ঘরের দিকে চললেন। এ'ক-দিন যদি বা তিনি উঠে-হেঁটে বেড়াছিলেন, কাঞ্চনমালা যাওয়ার পর থেকে একেবারে শয্যা নিয়েছেন।

তাঁর বিছানার পাশে বসে বনমালী শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথা শোনালেন। এই জীবন যে নলিনীদলগত জলের মত তরল—এই পৃথিবী যে পান্থনিবাস, মানুষ এখানে ছুদিনের জন্যে আসে এবং কাজ ফুরিয়ে গেলে চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রীয় বাক্যে পিসিমার অশ্রুস্রোত কিছু পরিমাণে নিরুদ্ধ হল সত্য, কিন্তু তিনি উঠে বসতে পারলেন না। শাস্ত্র বাক্য মনকে প্রবোধ দিতেই পারে, দেহে শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। বনমালী বুঝলেন, এ বিপদে পিসিমার কাছ থেকে কয়েক গ্যালন অশ্রু ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। বানচাল সংসার-তরণী চালাতে তিনি নিতান্তই অশক্ত।

প্রথমপক্ষের ছুটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ঘরণী-গৃহিনী। ছুজনেরই সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়িতে বিবাহ হয়েছে। ক্ষেত-খামার, জোত-জমা, জন-মজুর প্রচুর।

তাদের পক্ষে বড় জোর দু-দশ দিনের জন্য এখানে আসা সম্ভব। তার বেশি নয়।

পত্নী-শোকের চেয়ে এই সব দুশ্চিন্তাই বনমালীর মনে প্রবল হয়ে উঠল। রাঁধা-বাড়া করবে কে? ছেলেপুলেদের নাওয়াবে-ধোয়াবে কে? বনমালী সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসারটি ছোট নয়, কাজও কম নয়! কাঞ্চনমালা দিনরাত্রি খিটমিট করত বলে বনমালী কত বিরক্ত হতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কতদিন কত ঝগড়াই হয়েছে। আজ বনমালী বুঝতে পারলেন, এতবড় বোঝা যাকে দিনের পর দিন বইতে হয়,—শনিবার নেই, রবিবার নেই, ছুটি নেই—তার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা সত্যই বড় কঠিন।

বনমালীর দূর সম্পর্কের বিধবা একটি বোন আছে। সম্বন্ধটা দূর হলেও ক্রমাগত যাওয়া-আসা, মেলা-মেশায় সম্পর্কটা নিকটই। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা স্ত্রী-লোক, ছেলে-মেয়ে নেই। দেওর-ভাসুরের ঘরে উদয়াস্ত নিরবকাশ পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'বেলা নির্যাতন এবং একবেলা দুটো খেতে পায়। সেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঞ্চনমালার জীবিত কালে একবার সে কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল, বৈধব্য জীবনের অবশিষ্টকাল ভায়ের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মুখরা কাঞ্চনমালার জন্যে তার এখানকার অবস্থিতিকাল দীর্ঘ হতে পারেনি।

সেই বিস্মৃত প্রায় ইতিহাস স্মরণ করে বনমালী দমে গেলেন। যেদিন সুরবালা চৌর্যাপরাধে বিতাড়িত হয়েছিল, সেদিন বনমালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। তাকে রক্ষা করতে পারেন নি, একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেন নি। অথচ কলঙ্কটা যত বড়ই হোক, অপরাধটা তত বড় করে দেখতে বনমালী অন্তত পারেননি।

দেবরের শিশুপুত্রের ঘুড়ির পয়সা যোগাবার জন্যে সুরবালা সামান্য কিছু চাল চুরি করে যদি গোপনে বিক্রিই করে থাকে, সেটা এমন একটা অপরাধ নয় যে তার জন্যে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে পঞ্চায়েত বসাতে হবে। বনমালী ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কেমন মনে হল, স্বামীগৃহে নির্যাতিতা যে-বিধবা ভ্রাতৃগৃহে এসেও দেবরপুত্রের মমতা বিস্মৃত হতে পারেন না, দেবর ভাশুরের লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তার অবলম্বনহীন জীবনের মূল শিকড়টি যে আসলে ওই নিষ্করুণ স্বামীগৃহের মাটিতেই আবদ্ধ তাতে আর ভুল নেই। সেইখানেই তার ফিরে যাওয়া উচিত।

সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভগিনীর একটা খোঁজ নেওয়ার আবশ্যক বিবেচনা করেননি, আজকে তারি কাছে গিয়ে কি করে যে দাঁড়াবেন সেই ভেবে তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু বনমালীকে বিশেষ বিব্রত হতে হল না।

একদিন সকালে মড়াকান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখে, তারই বাড়ির উঠোনে বসে সুরবালা অতি করুণকণ্ঠে মৃত ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশে শোক নিবেদন করছে।

বনমালী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কোঁচার খুঁটে অশ্রুমার্জন করে বললেন, সুরবালা এলি ?

কান্না থামিয়ে সুরবালা বললে, থাকতে পারলাম কই দাদা ? কিন্তু কাছেই তো থাকি, সেই সময় একটা খবর দিয়ে আনতেও তো পারতে।

অপ্রস্তুত হয়ে বনমালী বললেন, তখন সময় ছিল না দিদি। এখন সময় হতে তোকে আনবার কথাই ভাবছিলাম। বেশ হল, তুই নিজেই এলি। এই তো দেখছিস ঘর-দোরের ছিরি। ওই দেখ ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা। পিসিমা বোধ হয় এখনও ওঠেনইনি। এই সব দেখেশুনে নিয়ে আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দে ভাই, শেষ বয়সে এ আর আমার সহ্য হবে না।

শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

কান্নার শব্দে ছেলেমেয়েগুলো ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরবালা দুহাত দিয়ে তাদের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

বনমালী সেদিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। পত্নীবিয়োগের এত দিন পরে কান্না তাঁর গলার কাছ পর্যন্ত ঠেলে উঠল। এতদিন পরে নিজেকে সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে উঠল।

তারপরে পিসিমা উঠলেন। পাড়া প্রতিবাসী গৃহিণীরা এলেন। কর্মহীন দু-চার জন উলঙ্গ শিশুরও সমাবেশ হল।

সবাই বললেন, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুই আসবি না তো কে আসবে ? ওই তো পিসিমাকে দেখছিস। ওর কি আর শক্তি আছে ? যদ্দিন না নতুন বৌ আসছে, তদ্দিন সব দেখ শোন্, ছেলেমেয়েদের সময়ে দুটো খেতে দে, থাক।

বনমালী ফিরে এসে দেখলেন, উঠোনে ঝরঝরে নিকানো। ঘরের মেঝে, বারান্দা ঝকঝক করছে। অনেক দিন পরে বাড়ির আবার শ্রী ফিরেছে। পত্নীবিয়োগ-বেদনা ভুলে বনমালীর ঠোঁটে পরিতৃপ্তির আভাস জাগল।

বারো বছর বয়সে সুরবালার বিবাহ হয়েছিল। পনের বছরে বিধবা হয়। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামীকে চেনবার সবে সুযোগ পেয়েছিল। নীড় বাঁধবার

সাধ প্রতিপদের শশিলেখার মতো মনের আকাশে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার কাজ হল দাসীর। যা কিছু শ্রমসাধ্য সেই-সব কাজের ভার পড়ল তার ওপর। তার কাজ শুধু খাটবার, শুধু হুকুম তামিল করবার। দেবার-থোবার সাজাবার-গোছাবার কাজ তার জায়েদের। তাদেরই ঘর, তাদেরই সংসার। সে শুধু এক বেলা দুটি অন্নের বিনিময়ে খাটে।

বনমালীর সংসারে এবারে সে প্রথম গৃহিণীত্বের স্বাদ পেলে। বৃদ্ধা পিসিমা বিছানা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না। বনমালী বাইরে বাইরেই ঘোরেন। ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর নিকানো থেকে আরম্ভ করে শয্যা গ্রহণ করার পূর্বে বনমালীর কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দুধ খাওয়ানোর হাঙ্গামা পোয়ানো পর্যন্ত সব কাজ একা তার। তাকে হুকুম করার কেউ নেই। যেটা সে নিজে না করবে সেইটাই হবে না। বাঁচবার জন্য এমন একটা ঘরের কল্পনা বোধহয় তার অবচেতন মনের মধ্যে ছিল। তার আনন্দের আর সীমা রইল না।

প্রত্যেকটি ঘর সে আবার নতুন করে নিজের মনের মতন করে সাজিয়েছে। এদিকের খাট ওদিকে গেছে। ছবিগুলো পেড়ে মুছে ফের নতুন করে টাঙিয়েছে। বনমালীর শোবার ঘরে জোড়া-খাট ছিল। কাঞ্চনমালার মৃত্যুর পরে তার আর দরকার নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অন্য ঘরে তার কাছে শুচ্ছে। একখানি খাট সে সরিয়ে নিয়ে গেল পিসিমার ঘরে। গদির বিছানায় শুয়ে পিসিমা বড় সুখী। এতদিন তাঁকে মেঝের উপর শুতে হত। খুশি হয়ে সুরবালার মাথায় হাত রেখে তিনি অনেক আশীর্বাদ করলেন।

বনমালীর জোড়া-খাট আর দরকার নেই সত্য। তবু এত তাড়াতাড়ি একখানা খাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর ভালো লাগল না। বহুকাল ধরে ও-ঘরে দুখানি খাট পাতা ছিল। দুপুরে শুতে এসে তার বড় ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হল।

বললেন, সে খাটখানা আবার কোথায় চালান করলি সুরো?

সুরবালা বললে, পিসিমার ঘরে। নিচেয় শুতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। বুড়ো মানুষ।

বনমালী আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। সুরবালা এবার আর ভিক্ষুকের মতো আসেনি। বনমালীর গৃহে আজকে তার প্রয়োজন অবিসম্বাদী। বনমালী চুপ করে রইলেন। কিন্তু দুপুরে আর তাঁর ঘুম হল না। তাঁর কেমন মনে হল, শুধু পিসিমার প্রয়োজনেই খাটখানি ও ঘরে অপসৃত হয়নি, এর মধ্যে আরও যেন কিছু আছে। এর মধ্যে কাঞ্চনমালার বিগত ব্যবহারের প্রতিশোধের ঝাঁঝও যেন পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালার স্মৃতি অনন্তকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখতে

এমন কোন পণ অবশ্য বনমালী করেননি। তাই বলে এত শীঘ্র তার হাতের স্পর্শ মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসও তাঁর শোভন মনে হল না।

কিন্তু বনমালীর মনের কথা সুরবালা টের পেল কিনা বোঝা গেল না। সে যথাপূর্ব নিজের গৃহিণীপনায় মনোনিবেশ করলে। সে গৃহিণীপনা শান্ত এবং অনুচ্ছল না হতে পারে। ভরা বর্ষার উন্মত্ত নদীর মতো :তাতে উপদ্রব থাকতে পারে। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা চলে না। পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জায়, ছেলেমেয়েগুলির দেহশ্রীতে তার পরিচয় এতই স্পষ্ট। এমন কি এই ক'মাসে বনমালীর শুষ্ক দেহেও একটুখানি নেয়াপাতি ভুঁড়ির উন্মেষ হয়েছে। এ নিয়ে বন্ধুমহলে আজকাল তাঁকে কিছু কিছু বিদ্রূপও সইতে হয়।

বনমালী হাসেন।

কাঞ্চনমালার হাতের রান্না সুরবালার মতো এমন সুন্দর ছিল না। তার খাওয়ানোও ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তাতে আন্তরিকতা যদি বা ছিল, এত যত্ন ছিল না। আর এ যেন সুরবালার গৃহে তার প্রাত্যহিক নিমন্ত্রণ।

কিন্তু এত করেও সুরবালার মনের ভয় যায় না।

কে জানে তার এ গৃহিণীপনা কতদিনের। কবে হয়ত শুনবে, বনমালীর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। একে বনমালীর বুড়ো বয়সের বিয়ে, তাতে এ কালের মেয়ে, নিতান্ত ছোট মেয়ে তো আর আসবে না! বিয়ের পর সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে বেশি দিন হয়তো তার লাগবে না।

তখন?

আবার যে-কে-সেই। দুবেলা মুখ-ঝামটা খেয়েও এই ছেলেমেয়েগুলি তাকে মা বলে ডাকবে। তারই পিছু পিছু ঘুরবে। সুরবালা উদয়াস্ত খাটবে-খুটবে, ফরমাস মতো রাঁধবে-বাড়বে। কিন্তু সুমুখে বসিয়ে কাউকে খেতে দিতে পারবে না। সেই যেমন কাঞ্চনমালার রাজত্বে ছিল। যেমন তার দেবরের সংসারে ছিল। অথচ সুমুখে বসিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন করে মেয়েমানুষ যদি খাওয়াতেই না পারে, তবে আর তার ইহজীবনে রইল কি?

তাই এত সুখেও সুরবালার সুখ নেই। তার কেবলই ভয় করে, তার দুর্ভাগ্যে এত সুখ বুঝি সইবে না!

এই ভয় ক্রমে উপসর্গে পরিণত হল।

বাইরের ঘরে বনমালীকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরিহাস করতে শুনলেই সে সব কাজ ফেলে রেখে আড়ি পেতে শোনে, কি কথা হচ্ছে। কোনো অপরিচিত লোককে

আসতে দেখলেই ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। কে যে কি মতলবে আনাগোনা করে কে বলতে পারে। বনমালীর মনের মধ্যেই যে ধীরে ধীরে কি আকাঙ্খা দানা-বেঁধে উঠছে, তাই বা কে জানে ?

অবশেষে কৌশলে একদিন সুরবালা নিজেই কথাটা পাড়লে।

সুরবালা সেদিন অনেক যত্নে একটা নতুন তরকারি রেঁধেছিল। তার আস্বাদ গ্রহণ করে বনমালী পুলকিত চিত্তে বললেন, তুই রাঁধিস বড় চমৎকার সুরো। সবাই বলছে, তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার শরীর সেরে উঠেছে।

—আচ্ছা, হয়েছে !—বলে লজ্জায় আনন্দে সুরবালা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ওর লজ্জা দেখে বনমালী হেসে ফেললেন।

বললেন, সত্যি রে। লোকের কথা ছেড়ে দে, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি।

—ছাই পারছ !

বলে রান্নাঘর থেকে আর একটু তরকারি এনে ওর পাতে দিলে।

একটু পরে বেশ ভব্যযুক্ত হয়ে বললে, আমার মামাশ্বশুরের একটি মেয়ে আছে, বেশ বড়-সড়। হাসছ যে, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

হাসি থামিয়ে বনমালী বললেন, বিশ্বাস হবে না কেন ? অনেকের মামাশ্বশুরেরই তো বড় মেয়ে থাকে। তারপর কি হল বল।

—বলছিলাম কি তুমি অমত কোরো না। আমি বিয়ের জোগাড় করি। যদি দেখতে যেতে চাও তো—

—কিছু দরকার হবে না। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে সুরো ? আমি এই বয়সে বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে ?

—এ বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না ?

—করুকগে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যদি বউ নিয়ে সংসার করাই থাকত, তাহলে পর পর দুটো বউ মরবে কেন ?

—তাই বলে,

সুমুখের ভাতগুলো তাড়াতাড়ি কোলের দিকে টেনে নিয়ে বনমালী বললে, না, না, সুরো। ওসব পাগলামী করিস নে। যে কটা দিন বাঁচি, এমনি ভালো ভালো রান্না রেঁধে খাওয়া, ছেলেপুলেদের দেখ-শোন। ব্যাস্ !

বনমালীর কথা শুনে সুরবালা খুশি হল, কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারল না। পুরুষ মানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ ! তাদের যত দরদ সংসারের উপর,

তত দরদ ছেলেমেয়েদের উপর! তারা যে কি চায় তা নিজেই জানে না। পুরুষমানুষকে সে বয়স্ক শিশু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। শিশুর মত তাদের চিন্তারও সামঞ্জস্য নেই। বুদ্ধিরও স্থিরতা নেই।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে বনমালীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হল। বন্ধু-বান্ধব তো আছেই, সেদিন মুখুয্যে-গিন্নিও এ নিয়ে যথেষ্ট অনুরোধ করে গেলেন।

বললেন, ব্যাটা ছেলে বিয়ে করবে না, এই কি কখনও হয় ঠাকুরপো? কি বল সুরো?

শান্তকণ্ঠে সুরো বলল, তোমরাই বল বৌদি। আমি বলে-বলে হয়রান হয়েছি।

বনমালী হেসে ফেললেন। বললেন, হয়রান হয়েছিস তো আবার ওঁকে ডেকে এনেছিস কেন?

এই প্রসঙ্গ ওঠা-মাত্র সুরবালার মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য না করেই মুখুয্যে-গিন্নি বললেন, আমাকে কেউ ডেকে আনেনি ভাই, আমি নিজেই এসেছি, পাড়াশুদ্ধ লোককে জিগ্যেস করে দেখ, আমি উচিত কথা বলছি কি না।

বনমালী হাত জোড় করে বললেন, পাড়াশুদ্ধ লোককে জিগ্যেস করতে হবে না বৌদি। কিন্তু আপনিই বলুন আমার বয়সটা কত?

—কত শুনি?

—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা অস্ফুট শব্দ করে মুখুয্যে গিন্নি সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলি কথা? পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে! পঞ্চাশ বছর আবার ব্যাটাছেলের একটা বয়েস নাকি?

মুখুয্যেগিন্নির বোধহয় কোন স্বার্থ ছিল। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। পিসিমার চোখের জল ব্যর্থ হল। এমন কি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলও একে একে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর দলও হাল ছেড়ে দিল।

এমনি করে প্রতিপক্ষ দলের সর্বদিকের আক্রমণ বনমালী প্রতিহত করলেন সত্য। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরেও গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বনমালীর মনোদুর্গের কতখানি ক্ষতি করে দিয়ে গেল তা তখন টের পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কিছুদিন পরই টের পাওয়া গেল।

বনমালী তখন রোগশয্যায়।

সাধারণ জ্বর। কঠিন কিছু নয়। কিন্তু উত্তাপ ৯৯ ছাড়লেই বনমালীর আর জ্ঞান থাকে না। গানে বক্তৃতায় হাসিতে কান্নায় চিৎকারে তিনি বাড়ি শুদ্ধ লোককে অস্থির করে তোলেন।

সুরবালা একা মেয়ে, কি করবে? তবু ওরই মধ্যে দশবার এসে ওষুধটা খাইয়ে যায়, সাগুর বাটিটা এনে মুখে ধরে, দুটো ফল কুটে দিয়ে যায়। কখনও একটু বসে মাথায় বাতাসও করে। আসলে ছেলেগুলো হয়েছে দুষ্টুর শিরোমণি। সুস্থ অবস্থায় বাপের কাছে গিয়ে যদি বা একটু বসত, এখন আর কেউ তাঁর ছায়া মাড়ায় না। সুরবালা সে জন্যে তাদের তিরস্কারও করে, যদিও জানে শিশুর মন রোগীর কাছে কিছুতে বসে না।

এমনি একটা সময়ে কদিন রোগ ভোগের পর বনমালী একদিন সুরবালাকে ডেকে বললেন, তোর সেই মামাশ্বশুরের মেয়ে না কে আছে বলছিলি সুরো, সেইখানেই বরং চেষ্টা কর। আর তো কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু এই অসুখের সময় স্ত্রী না হলে…

সুরবালার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় উড়ে গেল।

বনমালী বলতে লাগলেন, রাত্রি কি করে কাটে আমিই জানি। তেষ্টায় মরে গেলেও এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নেই। ছেলেমেয়েগুলোও এমনই হারামজাদা হয়েছে যে, কেউ একটা উঁকি মারে না। সত্যি বলছি তোকে, আমার আর বিয়ের বয়েস নেই, সে ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তাই বলে এমন বেঘোরেও তো মরতে পারব না। রাত্রে একা থাকি, যদি মরেও যাই, ভোর না হলে একটা খবর পর্যন্ত কেউ পাবে না।

সুরবালার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। নিজেকে সামলাবার জন্যে সে দরজার একটা পাটি শক্ত করে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বনমালী আপন মনেই বলে চললেন, এখন বুঝছি, তোদের সকলের কথা অমান্য করে ভালো করিনি। তা সে যা হবার হয়েছে, এখন তুই যা খুশি কর আমি বাধা দোব না।

সুরবালা কঠিন ভাবে হাসলে। বললে, সে তো পরের কথা দাদা। এখনই তো আর তোমার বিয়ে হতে পারে না। বউও কিছু এখনই এসে তোমার সেবায় বসে যেতে পারবে না।

নিজের অশোভন ব্যগ্রতায় লজ্জিত হয়ে বনমালী বললেন, না, না, সেই পরের কথাই বলছি।

সুরবালা নিঃশব্দে রান্না ঘরে ফিরে এল।

ভালো তরকারি রান্নার আগ্রহ আর তার নেই। কিন্তু এই কয় মাসের স্বাধীন এবং অবারিত গৃহিণীপনার যে স্বাদ সে পেয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি করে? আনন্দসরোবরের জলে নেমে আবার সে ফিরে যাবে তার পুরাতন পচা নরককুণ্ডে?

সুরবালার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বনমালী বিয়ে করবার জন্য মনঃস্থির করেছেন। তাঁকে সে ভালো করেই জানে। এর অর্থ, একবার তাঁর সেরে উঠতে যা দেরি। তারপর সবচেয়ে কাছে যে দিন পাওয়া যাবে সেই দিনেই বিবাহ স্থির হবে। তারপর নববধূ আসবে। হয়তো সে কাঞ্চনমালার মতো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, নয়তো সদয় ব্যবহারই করবে। কিন্তু এই অনুগ্রহেরই বা অর্থ কি? উভয় ক্ষেত্রেই তার অবস্থা পরিচারিকা অথবা আশ্রিতা আত্মীয়ার উপরে তো আর উঠবে না।

হায় ভগবান! যদি সুরবালাকে বনমালীর আত্মীয়া করেই পাঠিয়েছিলে, আরও নিকটতর আত্মীয়া করে পাঠাওনি কেন? তা হলে বনমালীর অসুখে আরও বেশি শুশ্রূষা করা সম্ভব হত। রাত্রে তার নির্জন রোগ শয্যায় একাকী উপস্থিত থাকাও অসম্ভব হত না। কিন্তু একি!

সুরবালা বনমালীর বড় পিসিমার জা-এর মেয়ে। নিজের জাও নয়, স্বামীর খুড়তুত ভায়ের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই জা বনমালীর বড় পিসিমার আশ্রয়ে ওঠে এবং আরও কিছুকাল পরে তারই হাতে আট বছরের সুরবালাকে সমর্পণ করে স্বামীর অনুগমন করেন। সেই থেকে সুরবালা তার জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ। সেই সূত্রেই বনমালীর সঙ্গে আত্মীয়তা। সেই জ্যাঠাইমা আজ নেই। আছে সুরবালা আর বনমালী, আর সেই ছিন্নতারে নতুন করে জোড়া-তালি দেওয়া আত্মীয়তা। তারই ওপর নির্ভর করে বনমালীর রোগ-শয্যায় রাত্রি কাটানো চলে কি-না সংশয়ের বস্তু।

সমস্ত দিন ধরে সুরবালা কত কি ভাবলে, তার মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই। ছেলেগুলো কে-যে পেট ভরে খেলে, আর কে খেলে না—চোখেও দেখবার সময় পেলে না। খাওয়ার শেষে পিসিমা একটু আচারের জন্যে গলা ভেঙে ফেললেন, তবু পেলেন না। তিন বারের ওষুধ বনমালী দুবারে খেলেন। আর সে নিজে ভাত বেড়ে সে ভাত হাঁড়িতেই ঢেলে রাখলে।

তারপর সন্ধ্যে বেলায় অনেক দিন পরে চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধলে। মুখে একটুখানি সাবানও গোপনে দিলে। রাত্রে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-শুইয়ে

বনমালীর ঘরে এল।

তার পায়ের শব্দে চোখ মেলে বনমালী আশ্চর্যের সঙ্গে বললেন, সুরো?

সুরবালা নিচে মেঝেয় নিজের জন্যে একখানা মাদুর পাতছিল। সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—এইখানে শুবি নাকি?

—হুঁ।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বনমালী বললে, আমি বলতে পারছিলাম না সুরো, কিন্তু জ্বর অবস্থায় একলা শুতে আমার বড় ভয় করে। তোর বৌদিকে কেবল স্বপ্ন দেখি। দেখে ভয় পাই। ভালোই হল তুই এলি।

সুরবালা তার মাথার শিয়রের বালিশটা ঠিক করে দিয়ে ললাটে হাত বুলিয়ে বললে, এখন তো জ্বর নেই। ঘুমোও।

কোমল হাতের স্পর্শে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল। সুরবালার ঠাণ্ডা হাতখানি চোখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে সুরো।

—কি জানি। দশটা বাজে বোধ হয়।

বনমালী আর কিছু বললেন না, শুধু ললাটে, মুখে বুকে পরম আগ্রহে সেই শীতল হাতের স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলেন।

সুরবালা কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেই খানেই বসে রইল।

ভোর বেলা ছেলেরা উঠে দেখলে, সুরবালা বারন্দায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উর্ধ্বমুখে বসে আছে। মুখ মড়ার মতো সাদা। চোখে পলক পড়ে না। দুই কোণে দু'বিন্দু অশ্রু জমে আছে।

ছোটখোকা একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, আমাকে খেতে দেবে না পিসি।

সে ডাকে সুরবালা একবার চমকে উঠল।

তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে বললে, চল।

ক্ষণিকা

আকাশ সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন।

রবিবারের সকাল। কাজের কোনো তাড়া ছিল না! বাইরের সঞ্চরণশীল জনতার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে ছিলাম। কিছু ভালো লাগছিল না।

এমন সময় মেঘের ফাঁক থেকে বিদ্যুতের মতন সেই জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নবেন্দু। পথ থেকে একেবারে আমার ঘরের মধ্যে।

নবেন্দু মোটা মাইনের সরকারী কর্মচারী। আয়েসী লোক। এমন একটা মেঘাচ্ছন্ন সকালে সে যে কোন কারণেই বেরুতে পারে, ভাবতেও পারি নি। তাকে দেখে আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং পুলকিত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম!

—কি ব্যাপার! নবেন্দু? তুমি? এই বাদলার দিনে? বসো, বসো।

হাতের ছাতাটা বন্ধ করে নবেন্দু সন্তর্পণে ঘরের একটা কোণে রাখলে। তারপর পাশের চেয়ারে বসে হাসলে।

বললে, মেয়েটার জন্যে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল। তাই এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই, এতদূর এলাম যদি, একবার দেখাটা করে যাই।

—বেশ করেছ। একটু চা খাবে? ওরে···

চায়ের কথা বলে দিলাম।

নবেন্দু বললে, তাছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ দরকার ছিল।

সে মিটি মিটি হাসতে লাগলো।

বললাম, বলে ফেল।

বললে, তোমার "পান্থনিবাস" বলে একখানা বই আছে না?

—আছে বোধ হয়। তারপর?

—বইখানা পড়লাম।

—বল কি হে! এ যে আমার কাছে দস্তুরমত একটা সংবাদ! তুমি নিজে পড়লে।

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা নয়। বাঙালী কলেজ থেকে বেরিয়ে বই বড় একটা ছোঁয় না। যারা ছোঁয়, তারা ইংরাজী বই-ই ছোঁয়। এ অবস্থায় কেউ একখানা বাংলা বই

পড়েছে শুনলে চমকে উঠতে হয়। কিনে পড়লে ?

নবেন্দু বললে, না. কিনে নয়। গৃহিণী পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার। সেদিন দুপুরে ঘুম আসছিল না। হাতের কাছে বইখানা পেলাম, দেখলাম তোমার লেখা। পড়তে বসলাম। কিন্তু তুমি একটা অন্যায় করেছ।

অবিচলিত ভাবে বললাম, সে আর আমার পক্ষে এমন একটা অসম্ভব কি ?

উত্তরের ভঙ্গিতে নবেন্দু হেসে ফেললে।

বললে, আমাকে নিয়েই বই লিখেছ। সুতরাং আমাকে এক কপি উপহার দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যাক্‌গে, যা বলতে এসেছি শোন।

নবেন্দু বলে কি ! ওকে নিয়ে বই লিখেছি ? ওর সঙ্গে তখন আমার পরিচয়ই ছিল না বোধ হয়। কিন্তু বইখানার প্লট আমার নিজেরই ভালো মনে আসছিল না।

নিরীহ ভাবে বললাম, বল।

—তপনের সঙ্গে শ্যামলীর ফের দেখা হয়েছে।

নবেন্দু আবার আগের মতো মিটি মিটি হাসতে লাগল।

গল্পের প্লটটা মনে করবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, বল কি হে। কোথায় ?

—দেওঘরে। দিন পনেরো আগে।

—Good. এযে চমৎকার একটা গল্পের প্লট। তারপর ? সে যে অনেক দিনের কথা। চিনতে পারলে ?

—আমি পারিনি। পারাও সম্ভব নয়। ওর সেই ছিপছিপে চেহারা আর নেই। বেশ স্থূল হয়েছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে দেখলাম। মুখের সেই ছেলেমানুষি ভাবও আর নেই। কেমন একটা গাম্ভীর্য এসেছে। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই চঞ্চলতা নেই। তাতেও একটু প্রশান্তি এসেছে।

নবেন্দু আবার হাসলে।

বললে, তাতো আসবেই। অনেকদিন হয়ে গেল যে। সেও ছেলেমানুষ থাকতে পারে না, আমিও না। কিন্তু ও আমাকে ঠিক চিনেছিল। পথে দেখা। পাশ কাটিয়ে চলে আসছিলাম। জিগ্যেস করলে, মাস্টারমশাই না ? চমকে উঠলাম। কোনোকালে যে মাস্টারি করেছি, তাও আর মনে পড়ে না। কিন্তু তখনই চিনতে পারলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ?

নবেন্দু বললে, বলছি। কিন্তু তোমার চা কোথায় ?

চা ? চায়ের কথা শ্যামলীর শেষ কথা শোনবার আগ্রহে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, দাঁড়াও দেখি।

চা এল। সঙ্গে আরও কিছু কিছু অনুপান। বোঝা গেল, এইজন্যই চা দিতে দেরি হচ্ছিল।

সেগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, তারপরে ?

নবেন্দু বলতে লাগল :

সেখান থেকে আমাকে ও ওর বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল। মস্ত বড় বাড়ি। অনেক চাকর-বাকর। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে। ঘরের মধ্যে মূল্যবান আসবাবপত্র। ওর নিজেরও গায়ে এক-গা গহনা। দেখলাম, বেশ আছে। বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে কোথাকার এক রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে। বড় ছেলে স্কুলে পড়ছে। আর কি চাও ?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নবেন্দু আমার দিকে চেয়ে হাসলে।

আমি নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েই রইলাম।

নবেন্দু আবার বলতে লাগল :

মহামুস্কিলে পড়েছে। স্বামী কলকাতার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। ডাকের গোলমালে চিঠিপত্রও নিয়মিত পাচ্ছে না। টেলিগ্রামও নাকি সময়ে পৌঁছুচ্ছে না।

বললে, কি করি বলুন তো মাস্টারমশাই ? সেই ডিসেম্বরে এসেছি। এখানকার এই দুরন্ত গরমও কাটিয়েছি। কিন্তু এখন চিঠিপত্র না পাওয়ার ফলে যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেমন আছে সব, তাই বা কে জানে ?

আমার সামনে স্বামীর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে ও যেন হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়ল।

বললাম, ভাবছ কেন ? ভালোই আছেন। দেখছ তো চারিদিকের অবস্থা।

—সেই তো মুস্কিল হয়েছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সবশুদ্ধ কলকাতা পালাই। কিন্তু ঠিক এই সময়ই রেল বন্ধ হল।

—সেই তো আরও মুস্কিল।

—এমন করে আরও কতদিন থাকতে হবে বলতে পারেন ?

হেসে বললাম, জানি না।

বললে, টাকা পয়সা হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। সে যাকগে। কিন্তু এই দেখুন, ছেলেটার পড়া একেবারে বন্ধ। দিনরাত্তির বাগানে প্রজাপতির পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এখানে কি টিউটর পাওয়া যাচ্ছে না ?

—তা যাবে না কেন? একটা রেখেছিও তিরিশ টাকা মাইনে দিয়ে। কিন্তু যাই বলুন না কেন, আমি তো দেখছি স্কুলে না থাকলে ছেলেদের পড়া হয় না।

—সে ঠিক।

—এর উপর আবার উনি ঠিক করেছিলেন, বড় মেয়েটিকেও এখানে আনতে। ভাগ্যিস সে আসেনি। আমি কোনো রকমে আছি। কিন্তু সে কেঁদে-কেটে অনর্থ করত।

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

ও জিজ্ঞাসা করলে, বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয়?

—শুনেছি। হঠাৎ মারা গেলেন, না?

—হঠাৎ ঠিক নয়। ভুগছিলেনই। তবে এত শিগ্‌গির যাবেন একথা কেউ ভাবেনি। ছোট ভাইটি বিলেতে। আমি কলকাতায়। মা একা বাবাকে নিয়ে মধুপুরে। টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা যেদিন গেলাম, তার পরের দিনই মারা গেলেন।

শ্যামলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আমিও নিঃশব্দে বসে রইলাম। মিথ্যা সান্ত্বনার কথা কি বলব?

তখনই ও ভিতরে চলে গেল এবং একটু পরে চা নিয়ে উপস্থিত হল।

তখন সবে সন্ধ্যা।

শ্যামলী হাসতে হাসতে বললে, আপনি কিন্তু আমাকে চিনতে পারেন নি।

লজ্জিত ভাবে বললাম, না।

—খুব মোটা হয়ে গিয়েছি?

—খুব না। তবু

—তবু হয়েছি অনেকটা। সে তুলনায় আপনার পরিবর্তন ঢের কম। আমি দেখেই চিনেছিলাম।

—চিনতে আমিও পারতাম। আসল কথা,

বাধা দিয়ে ও বললে, যাক্‌গে। আসল কথাই জিগ্যেস্ করা হয়নি। কোথায় উঠেছেন?

এতক্ষণ পরে আমার একটা হাসবার উপলক্ষ্য হল।

বললাম, সে একটা হাসির কথা। এখানে আমারও একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। ডিসেম্বরে আমিও মেয়েছেলে পাঠালাম। তারপরে আজ শীত, কাল গরম, পরশু বৃষ্টি-- এমনি করেই চলছিল। ইতিমধ্যে ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। চিঠি লিখি, জবাব পাই না। টেলিগ্রাম করি, তারও সেই অবস্থা। অবশেষে কদিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপরে কেমন করে এলাম জান?

আমার কথা ও যে ভালোভাবে শুনছিল, তা মনে হল না।

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়ে বললে, না।

—খানিকটা রেলে, খানিকটা মোটর বাসে, বাকিটা হেঁটে!

নিজের রোমাঞ্চকর অভিযানে গর্বিত ভাবে হাসলাম।

ও বললে, খুব কষ্ট হয়েছে তো তাহলে?

বললাম, তাই কি কষ্টের শেষ হয়েছে? এসে দেখি বাড়ি খালি। মালী বললে, এক বাবু এসে মা-জীদের দুমকা নিয়ে গেছেন। সেখানে আমার শালা থাকে। বুঝলাম, ব্যাপার দেখে সেই এসে নিয়ে গিয়েছে।

শ্যামলী ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল।

বললে, সে কি! তাহলে এখানেই আপনি খাবেন। বেশ লোক তো আপনি!

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না। কিছু দরকার হবে না। শোন, বলছি;

কিন্তু ও ফিরেও চাইল না। ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বললে, আপনার বাসাটা কোথায় বলুন। মালী গিয়ে খবর দিয়ে আসবে, বাসায় আপনি আর ফিরবেন না।

ব্যস্তভাবে বললাম, সে কি! কাল সকালেই আমাকে দুমকা যেতে হবে যে!

—বেশ তো সকালেই যাবেন।

শ্যামলী একজেদী ছোটবেলা থেকেই।

গল্প ক্রমেই জমে আসছে।

বললাম, আর এক পেয়ালা চা হোক নবেন্দু?

নবেন্দু বললে, আপত্তি নেই। কিন্তু এবারে যেন আর অনুপান না থাকে।

আমি উঠছিলাম। কিন্তু পর্দা অন্তরালে চুড়ির শব্দে বুঝলাম, তার প্রয়োজন নেই।

সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, তারপরে বল।

নবেন্দু বলতে লাগল:

খাওয়ার সময় শ্যামলী কাছে বসে যখন খাওয়াতে লাগল, তখন বেশ লাগছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শোবার ঘরে খাটে এসে বসে, সিগারেট খাচ্ছি, একটু পরে পান মুখে নিয়ে শ্যামলী এল।

খাটের থেকে দূরে একটা নিচু টুলে বসে বললে, আপনার সঙ্গে আর কখনও

যে দেখা হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। খুব আশ্চর্যভাবে দেখা হয়ে গেল, না?

—সত্যি। তোমার কথা আমি কিন্তু অনেক সময় ভেবেছি।

শ্যামলী হেসে ফেললে।

বললে, মিথ্যে কথা রাখুন। ছেলেপুলে কি?

—দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে।

—মেয়েটি বড়?

—না, ছেলেটি।

—পড়ছে?

—হ্যাঁ।

—বড় মেয়ের এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।

—না।

—দুমকাতেই কি আপনার শ্বশুরবাড়ি?

—না, শালা সেখানে চাকরি করেন।

শ্যামলী এ প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের বিয়ে হবে না শুনে, কি কান্না তুমি কেঁদেছিলে মনে আছে?

—আর আপনি?

—আমিও কেঁদেছিলাম।

ও অন্যদিকে চেয়ে কি যেন মনে করে হাসলে।

বললে, এখন মনে হয় ছেলেমানুষী, না?

—হ্যাঁ—আমিও হাসলাম।

আমার সামনের টি-পয়ে ডিবে-ভর্তি পান এবং এক কৌটো জর্দা।

বললে, আপনি পান খাচ্ছেন না যে?

—পান তো আমি বেশি খাই না।

—জর্দা?

—একেবারেই না।

—কিন্তু আগে খুব খেতেন মনে হচ্ছে যেন।

—তোমার ভুল হচ্ছে।

কি যেন চিন্তা করে শ্যামলী বললে, তা হবে। আপনার আগে আর একটি বুড়ো মাস্টার ছিলেন, তিনিই খেতেন বোধ হয়। যেদিন পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা হত, তাঁকে প্রচুর পান-জর্দা ঘুস দিয়ে নিষ্কৃতি পেতাম!

শ্যামলী হাসতে লাগল।

বললে, ঠিক। আপনি নয়, সেই বুড়ো মাস্টার। অথচ আপনি খেতেন ভেবে এক কৌটো জর্দা আনলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদিকে তোমার মনে পড়ে?

—বাঃ। তাঁকে মনে পড়বে না? কেমন আছেন তিনি?

—বছর খানেক হল মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! আহা! কি হয়েছিল? ছেলেপুলে কি?

টাইফয়েড হয়েছিল। ছেলেপুলে অনেকগুলি। বোধ করি আট-নটি।

—আহা!

শ্যামলী নিঃশব্দে বোধ করি বৌদির কথাই ভাবতে লাগল। হঠাৎ বললে, আপনার দাদা কি আবার বিয়ে করেছেন?

উত্তর দিতে লজ্জা পেলাম। মাথা নিচু করে বললাম, মাস ছয়েক হল করেছেন।

কিন্তু ও যেন তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিরক্ত হল না।

বললে, বেশ করেছেন। নইলে অতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিব্রত হতেন।

তারপরেই বললে, ডুমকা থেকে আপনি কলকাতায় ফিরবেন তো?

—ফিরতেই হবে। চাকরী।

বললে, আচ্ছা। ঠিকানা দিলে ওঁর সঙ্গে দেখা করার আপনার সুবিধা হবে?

—কেন হবে না?

—আর কিছু নয়। ওঁর আবার সায়টিকা আছে। যখন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, পাঁচ-সাত দিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। কেউ তো নেই সেখানে। ঠাকুর আর চাকর। চোদ্দ দিন চিঠি পাইনি। ভাবছি, কেমন যে আছেন।

ও করুণ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললাম, আমি গিয়েই দেখা করব। তুমি কিছু ভয় পেও না। ডাকের গোলমালেই বোধ হয়,

—আমারও তাই মনে হয়।

হঠাৎ পাশের ঘরে যেন একটা অব্যক্ত গোঙানির শব্দ উঠল। আমি চমকে উঠেছিলাম।

শ্যামলী হেসে বললে, ও কিছু নয়। খোকাটা সারাদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে। আর রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখে চ্যাচায়। কিন্তু রাত হয়েছে, এবার আপনি ঘুমোন।

ও চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ডাকলাম, শ্যামলী!

আমার কণ্ঠস্বরে ও যেন চমকে উঠল। কিন্তু তখনই শান্তস্বরে বললে, না, আর শ্যামলী নয়। এবার ঘুমোন। রাত্রি অনেক হয়েছে।

ঘড়িতে দেখি, রাত তখন দুটো। চারিদিক নিস্তব্ধ। শ্যামলীর ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল। ধমক-খাওয়া শিশুর মতো আমিও শুয়ে পড়লাম।

এই পর্যন্ত বলে নবেন্দু চুপ করল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই শেষ? আর কিছু নেই?

নবেন্দু বললে:

পরের দিন সকালে যখন বেরুচ্ছি, আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে, এটা নিয়ে যান।

দেখি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"। কুড়ি বছর আগে ওর জন্মদিনে খুব গোপনে উপহার দিয়েছিলাম।

ব্যথিত কণ্ঠে বললাম, ফিরিয়ে দিলে?

হেসে বললে, যাকে দেওয়া হয়েছিল সে কবে ফুরিয়ে গেছে। আমার কাছে পড়ে থেকে কি হত?

বললাম, কিন্তু যে দিয়েছিল তাকেই বা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়?

একটু ভেবে সে বললে, সে ঠিক।

বইখানা তার বড় ছেলেটিকে দিয়ে চলে এলাম।

নবেন্দু একটা সিগারেট ধরালে।

খানিক পরে বললে, আচ্ছা, তুমি তো বই-টই লেখ। বলতে পারো মানুষকে ভালোবাসার কোনো অর্থ হয়?

আমি চুপ করে রইলাম।

নবেন্দু বললে, মনে কর নদী। সে তো জল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেই জল অহর্নিশি বয়ে চলেছে। তার ধারা বদলাচ্ছে। তেমনি তো মানুষ। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার এক একটি জীবন। ধর শ্যামলী। সেদিন তাকে প্রায় চিনতেই পারলাম না। তাহলে কুড়ি বছর আগে সেদিন একান্ত করে যাকে ভালোবেসেছিলাম, সে কে? কোথায় বা গেল?

নবেন্দু আবার জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে কি ভালবাসা জীবধর্মের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়? নইলে সেদিন রাত্রে অমন করে ওকে ডেকেছিলামই বা কেন?

এ প্রশ্নেরও উত্তর আমার জানা নেই। আমি চুপ করেই রইলাম।

আগুন

ভীম অর্জুন দুই ভাই যখন গ্রামে এসে পৌঁছুল তখন দুপুর বেলা। ভাদ্রের দুপুর। চিড় বিড করছে রোদ। রোদের স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে। মাথায় গামছা জড়িয়ে ওরা দু-ভাই গ্রাম-প্রান্তে দীঘির বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। মুখ রক্তাভ। মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গে দরবিগলিত ধারায় ঘাম ঝরছে।

শ্রান্তভাবে ওরা শিকড়ের উপর বসল। মাথার গামছা খুলে সর্বাঙ্গ এক-বার বেশ করে মুছে নিলে।

ঘাট নির্জ্জন।

শুধু একটা রোঁয়া-ওঠা, হাড়-বের-করা কুকুর তাদেরই অদূরে শ্রান্ত-ভাবে শুয়ে ছিল। তার পেটটা পিঠের সঙ্গে ঠেকেছে। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের পাঁজর-গুলো হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠছিল। কুকুরটা একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আবার নিঃশব্দে ঝিমুতে লাগল।

নির্জ্জন ঘাটের দিকে চেয়ে ভীম বললে, দেখছিস?

অর্জুন বললে, হুঁ।

অর্থাৎ শহর থেকে বেরুবার সময় ওরা যে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে এসেছিল, শূন্য ঘাটের দিকে চেয়ে সেই কথাটা পরস্পর আর একবার ঝালিয়ে নিলে।

দীঘির ঘাট নির্জ্জন বড় একটা থাকে না। বিশেষত এই দুপুরে, স্নানের সময়। ওদিকের ঘাটে মেয়েছেলের, এদিকের ঘাটে পুরুষের ভীড় লেগেই থাকে। বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর। ওঘাট থেকে মোক্ষদা পিসির কাংস্য কণ্ঠ শোনা যায়। এঘাট বিবিধ সামাজিক ও আইনগত সমস্যার সমাধানে মুখর থাকে। এক যাচ্ছে আর আসছে। কিন্তু আলোচনার ধারা অব্যাহত চলেছে। এই বটগাছের শিকড়ে তুমি যদি একঘণ্টা বসে থাক তাহলে গ্রামের সেদিনের একটা মোটামুটি ইতিহাস সংগ্রহ করতে পার

সেই ঘাট নির্জ্জন।

ভীম বললে, না ফিরলেই হত।

অর্জুন বললে, দেখি তো।

অর্থাৎ তেমন তেমন বুঝলে চলে গলেই হবে। কেউ তো তাদের পা বেঁধে রাখে নি!

কিন্তু ঘাটে লোক নেই কেন ?

সবাই কিছু মরে নি, সবাই কিছু গ্রাম ছেড়ে পালায়ও নি। যারা রয়েছে তারা কি স্নান ছেড়ে দিয়েছে ? কিংবা ওই কুকুরটার মতো পড়ে পড়ে ধুঁকছে ?

ভীম পিছনের বাগদী পাড়াটার দিকে দৃষ্টিটা সার্চ-লাইটের মতো ঘুরিয়ে নিলে।

কতকগুলো ঘর বর্ষায় পড়ে গেছে। যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারও অনেকগুলি পড়ো-পড়ো। চালে অতি পাৎলা ছাউনি। মড়ার হাড়ের মতো চালের বাঁকারিগুলো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। পাড়ায় প্রাণ-স্পন্দনের কোনও চিহ্ন নেই।

• ভীম বললে, দেখছিস ?

অর্জুন সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

সেই বাগদী পাড়া !

ওদের দুই ভাই-এর এইটেই ছিল আড্ডা। এদের নিয়ে বোলানের দল গড়ত। সন্ধ্যেবেলায় এদের সঙ্গে বসে তাড়ি খেত। আর সারারাত্তির ঢোল বাজিয়ে বোলানের বৈঠক দিত। চাঁদিনী রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে কী সমারোহই না হত !

তারপরে সৌরভী।

চাঁদিনী রাত্রের দীঘির জলের মতো কাজলা তার রং। অমনি চঞ্চল, অমনি উচ্ছল, তার তরঙ্গিত হাসি পরিপুষ্ট ঠোঁটের তটপ্রান্তে এসে যেন ভেঙে ভেঙে পড়ত।

সেই সৌরভী। যার জন্যে ওরা দুই ভাই চব্বিশ ঘণ্টা বাগদী পাড়াতেই পড়ে থাকত। কে জানে সে আছে, না মরেছে। দীঘির সেই কাজল কালো জল নেই। পানা পচে কেমন একটা লালাভ রঙ হয়েছে। হয়তো সৌরভীও নেই।

অর্জুন বললে, চল, বাড়ি যাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীম বললে, হ্যাঁ। চল্ যাই।

গ্রামের অবস্থা দেখে ওদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। গ্রামে যেন লোক নেই। অবশ্য ওরা দু-ভাই দেড় বৎসর পরে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে শুনে সারা গ্রামের লোক দীঘির ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে এ প্রত্যাশা ওরা করেনি। চোর ডাকাতকে কে কবে অভ্যর্থনা করে ? তবু দীঘির ঘাটে কিংবা গ্রামের পথে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কেউ তাদের কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, এও তাদের প্রত্যাশার বাহিরে ছিল।

হন্ হন্ করে নিঃশব্দে পথ ভেঙে এসে তারা বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজা বন্ধ।

বন্ধ থাকারই কথা। একদিন তারা ছিল পাঁচ ভাই, এক বোন। ভাই নয়, যেন বন্ধু। লোকে বলতো পঞ্চ পাণ্ডব। বলশালিতার জন্যে এ অঞ্চলে তারা বিখ্যাত ছিল। দুর্দান্ত ডাকাত বলে সবাই তাদের সমীহ করে চলত।

পাঁচ ভাই-এর মধ্যে তিনজন গেছে পরলোকে,—যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব। বোন তরঙ্গিনীর বিবাহ দিয়েছিল। কিছুদিন পর বিধবা হয়ে সেও এসে দাদাদের সংসারে আশ্রয় নেয়। ভীমার্জুনের জেল হতে সেও চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি।

সুতরাং দরজা বন্ধ থাকারই কথা।

হয়ত পাশের বাড়িতে চাবি রেখে গেছে। কিন্তু এই সময় ডাকাডাকি করে চাবি আনতে তাদের মন সরল না। পাঁচিল টপ্‌কে দুজনায় ভিতরে প্রবেশ করলে। এই পথটাই তাদের কাছে বেশি সহজ।

ভিতরে ঢুকে ওরা থমকে গেল।

বাড়ির কী শ্রী!

বর্ষার জল পেয়ে উঠানে বড় বড় ঘাস হয়েছে। দাওয়ার উপরে চালের খড সরে উড়ে গেছে। জলে ভেজা স্যাঁৎসেঁতে দাওয়া খড়ের কুটিতে জঞ্জালে ভর্তি। দুচারটে ধানের গাছও হয়েছে। ঘরের দরজাগুলো নড়-বড় করছে। তালায় মরচে পড়ে গেছে।

একটা টান দিতেই তালাটা ভেঙে গেল।

কেনই বা তালা দেওয়া! ঘরের মধ্যে কিছুই নেই। ইঁদুরে ঘরময় মাটি খুঁড়েছে। কটা শূন্য হাঁড়ি মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর একটা তালপাতার তালাই এক কোণে জড় হয়ে পড়ে আছে।

খাবার ইচ্ছে ওদের ছিল না। স্টেশনে খেয়ে এসেছিল। কিছু বেঁধেও এনেছিল। কিন্তু সে ওদের ছুঁতেও ইচ্ছা করছিল না। কেবল জল তৃষ্ণা পাচ্ছিল। কিন্তু জল কোথায়?

অর্জুন বললে, চলো দাদা, পুকুরে নেয়ে আসি। সেই সঙ্গে জলও খেয়ে আসা যাবে।

দাওয়ায় তালাইটা পেতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ভীম পা ছড়িয়ে বসে ছিল। ওঠবার তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্নানের নামে উঠে বসল।

বললে, তাই চল। একটা কলসী নে, আসবার সময় জল আনা যাবে। জল

না পেলে তো বাঁচব না বাপু।

পুঁটলি খুলে গামছা বের করে ওরা চললো পুকুরে।

ভীম বললে, এই রোদে আর দীঘি গিয়ে কাজ নেই। নতুন পুকুরে চল বরং।

—বেশ।

সেই জনশূন্য পথ। শুধু মুখুজ্যে গিন্নি দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে ছিল।

খুন খুনে বুড়ি! মাথার ছোট ছোট চুল শনের নুড়ির মতো হয়ে গেছে। পরনে একখানি আধ-ময়লা ছেঁড়া ছোট্ট কাপড। লোকে বলে বুড়ির হাতে টাকা আছে। ভগবান জানেন, আছে কি নেই। কিন্তু স্নেহেই হোক আর ভয়েই হোক, বুড়ি এই দুর্দান্ত দুই ভাইকে খুব খাতির করত। মাঝে মাঝে লক্ষ্মী-জনার্দনের প্রসাদ পাবার জন্যে নিমন্ত্রণও করত।

দূর থেকে বুড়িকে দেখে ভীম হেসে বললে, বুড়ি এখনও মরেনি রে!

অর্জুনও হাসলে।

কাছে এসে ওরা বুড়িকে প্রণাম করে বললে, ভালো আছেন কত্তাঠাকরুণ?

—কে রে? চোখে আজ কাল ভালো দেখতে পাচ্ছিনা। চেনা গলা মনে হচ্ছে। কে তোরা?

—আমরা ভীম-অর্জুন কত্তাঠাকরুণ।

—কবে এলি? ভালো আছিস তো? উঠে বোস।

—আর বসব না কত্তাঠাকুরুণ। চান করে আসি।

বুড়ো হলে বকুনি একটা ব্যাধিতে দাঁড়ায়। মুখুয্যে গিন্নীর ইচ্ছা ছিল ওদের সঙ্গে খানিক গল্প করা। কিন্তু ওরা আর দাঁড়াতে পারল না।

পুকুর-ঘাটে আঁজলা আঁজলা জল খেলে। খুব খানিকটা হুস হুস করে স্নান করলে। অনেক দিন পরে অবগাহন স্নান,—দেহ জুড়িয়ে গেল।

তারপরে বাড়ি ফিরে এসে সেই নোংরা দাওয়াতেই তালাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা আর নেই।

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ভীমের মনে হল, কে যেন বাড়ির ভিতরে ঘোরাঘুরি করছে।

ভীম ধড়মড় করে উঠে বসল।

—কে রে?

শীর্ণ নারী-কণ্ঠে উত্তর এল, আমি।

অর্জুন পাশে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ভীমেরও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আরক্ত চোখে তার মনে হল প্রেতের মতো একটা ছায়ামূর্তি উঠান থেকে দাওয়ার দিকে আসছে।

ভীম আবার হাঁকলে, আমি কে?

মেয়েটি একগাল হেসে বললে, আমি গো। সৌরভী। চিনতে পারছ না নাকি? চশমা আনব?

আশ্বস্ত কণ্ঠে ভীম বললে, সৌরভী? আমি ভাবলাম……বোস। কেমন আছিস?

—দেখতেই পাচ্ছ।

হ্যাঁ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে: ওর সেই কালো এলো চুল আর নেই। জট পাকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। চোখ কোটর-প্রবিষ্ট, রক্তহীন। গালের হনু উঁচু হয়ে উঠেছে, গাল ভেঙে গেছে। প্যাকাটির মতো সরু-সরু হাত পা। গায়ের মসৃণ চামড়া জড়ো-জড়ো এবং হাত-পায়ের তলা হলদে হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় চল্লিশ বছরের বুড়ি।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে ভীম বললে, জ্বর হয়েছিল? ম্যালেরিয়া?

—ম্যালেরিয়া তো আছেই গো। তার ওপর খেতে পাই না যে।

সৌরভীর কথা বলার ভঙ্গিটাও যেন কি রকম। ভীমের মনে হল ওর মাথাটা বোধ হয় ঠিক নেই।

ভীমের মনটা ভারি নরম হয়ে গেল।

বললে, খাবি কিছু?

কুণ্ঠিত ভাবে সৌরভী বললে, তুমি কোথায় পাবে?

—আছে। দিই, দাঁড়া।

পুঁটলি খুলে ভীম কতকগুলো মুড়ি, মুড়কি, তেলে ভাজা এনে ওর আঁচলে ঢেলে দিলে। সেগুলো দেখে সৌরভীর চোখ যেন জ্বলে উঠল। তিলমাত্র বিলম্ব না করে সেগুলো সে গিলতে লাগল।

ভীম বললে, কি করে জানলি আমরা এসেছি?

কথা বলবার সৌরভীর ফুরসুৎ ছিল না। কোনো রকমে শুধু বললে, মুখুয্যে বুড়ি!

—দরজা খুললি কি করে?

সৌরভী আঁচলের খুঁট দেখালে। অর্থাৎ চাবি তার হাতেই তরঙ্গিণী

দিয়ে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে সৌরভীর সম্পর্ক এ গ্রামে গোপন কারও কাছে নেই,—তরঙ্গিনীর কাছেও নয়। গ্রামে এত লোক থাকতে তাই সে ওর কাছেই চাবিটা রেখে গেছে।

খাওয়া শেষ হতে সৌরভী জিজ্ঞাসা করলে, জল আছে?

ভীম ওর হাতে জল ঢেলে দিলে। ও ঢক ঢক করে এক পেট জল খেয়ে নির্জীবের মতো খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

তারপরে বললে, উঠোনে জঙ্গল হয়েছিল। ভাবলাম, তোমরা তো ঘুমুচ্ছ। এই সময় ওগুলো সাফ করে ফেলি।

সৌরভী উঠোনের দিকে চেয়ে ম্লান হাসলে।

ভীমের মন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হয়ে আসছিল। বললে, এই রোগা শরীরে তুই ওসব করতে গেলি কেন?

সৌরভী হেসে বললে, চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

ভীমও হাসলে।

একটু পরে বললে, খাটিস তবু খেতে পাসনা?

সৌরভী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, কাজ কোথা যে খাটব? মাঠে ধান নেই, কাজও নেই। ভদ্রলোকে নিজেই খেতে পায় না, লোক রাখবে! কাজ নেই গো, তাই উপোস করি।

—তুই আমাদের কাজ করবি? মাইনে দিতে পারব না বাপু, দু'বেলা দুটো খাবি দাবি থাকবি।

সৌরভীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বললে, সত্যি?

ভীম বললে, আমরা যদি দুটি খেতে পাই, তুইও পাবি। নইলে,

ভীম বুড়ো আঙুল নাড়লে।

সৌরভী হেসে বললে, নইলে লবডঙ্কা, কি বল?

—হ্যাঁ। থাকবি?

থাকব না কি গো? শুনছ খেতে পাই না। বলে, 'মেধো' ভাত খাবি? না, হাত ধুয়ে বসে আছি।

সৌরভী হেসে গড়িয়ে পড়ল।

দেশের অবস্থা দেখে অর্জুনের একটা দিনও গ্রামে থাকতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভীম জেদ ধরলে।

বললে, আরে আমরা দু'ভাই যদি পালাই তাহলে থাকবে কে? দেখি

তো, শেষ পর্যন্ত কি হয়!

ওরা রয়ে গেল। সেই সঙ্গে সৌরভীও।

ওরা রাঁধে-বাড়ে, সৌরভীকেও ভুটি দেয়। সৌরভী ওদের ঘর দোর মোছে, বাসন মাজে। ফাইফরমাস খাটে। জেলে যাবার আগে ভীম অর্জুনের কিছু টাকা মাটিতে পোঁতা ছিল। অন্য সময়ে তাতেই ওদের কিছুদিন বেশ চলে যেত। কিন্তু সেদিন আর নেই। চল্লিশ টাকা চালের মণ হলে তাতে আর ক'দিন চলতে পারে?

তবু চলে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বর্ষা নামল। প্রবল বর্ষা,—সাতদিন ধরে একাদিক্রমে। মাঠ ঘাট ভাসতে লাগল। গ্রামের জল বেরুতে পারে না। পথে পথে এক হাঁটু জল। সেই জলে মাটির ঘর যে কত পড়তে লাগল তার আর ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে প্রাচীরগুলো পড়ে যাওয়ায় কারও বাড়ির আর আব্রু রইল না।

এদিকে চাল ভেদ করে ঘরের মেঝেয় জল পড়ে। লোকে জিনিসপত্র যে কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। উনানে জল জমে গেছে, উনান ধরানো যায় না। ধরাবেই বা কি দিয়ে? মাচা করে শুকনো কাঠ-কুটো যে যা সঞ্চয় করে রেখেছিল, সব ভিজে গেছে।

সর্বোপরি চাল নেই।

এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে কেউ চাল তৈরি করতে পারছে না। না পারছে সিদ্ধ করতে, না পারছে রোদ্দুরে শুকোতে। চাল হবে কি করে? যার ঘরে যা আছে তাই জলে ভিজে ভেপে যাচ্ছে। লোকে টাকা দিয়েও চাল কিনতে পারছে না।

ভীমার্জুনের সেই হয়েছে সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ। বাড়ির চারিদিকে পাঁচিলগুলো একে একে পড়ে গেছে। তার জন্যে ভাবনা নেই। বৃষ্টিটা ধরলে দুই ভাই মিলে পাঁচিল তুলতে কতক্ষণ? ঘরও যদি পড়ে, পড়ুক। ঘরের ওপর ওদের মমতা নেই। ইচ্ছা হলে নতুন ঘর তৈরি করবে। নয়তো যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়বে। হাতে লাঠি থাকলে ওরা খাওয়ার ভাবনা করে না।

আসল কথা ওদের সব দুঃখ সয়, কেবল ক্ষুধা সয় না। আট হাত ছেঁড়া ধুতিতে যথাসম্ভব অঙ্গ ঢেকে ওরা গাছতলায় শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার সময় খেতে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখে, মাথা গরম হয়ে যায়।

কাল সমস্ত দিন ঘুরে অনেক কষ্টে বেশি দাম দিয়ে ওরা সের চারেক

চাল যোগাড় করেছিল। তার মধ্যে কাঁকর-ধূলো বাদ গেছে এক পোয়া। চার সের চালে ওদের দুই ভাইয়েরই একটা দিন মাত্র চলে। তার উপর সৌরভী আছে। সুতরাং কাল ওদের পেট ভালো ভরেনি। আজ সকাল থেকেই আবার সেই পেটের চিন্তা আরম্ভ হয়েছে।

ভীম কাল সকালে বেরিয়েছিল চালের খোঁজে।

আজ সকালে উঠেই অর্জুনকে বললে, তুই যা। আমি পারব না। আমার রাগ হয়ে যায়। কোন দিন খুনখারাপি করে ফেলব।

অর্জুন দাদাকে চেনে। হেসে বললে, কেন? চাল কিনতে যাবে, তার খুন-খারাপি কিসের?

—পয়সা দিয়ে চাল কিনব। কিন্তু এমন মেজাজ দেখায় যেন ভিক্ষে চাইতে গেছি। ডাকলে সাড়া দেয় না। এক কথা বিশবার না জিগ্যেস করলে উত্তর দেয় না।

অর্জুন বললে ওদের আজকাল দিন পড়েছে।

—টুঁটি টিপে ধরে দোব একদিন দিন ঘুচিয়ে।

ভীমের রক্তবর্ণ চোখ যেন জ্বলতে লাগল।

অর্জুন তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা থাক থাক। তোমাকে আর যেতে হবে না। আমিই দেখছি।

বলে একখানা গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

.

ভীম অত্যুক্তি করেনি

যারা এতদিন লোকের বাড়ি ধান ভেনে. কাজ করে খেত, তারা চালের মহাজন হয়েছে। দু'টাকা একটাকার ধান কেনে, নিজেরাই চাল করে আর ভদ্রলোকেদের কাছে বিক্রি করে। কয়ালের কল্যাণে কেনবার সময় প্রচলিত দরেই ওজন কিছু বেশি পায়; বিক্রি করবার সময় হাতের কৌশলে ওজনে কিছু কম দেয়; গরজ বুঝলে দরেও কিছু বেশি নেয়। একটা পেট। তাতে করে নিজের পেট চালিয়েও কিছু থাকে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, একে বর্ষা, তার উপর ধান আর পাওয়া যাচ্ছে না। অল্প-স্বল্প ধান যাদের ছিল, দরকার মত যারা পাঁচ দশটাকার ধান বিক্রি করত, তাদের ধানের পুঁজি শেষ হয়েছে। যাদের বেশি ধান, তারা অমন খুচরো বিক্রি করে না। তারা বিক্রি করে দুশো পাঁচশো হাজার মণ। কেনে মাড়োয়ারী মহাজন এবং তারপরে সে চাল যে কোথায় যায় ভগবান জানেন।

অর্জুন ঘণ্টা দুই পরে ক্লান্ত দেহে ফিরল। একেবারে রিক্ত হস্তে অবশ্য নয়। কিন্তু যে পরিমাণ চাল সে সংগ্রহ করেছে তাতে ওদের তিন জনের একবেলাও হবে কিনা সন্দেহ!

বিশেষ চালের রূপ দেখে সৌরভী তো হেসে লুটোপুটি।

—এ নিশ্চয় ভোঁতানের বাড়ির চাল। আমি দিব্যি করে বলতে পারি। —সৌরভী বললে।

—কি করে জানলি?—অর্জ্জুন হেসে বললে।

—আমি জানি যে। ওর গোলায় জল পেয়েছিল। মানুষ অভাবে পড়ে গেলে ও সেই চাল ছাড়ে! নয় কি না বল?

অর্জুন হেসে বললে, ঠিক ধরেছিস!

চালগুলো বেঁটে, মোটা এবং বহু বর্ণের। কাঁকরও আছে যথেষ্ট। কিন্তু সেজন্যেও ওরা ভাবছে না। চালের বিশেষত্ব হচ্ছে গন্ধে। নাকের কাছে ধরলে এখনই তাতে একটা উৎকট ভাপসা গন্ধ বার হচ্ছে।

ভীমের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। জগতে সব দুঃখ সে সহ্য করতে পারে, কেবল ক্ষুধার দুঃখ নয়! খেতে বসে ভাতের গন্ধে যদি তাকে উঠে আসতে হয়, তাহলে ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গোটা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

ভীমের ক্রোধ এমনই ভয়ানক জিনিস।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভীম বললে, খাওয়া যাবে তো রে?

সে বিষয়ে অর্জুনের সংশয় আছে। তারও ভয় আছে, দাদা এ চাল খেতে পারবে না হয় তো!

তাই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, খাওয়া আবার যাবে না তো কি? যখন যেমন, তখন তেমন। তোমায় রাঁধুনী-পাগল চালের ভাত কে দেবে?

ভীম হতাশ ভাবে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল!

চোখ বন্ধ করে বললে, রাঁধুনী-পাগল বলছি না রে। পচা গন্ধটা সহ্য করতে পারি না।

সহ্য না করতে পারার মতই গন্ধ।

ভাতের গ্রাস পেটের ভিতর থেকে পাক দিয়ে উঠে আসে। এমন গন্ধ!

সৌরভী উঠানে বসে খায় আর হাসে। অর্জুনও হাসে, কিন্তু খেতে আর পারে না। তবু দাদাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। ভীম হাসে না। যেন যুদ্ধ করছে এমনি কঠিন মুখের ভাব করে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে খায়।

ওর খাওয়া দেখে সৌরভীর হাসি যেন দমকে দমকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। হাসির চোটে তার চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল। অবশেষে সে উঠানেই হেসে লুটিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার দিকে দুই ভাই খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে দাওয়ায় বসে ছিল। সৌরভী বিকেলেই কোথায় বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

দু'বেলা রান্নার ব্যবস্থা ওদের পোষায় না, করেও না। করে না নানা কারণেই। পোষায় না তো বটেই, তাছাড়া জ্বালানি কোথায় ?

আগে এ অঞ্চলে ঘুঁটের এবং কাঠের জ্বালেই রান্না হত। লোকের ঘরে ঘরে বহু গরু ছিল। ঘুঁটের অভাব হোত না। তারপরে কয়লা এল। রোগে অযত্নে গরুগুলো মরে যেতে লাগল। ঘুঁটের অভাব হল। কিন্তু কয়লার জন্য সে অভাব কেউ বিশেষ অনুভব করলে না।

এমনি চলছিল।

এমন সময় যুদ্ধ বাধল। ওয়াগনের অভাবে কয়লা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। আজ সেই কয়লার দর সাড়ে তিনটাকা মণ।

দুই ভাই নিঃশব্দে হয়ত এইসব কথাই ভাবছিল।

পোঁতা টাকা এখনও কতকগুলো আছে। সুতরাং টাকার অভাব নেই। ফুরিয়ে গেলেও ওদের চিন্তা নেই। একরাত্রে অনেক টাকা ওরা যোগাড় করতে পারে।

কিন্তু চাল কোথায় ?

সত্য কথা বলতে কি, দিনের বেলায় অন্তত ওদের দুই ভাই-এর পেট ভরেনি। কিন্তু সে যাও বা হয়েছে, রাত্রে সুনিশ্চিত উপবাস। সমস্ত গ্রাম ঘুরে অর্জুন একটি দানা চালও সংগ্রহ করতে পারেনি। চাল নেই,— পচা দুর্গন্ধ চালও না।

সেই কথাই ওরা নিঃশব্দে ভাবছিল।

অর্জুন বললে, নিজেরাই খেতে পাই না। তার উপর একটা ল্যাং-বোট জুটেছে। হুঁ!

ভীম উত্তর দিলে না।

একটু পরে অর্জুন বললে, সৌরভীকে এবারে তাড়াও দাদা, আর পারা যায় না।

কথাটা অর্জুনকে ভেবে বলতে হল। সৌরভী সম্বন্ধে ভীমের একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে।

অন্য সময় হলে ভীম হয়ত উত্তেজিত হয়ে মানবীয় দয়াধর্ম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিত। কিন্তু দিনের অনাহার এবং রাত্রের সুনিশ্চিত অনাহার-সম্ভাবনায় তার দয়াধর্মের প্রবৃত্তি বোধ হয় ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল।

বললে, মাছটা-আসটা ধবে নিয়ে আসে। তরকারির জন্যে ভাবতে হয় না। ভাবি, একটা পেট তো! থাকগে।

অর্জুন বললে, একটা পেট চালানো কি তুমি সোজা কথা ভাব? থাকবে কি করে শুনি?

একটা ঢোঁক গিলে ভীম বললে, না সোজা কেন হবে? দেখছি তো, চালই পাওয়া যায় না।

—তবে?

ভীম আর জবাব দিলে না। কিন্তু তার ভাব দেখে বোঝা গেল, অর্জুন যদি সৌরভীকে তাড়িয়ে দেয় ভীম বিশেষ দুঃখিত হবে না। এই দুর্ভিক্ষে দেখা গেছে, পেটের চেয়ে আপনার আর কিছুই নেই। সেখানে জ্বালা ধরলে মানুষ পেটের মেয়েকে পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে।

অর্জুন বুঝলে সে কথা।

ভরসা পেয়ে জোরের সঙ্গে বললে, কালই তাড়াব ওটাকে। তুমি কিছু বলতে পাবে না বলে দিচ্ছি।

ভীম সাড়া দিলে না।

কিন্তু অর্জুনেরও দয়ামায়া আছে।

সে একেবারে রূঢ় কণ্ঠে সৌরভীকে বিদায় দিতে পারল না। আট আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে নিজেদের অবস্থা সমস্ত বুঝিয়ে মিষ্টি ভাষায় তাকে বিদায় দিলে!

সৌরভী রাগ করতে পারলে না। সত্যই তো. এই দুর্ভিক্ষের দিনে কে কাকে বারোমাস খাওয়াতে পারে?

কিন্তু তাকে তাড়িয়েই বা সমস্যা মিটল কই?

সে রাত্রি উপবাস গেছে। পরের দিন মুখুয্যেগিন্নীর কাছ থেকে ধার করে কোনো রকমে চালিয়েছে। তার পরের দিন সকাল থেকে সেই একই সমস্যা।

ভীমের মেজাজ দিন দিন উত্তপ্ত হতে লাগল। তার বড বড লাল চোখে কালো ভাঁটার মতো তারা থেকে থেকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে ঘুরতে থাকে। অকারণে তার হাত নিসপিস করে।

কিন্তু সে কোনো কথা বলে না।

তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে অস্থিচর্মসার প্রায়-নগ্ন নরনারী-শিশু দলে দলে স্টেশনের দিকে চলেছে কলরব করতে করতে।

—কোথায় যাবি গো ?

—যেখানে দু'চোখ যায়। পেটের জ্বালা আর সইতে পারলাম না। তোমরা খাও-দাও-থাক। ভগবান তোমাদের ভাল করুন বাবা। আমরা চললাম গাঁ-ভুঁই ছেড়ে।

উচ্চকণ্ঠে ওরা অভিশাপ আর পথের ধুলো ওড়াতে ওড়াতে চলে যায়। পথের ধুলো গাছের পাতায় পাতায় জমা হয়। অভিশাপ কোথায় জমা হয় কে জানে !

একটা শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া পরে সৌরভীও কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে সেইখানে দাঁড়ায়। কলরবপরায়ণ বুভুক্ষু জনতার দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনে যে তার কত বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, সে নিজেই জানে না।

জনতা চলে গেলে সে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বোকার মতো হাসে।

—হাসছিস কেন ?

—তা কি করব ?

—যাবি নাকি ওদের সঙ্গে ?

—ধ্যেৎ !

সৌরভী টলতে টলতে ছুটে পালায়।

কদিন থেকে ওর কেমন যেন মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ! ও যেন কেন হাসে, কখন কি কথা বলে তার মানে বোঝা যায় না। হঠাৎ এক সময় কোথা থেকে আসে, আবার হঠাৎ কখন চলে যায়।

ভীমার্জুন গ্রামে ফেরবার আগে ও কম কষ্ট পায়নি ! কিন্তু সে কোনোরকমে সহ্য করেছিল। কিন্তু ওদের আশ্রয় থেকে চ্যুত হওয়ার পরে কিছু দিন থেকে ওর জীবনে নতুন যে কষ্ট আরম্ভ হয়েছে, তা বোধ হয় আর সহ্য করতে পারছে না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় কষ্ট ক্ষুধার কষ্ট।

কোথাথেকে সেদিন সৌরভী দু-তিনটে কচু এনেছিল।

ভীমকে বললে, সিদ্ধ করে দেবে তোমাদের উনুনে ? কাঁচা খেতে পারছি না। গলা কুট কুট করছে।

একেবারে পাগলীর মতো চেহারা। মাথার কটা চুল যেন উড়ছে। চোখের দৃষ্টি শূন্য। মুখের চেহারা বীভৎস। অথচ এই মেয়েটাই একদিন দেখতে 'কী সুন্দরই না ছিল ! বুঝি অন্ন থেকে আসে রূপ, অন্নই তা হরণ করে নেয়।

ভীমার্জুনের চেহারাতেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মাঝে মাঝে চাল পাওয়া যায় না। উপবাস করতে হয়। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নাপিত পালিয়েছে গ্রাম ছেড়ে। ওদের মুখে দাড়ি হয়েছে বড়-বড়।

জ্বালানির অভাবে দুবেলা রান্না অনেকদিন থেকেই বন্ধ। এক বেলা ভাতে-ভাত নামিয়ে দুই ভাই তাই দু-বেলায় খায়। কিন্তু কাল থেকে তাও বন্ধ হয়েছে। চাল পাওয়া যায় না যায় ভেবে পরশু রাত্রে ওরা আধ পেটা খেয়ে পরদিনের সকালের জন্যে পিত্ত রক্ষার মতো দুটো ভাত রেখেছিল। এ বুদ্ধি অর্জুনের। খাবার সময় আধ-পেটা খাওয়া ভীমের পোষায় না। কিন্তু দুঃখের অভিজ্ঞতায় সে ছোট ভাই-এর ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেছে।

সৌরভীর প্রস্তাবে ভীম হেসে বললে, ভাগ!

কাতর কণ্ঠে সৌরভী বললে, ভাগ কি গো! দুটো কচু সেদ্ধ করে দেবে না! দুদিন খাই নি।

—আমরাও!

—তোমরাও; বলছ কি গো?

—হ্যাঁ। কাল থেকেই উনুনের পাট নেই। রান্না বন্ধ।

সৌরভী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, খাবে একটা কচু? গলা কুট কুট করে কিন্তু।

ভীমের পেটের জ্বালা বেশ ধরেছিল। সৌরভীর প্রস্তাবে তার মন একবার উসখুস করে উঠল। কিন্তু সে লোভ দমন করে শুধু বললে, ভাগ। পালা।

অর্জুন যখন চাল সংগ্রহ করে নিয়ে এল, তখন বেলা চারটের কম নয়। খানিকটা চাল, আর কুমড়োর একটা সরু ফালি।

সৌরভীর চলে যাওয়ার পর থেকে এই সুদীর্ঘ সময়টা ভীম কি করে কাটিয়েছে তা ভাষায় জানাবার নয়। একবার বসেছে, একবার উঠে দাঁড়িয়ে উঠানময় অস্থির ভাবে পায়চারি করেছে, সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, যদি মুখে দেবার কিছু একটা কোথাও পাওয়া যায়, অবশেষে ক্লান্ত দেহে বারান্দায় ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুয়েছে। কিন্তু মাছির উৎপাতে, ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসেনি।

অর্জুন যখন চাল নিয়ে এল, ভীমের তখন আর তা ফুটিয়ে নেবার তর সইছিল না। কাঁচাই চিবিয়ে মেরে দেয় এমনি অবস্থা। কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না।

শোবার ঘরে মেঝের উপর চাল ক'টি রেখে ঘরে শিকল বন্ধ করে

ওরা দুই ভাই বেরুল স্নান করতে।

কতক্ষণেরই বা ব্যাপার। স্নান করে এসে দু'টো কুমড়ো-ভাতে-ভাত নামিয়ে নেবে।

পথে সৌরভীর সঙ্গে দেখা। বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কি সে খুঁজছিল, আর খুঁটে খুঁটে মুখে দিচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, চাল পেলে নাকি ?

অর্জুন বলতে যাচ্ছিল, না। কিন্তু তার আগেই ভীম বলে ফেললে, পেয়েছি।

চাল কটি পেয়ে তার মনে খুব আনন্দ হয়েছে।

স্নানের ঘাট থেকে ফেরবার পথে বনের মধ্যে ওরা সৌরভীকে দেখতে পেলে না। বোধ করি আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকেছে।

কিন্তু কি খুঁজছে ও ? খুঁটে খুঁটে কি বা মুখে দিচ্ছে ? গোটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো ক্ষুধার জ্বালায় এই বন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। ফল-মূলের চিহ্ন কোথাও নেই।

বেচারী সৌরভী !

ওর জন্যে ভীমের মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় পেট ভরা থাকলে। ক্ষুধার সময় কারও কথা তার মনে পড়ে না।

কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার। দেখলে কে বলবে এ সেই প্রমত্তযৌবনা দুর্দান্ত সৌরভী। অস্থিচর্মসার দেহ দেখলে মনে হয়, ন'দশ বছরের একটা ছোট মেয়ে। মুখ দেখলে মনে হয় পঞ্চাশ বছরের বুড়ি। এক ফালি ছোট্ট কাপড় কোনো মতে কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, তবু ওর দিকে চাইতে লজ্জা করে না।

পথে আসতে আসতে অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে।

অর্জুন আগে আগে হন হন করে আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভীমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে।

কি ?

মাঠের জল নিকাশের জন্যে আলের উপর তালগাছের একটা সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। এবারে বৃষ্টি নেই, ফসল নেই, জল নিকাশের সমস্যাও নেই। সুতরাং সাঁকোটার মেরামতের দিকে চাষীদের কারও আর দৃষ্টি পড়েনি। কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে তালের কাঠগুলো শুকিয়ে ঝনঝন করছে।

অর্জুন সেইদিকে চেয়ে ইঙ্গিতে হাসলে।

জ্বালানির বড় অভাব। কয়লার মণ সাড়ে তিন টাকা। তাও পাওয়া যায় না।

ভীমকে আর বেশি বলতে হল না। চারিদিকে চেয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। অমনি থপ্ করে সেখানে বসে পড়ে কাঠখানা ধরে দিলে একটান।

তার সে আগেকার প্রচণ্ড শক্তি আর নেই। অনশনে, অর্ধাশনে, রোগে, শক্তি গেছে কমে। একটানে শুধু খানিকটা মাটি ঝুর ঝুর করে পড়ল।

ভীম নিজের শক্তিহীণতায় নিজের উপরই চটে গেল। দিলে আরও জোরে আরও একটা টান। তারপরে আরও একটা। অবশেষে কাঠখানা বেরিয়ে এল।

ওরা চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই। এই কাঠ চুরি কেউ দেখতে পায়নি। ওরা হন হন করে বাড়ি চলে এল।

ক্ষুধা পেয়েছে প্রচণ্ড। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। অন্ধকার হবার আগেই রান্না-খাওয়া শেষ করে ফেলতে হবে। নইলে অন্ধকারে খেতে হবে। কিছুদিন থেকে কেরোসিন তেল একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁধের ভিজে কাপড়খানা কোনো রকমে মেলে দিয়ে ভীম ভিজে গামছাখানা পরেই উনান ধরাতে লেগে গেল।

সূক্ষ্ম কাজে ভীমের পটুতা নেই। রান্না করে অর্জুন। কাঠ কাটা, জল আনা, উনান ধরানো, এগুলো ভীমের কাজ।

যা শুকনো খট খট কাঠ, এক মিনিটেই উনান দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

ভীম ভাতের হাঁড়ি ধুয়ে জল দিয়ে চড়িয়ে দিতেই অর্জুন শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল।

—কিরে ?

—চালটা কোথায় রাখলাম বল তো ?

ভীম চমকে উঠল :

—চাল ? কেন, নেই ?

—অর্জুন আসতে আসতে বললে, দেখতে পাচ্ছি না তো ?

ভীমের মাথায় মুহূর্তে যেন রক্ত চড়ে উঠল :

—নিশ্চয়, সেই হারামজাদীর কাজ !

ভীম তিন লাফে ওদিকের বড় ঘরে গিয়ে পৌঁছুল।

নেই !

শোবার ঘরের মেঝে শূন্য। শুধু গোটাকতক চাল ছড়ানো পড়ে রয়েছে ! স্পষ্ট বোঝা যায়, তাড়াতাড়ি করে কে যেন এসে চালগুলো তুলে নিয়ে গেছে।

ক্ষুধায় ভীমের পেটের নাড়িগুলো মোচড় দিয়ে উঠল। রাগে সে চোখে

অন্ধকার দেখলে। ঝড়ের বেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভীমের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি অর্জুনের অপরিচিত নয়। ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় অর্জুনের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল।

—কোথা যাও, দাদা কোথা যাও?

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভীম তখন অনেক দূরে। অর্জুন তার পিছনে ছুটল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারে উনানে তালকাঠের আগুন ক্ষুধার্তের জিভের মতো লকলক করছে।

সমস্ত বন, পথ-ঘাট অর্জুন তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও ভীমের দেখা পেলে না।

—দাদা। দাদা।

কোনো সাড়া নেই। অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ দেখা যায় না। সাপ-খোপের ভয়ে বনে বনে ঘুরতেও ভয় লাগে!

সুমুখের পথ দিয়ে কে যেন আসছে বোধ হল। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

—দাদা না কি? অর্জুন সাগ্রহে হাঁকলে।

—কে ও? অর্জুন?

অন্যলোকের কণ্ঠস্বর। অর্জুনের আশার প্রদীপ দপ্ করে নিভে গেল।

শুষ্ককণ্ঠে বললে, হ্যাঁ। আমার দাদাকে দেখেছ?

লোকটা তখন কাছে এসেছে।

বললে, তোমার দাদার কথা আর বলো না। এক্ষুনি দেখলাম, সৌরভীকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে গেল।

সৌরভীর সঙ্গে ভীমের ঘনিষ্ঠতার কথা সবাই জানে। লোকটা হাসলে।

কিন্তু দুর্ভাবনায় অর্জুনের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল।

—কোন দিকে নিয়ে গেল জান?

—তোমাদের বাড়ির দিকেই মনে হল।

লোকটি আবার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলে।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ছুটল বাড়ি।

পিছন থেকে লোকটি হাঁকলে, কি ব্যাপার? কি ব্যাপার?

অর্জুনের উত্তর দেবার অবসর নাই। সে ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে। চাল সৌরভীই চুরি করেছে কিনা কে জানে। চোর সে নয়। কিন্তু পেটের জ্বালায় কি না সম্ভব? চালগুলি সে সৌরভীর সামনে এনে ঢেলেছে। সৌরভী দেখেছে। সুতরাং তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব। অন্তত ভীমের সেই বিশ্বাস। তারও পেটে আগুন জ্বলেছে। সুতরাং সৌরভীকে পেয়ে ভীম যে কি করতে পারে, সেই ভেবেই অর্জুন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

গিয়ে দেখে উঠানের মাঝখানে ভীম দাঁড়িয়ে।

আর বড় ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আগুন ঘরের মাথা পর্যন্ত ওঠেনি। নিচের দিকে কেবল আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু উপরে উঠতে কতক্ষণ!

অর্জুন হতবুদ্ধির মতো প্রথমটা থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে এল নারী কণ্ঠের শীর্ণ, ক্ষীণ আর্তনাদ!

কোথা থেকে?

অর্জুন চারিদিকে চায়।

সৌরভীর মতো গলা না? উপবাসে ক্ষীণ কণ্ঠ। মনে হচ্ছে অনেকদূর থেকে কে যেন কাঁদছে।

অর্জুন চিৎকার করে উঠল: কী করেছ তুমি সৌরভীকে? কোথা থেকে কাঁদছে সে? ঘরে আগুন দিলে কে?

হঠাৎ যেন ভীম সম্বিৎ ফিরে পেলে। তার মধ্যেকার দুর্দান্ত ডাকাত উঠল জেগে।

অর্জুনকে সে এক ধমক দিলে: চুপ! পালিয়ে চল। হারামজাদীকে ঘরে পুড়িয়ে মারব।

অর্জুনকে সে পাঁজাকোলা করে তুলে বাইরের দিকে দিলে ছুট।

—ছাড়ো, ছাড়ো! মেয়েটা পুড়ে মরে যে! শেকলটা খুলে দিয়ে যাই।

গ্রামের মধ্যে তখন "আগুন আগুন" চিৎকার উঠেছে।

গ্রামে লোক বেশি নেই। অনেকেই পেটের জ্বালায় শহরে পালিয়েছে। তবু যারা আছে তারাই চিৎকার করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। তাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ভীম অর্জুনকে নামিয়ে দিলে না।

ছুটে পালাতে পালাতেই বললে, মরুক!

তারপর বললে, ওরা এসে খুলে দেবে।

ছন্নছাড়া

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম থেকেই মাখন সপরিবারে নিয়মিতভাবে উপবাস দিতে আরম্ভ করেছিল। মাঝে মাঝে কেউ কখনও দুটো ভাত দিত. আবার উপবাস আরম্ভ হত। এমনি করেও সে আরও তিন সপ্তাহ কাটাল। তারপরে আর পারল না। তাদের দলে প্রায় একশো লোক কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করল।

পথের সে ক্লেশ বর্ণনা করবার নয়। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে একটার পর একটা গ্রাম পেরিয়ে আসতে হয়েছে। কোথাও একমুঠো ভিক্ষা মিলেছে, কোথাও মেলেনি।

এমনি করে একদিন তারা কলকাতায় এসে পৌঁছল।

একে অপরিচিত জায়গা, তাতে কলকাতার মতো বড় শহর। একটু ছাড়াছাড়ি হলেই আর কেউ কাউকে খুঁজে পাবে না। ওরা সেই একশো নরনারী সেই ভেবে কাপড়ে-কাপড়ে গিঁট বেঁধে পড়ে রইল। বড়বাজারের একটা প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাত হল ওদের আশ্রয়।

মাখন, তার স্ত্রী ও গুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে নিয়ে এইখানে দিনের বেলায় কখনও ছোটাছুটি করে কখনও বা গাড়ি বারান্দার নিচে এবং রাত্রে উন্মুক্ত ফুটপাতে কাটাতে লাগল, আরও অনেকের সঙ্গে। মুস্কিল হয় বৃষ্টি এলে। তখন সব ছুটে গিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে জমা হয়। এবং কলহ ও কোলাহলে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

সকালে ওরা সদলবলে পাড়ায় বেরোয় ভিক্ষা করবার জন্যে।

—মাগো! দুটি খেতে পাই মা!

কেউ দুটো পয়সা দেয়, কেউ একটু ফেন, কেউ তার সঙ্গে দুটি ভাত, একটু ডাল, একটু তরকারিও দেয়। কেউ কিছুই দেয় না, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

দুপুরে ওরা মাটির পাত্র হাতে ছুটোছুটি করে অন্নসত্রের উদ্দেশে। আর সার বেঁধে পথের উপর বসে। হাতায় করে করে মণ্ড বিতরণ হয়, কোথাও খিচুড়ি! কেউ পেট ভরে খেতে দেয়, কেউ হাতার মাপে। তারপরেও ওরা ছোটে অন্য অন্নসত্রের দিকে। সেখানে যা পাওয়া যায় তাতে রাত্রের আহার চলে।

বিকেলে একটু আরাম করে বসে ফুটপাতে—ছায়ায়। ময়লা জলে কাচা ছেঁড়া ময়লা কাপড় দেয় শুকুতে। কেউ ওরই মধ্যে হাতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। কেউ বা পা ছড়িয়ে বসে মাথার উকুন বাচাচ্ছে, আর বক বক করে বকছে। কঙ্কালসার পেট-ডিগডিগে ছেলেমেয়েগুলো মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে ঘুমোয়, কখনও বা ঘুমোয় না, শুধু আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মাখন ফিরল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। এ, আর, পি-র বুটে তার ডান পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে গেছে। তারা অবশ্য ইচ্ছা করে থেঁৎলে দেয়নি। মল্লিকদের লঙ্গরখানায় মাখন সপরিবারে ইতিপূর্বেই একপেট খেয়েছিল। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক জায়গায় খাওয়ানোর আয়োজন দেখে সে লোভ সামলাতে না পেরে বসে পড়ার চেষ্টা করে। সেই সময় গোলমালের মধ্যে ভিড়ে তার পা যায় থেঁৎলে।

এ, আর, পি-র লোকেরা তখনই নিয়ে যায় তাদের স্টেশনে। তার পা বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে তাকে লঙ্গরখানায় নিয়ে গিয়ে ফের একপেট খাইয়েও দেয়।

সেইখান থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ফিরল।

পদ্ম ছেলেমেয়ে ক'টিকে নিয়ে ফুটপাতে বসেছিল। ছোট বাচ্ছাটি এখানে এসে প্রথম প্রথম ফুটপাতে হামা দিয়ে খেলা করত। কিন্তু তারপর কদিন থেকে কেবলই কাঁদছিল। এখন আর কাঁদে না, খেলাও করে না। নিঃশব্দে অসাড়ে শুয়ে থাকে। বুকের হাড়ের অন্তরালে হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করছে দেখা যায়। আর দেখা যায় ডিগডিগে পেটের নীল শিরাগুলো।

মাখনকে খোঁড়াতে দেখে পদ্ম চমকে উঠল।

—খোঁড়াচ্ছ কেন? কি হয়েছে?

কোঁথাতে কোঁথাতে মাখন বলল, পায়ের আর কিছু নেই রে। এ্যায়ার্পির জুতোয় আঙুলগুলো থেঁৎলে গেছে। সর, আমি এইখানে একটু শুই।

পদ্মকে সরতে হল না। জায়গা অনেক ছিল। মাটির পাত্রটা মাথায় দিয়ে মাখন আরাম করে শুল।

—বড্ড লাগছে রে! আমার পা'টা একটু টিপে দিবি?

পদ্ম ওর পা টিপতে বসল।

বললে, একটু ঘুমোও।

—তাই ঘুমুই। তুই আজ আর সন্ধ্যার পর বরং বেরুস না। কেমন যেন জ্বর জ্বর করছে।

—না, বেরুলে খাব কি ?

মাখনের নিজের পেট দুবার আহারের ফলে ফেটে পড়বার মতো হচ্ছিল। পদ্মর কথায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, একরাত না খেলে কিছু হয় না।

পদ্ম চুপ করে রইল।

একটু পরে মাখন জিজ্ঞাসা করলে, ছুটকি আছে কেমন ?

—চুপ করেই তো আছে।

হুঁ। ও বাঁচবে না দেখিস।

পদ্ম হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল : ওমা, ওকি কথা বলছ গো! ওকথা বল না।

শান্ত-স্বরেই মাখন বললে, বলছি কি আর সাধে! ওর শরীরে আছে কি! চোখ দেখছিস না ? আজ দুপুরে দেখছিলাম, পায়ের তলা পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। ওইটুকু বাচ্ছা এই ধকলে বাঁচে ? আমার মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দে।

অন্ধকার রাত্রি। দূরে একটা ল্যাম্পপোস্টের ঠুলির আড়ালে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। সে আলো এতদূর আসে না।

অনেকক্ষণ পরে মাখন অনুভব করলে, পদ্ম যেন নিঃশব্দে কাঁদছে।

মাখন বললে, কাঁদছিস ?

পদ্ম সাড়া দিলে না। আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মাখন বললে, কেঁদে কি করবি ? কেউ বাঁচবে না দুদিন আগে আর পরে। বুঝলি ?

মাখন পদ্মর গায়ে হাত দিতে ঠেলে সে হাত সরিয়ে দিলে।

মাখন রাগ করলে না। শান্ত কণ্ঠে বললে, রতনা বুড়ো অমন নিমুনে থেকে বেঁচে উঠল দেখলি তো ? কাল দেখছি টেরাম রাস্তার মোড়ে শুশুকের মতো মরে পড়ে আছে।

—বল কি গো! আমাদের গাঁয়ের রতন ?

—হ্যাঁ। বুড়ো মানুষ, এমন করে কদিন বাঁচবে ?

মাখন হঠাৎ হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। চোখ পাকিয়ে বললে, এই দেখ, শোন। আমরা যত লোক এখানে এসেছি কেউ ফিরে যাব না। শীতের নেওর পড়বে আর জষ্টি মাসের ঝড়ের আমের মতো পট পট করে খসে পড়বে। না পড়ে তো তখন আমাকে বলিস।

বলে নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর বিজয়গর্বে ধুপ করে আবার শুয়ে পড়ল।

তারপর অনেকক্ষণ আর মাখনের সাড়া পাওয়া গেল না। সে ঘুমিয়ে গেছে মনে করে পদ্ম যেই উঠতে যাবে, তখন মাখন আবার বললে, ছুটকিটা বাঁচতো। কিন্তু আমার কথা তো তুই শুনলিনে? তখন যদি ওই মাগির কাছে ওরে ডেকে দিতিস, ও ছুঁড়িও বাঁচত। আমরাও দুদিন খেয়ে বাঁচতাম।

এবারে পদ্ম ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই। ও মাগি যে বেবুশ্যে তা বুঝতে পারনি?

—বুঝতে আমি সবই পেরেছি। আমি সত্যি, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চার কালের খবর রাখি, জানিস? কি বলব, মরে আছি।

—পেটের মেয়ে বেবুশ্যেকে বিক্রি করতে হবে?

—তা কোন্ ভদ্রলোকে তোর মেয়েকে কিনতে আসবে বল? কিনলে ওরাই কিনবে।

মাখন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল:

—আরে মাগি, এটা বুঝিস না কেন, তবু তো দুদিন ছুঁড়িটা বাঁচবে! তা বাঁচবে। আর দুদিন বাঁচার চেয়ে বড় আগ্রহ ওদের কাছে আজকে আর কি আছে?

খানিক পরে মাখনের নাক ডাকতে লাগল।

পদ্মর ইচ্ছা ছিল রাত্রে একবার ভিক্ষায় বেরনো। কিন্তু মাখনের কথায় ওর মন খারাপ হয়ে গেছে। ছুটকি বাঁচবে না। বুড়ো রতন মরেছে, ওরা সবাই একে একে মরবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে যেমন করে গাছ ভরা আম পড়ে যায়, জীবনের বৃন্ত থেকে দুর্ভিক্ষের ঝড়ে ওরা তেমনি একে একে পটপট করে খসে পড়বে। কেউ আর ঘরে ফিরতে পারবে না।

ওর নারী মন একথা বিশ্বাস করতে চায় না।

পরশু দিনও যে ছুটকি হামা দিয়ে হেসে খেলে বেড়িয়েছে, আজকে না হয় সে চুপ করে রয়েছে, না হয় তার পায়ের তলা নীলই হয়েছে। তাই বলে সে মরে যাবে, তার কোলের কাছে থাকবে না, একথা সে কী করে বিশ্বাস করে? বুড়ো রতন মরেছে বলে তারাও সবাই মরে যাবে, এই বা কী করে বিশ্বাস করে?

তবু তার মন খারাপ হয়ে যায়। ভিক্ষায় বেরুতে মন সরে না।

মাখনের অদূরে ছুটকিকে কোলে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল। বড় ছেলেদুটো ঘুমিয়ে গেছে। পদ্ম একবার তাদের পেটে হাত দিয়ে দেখলে। পেট যেন একটু পড়ে আছে বলেই বোধ হল। আর একবাটি ফেন পেলে ওদের

হত। কিন্তু থাকগে। ঘুমিয়ে যখন গেছে তখন থাক। কাল সকালেই খাবে বরং। সকালের দিকে হলদে রঙের বড় বাড়িতে গেলে দুটি ভিজে ভাত পাওয়া যায়।

পদ্ম ছুটকিকে কোলে নিয়ে শুল।

সত্যি মেয়েটা যেন নড়ে না। কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। আহা! ঘুমোক।

পদ্ম গভীর স্নেহে ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর কখন একসময় নিজেও ঘুমিয়ে গেল।

•

বারোটা বেজে গেছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। কোলের মানুষ চেনা যায় না। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওদিকের ফুটপাত থেকে কার যেন গলার ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। কে জানে কার দুঃখের দিন চিরকালের মতো শেষ হয়ে এল!

পদ্ম অঘোরে ঘুমোয়।

হঠাৎ কার মৃদু সতর্ক হাতের ঠেলায় তার ঘুম ভেঙে গেল।

সপ্তাহখানেক থেকে রোজই এমনি ভাঙছে। অনেকটা তার অভ্যাস হয়ে এসেছে।

পদ্মর জাগবার সাড়া পেয়েই একখানা হাত হাতড়াতে হাতড়াতে ওর হাতে এসে ঠেকল, একটা সিকি ওর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে, তারপরে অতি সন্তর্পণে পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পদ্ম উঠে বসল। সিকিটা তার পুঁটলির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিলে। তারপরে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

দেখা কিছুই যায় না।

ওদিকে মাখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছুটকি তেমনি অসাড়ে পড়ে আছে, বোধ করি ঘুমুচ্ছেই। ওপাশে দুটো ছেলের কোনটা বোঝা গেল না, একটা মশার কামড়ে একবার ছটফট করে আবার পাশ ফিরে শুল।

পদ্ম আস্তে আস্তে উঠে পাশের গলির মধ্যে চলে গেল।

মাখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। কনেস্টবলের ডাকে ধড়মড় করে উঠে চোখ রগড়াতে লাগল।

কনেস্টবল জিজ্ঞাসা করলে, ই কিস্‌কো বাচ্চা?

—আমার হুজুর।

ছুটকির উপর আলো ফেলে কনেস্টবল জিজ্ঞাসা করলে, উ কব মর গেয়া ?

মর গেয়া ? মাখন চমকে উঠল, মরেনি তো ?

—জরুর মর গেয়া ! বহুৎ ঘড়ি মর গেয়া।

কনেস্টবল আবার ছুটকির মুখের উপর আলো ফেললে। মাখন দেখলে, ছুটকির চোখ বন্ধ ; আর অজস্র পিঁপড়া তার চোখ-মুখ পর্যন্ত পিলপিল করে সার বেঁধে ছুটেছে।

মাখন চিৎকার করে উঠল : ও পদ্ম. পদ্ম !

কোথায় পদ্ম !

পদ্ম এল অনেক পরে। ছেলে দুটো উঠে পড়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে। মাখন চিৎকার করে উঠল : ও পদ্ম, ছুটকি আর নেই রে ! ছুটকি কখন মরে গেছে !

পদ্ম কিন্তু কাঁদল না। একটা কথাও বললে না। শুধু কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বনস্পতির দুঃখ

অনেক ধাক্কা খেতে খেতে শেষ বয়সে বামাচরণবাবু যেন একটু দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হয়। ছেলেরা প্রায় সকলেই রোজগার করছে। পুরনো দেনাপত্র শোধ হয়েছে, বাড়িখানার যৌবন ফিরে এসেছে, অর্থের অভাব আর নেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, সংসারে মানুষ যা চায় তার সবই তিনি পেয়ে গেছেন।

তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। বাইরের কেউ জানে না, এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত না —শুধু তিনিই জানেন, তাঁর মনে শান্তি নেই।

বড় ছেলে এসেছে পাঁচ বৎসর পরে এলাহাবাদ থেকে সপরিবারে তিন মাসের ছুটি নিয়ে। ফুলের মতো ফুটফুটে তার ছেলে মেয়ে। এই অজ পাড়া-গাঁয়ে কি করে তাদের যত্ন করবেন, সে একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। ঘরে দুধ আছে, গুড় আছে, মুড়ি আছে, চিঁড়া আছে। কিন্তু সেকি তাদের মুখে রুচবে? ওরা মানুষ হয়েছে যে অন্য রকমে। বামাচরণবাবুদের মতো করে তো নয়। ওদের সাজ-পোষাক চালচলন দেখে বামাচরণবাবুর বেশ চিন্তা হয়েছে।

এই কুসুমপুর গ্রামখানি বড় নয়। হাজার দুয়েক লোকের বাস হবে। অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। কিছু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আছে। তাঁদের কেউ গ্রামের স্কুলে মাস্টারী, কেউ বা বাইরে-বাইরে চাকরীও করে। কিন্তু অধিকাংশই বিশেষ কিছু করে না। বামাচরণবাবুই এই গ্রামের ষোলোআনা জমিদার। জমিদারীর আয় অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু দাপ যথেষ্ট। কেউ ভয়ে, কেউ বা ভক্তিতে বামাচরণ বাবুকে যথেষ্ট খাতির করে চলে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ের জমিদারের চাল-চলন খুব ভারি নয়, নিতান্তই শাদা-মাটা। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার গ্রামের আর পাঁচ জনের মতো নিতান্তই সাধারণ এবং গ্রাম্য। নাতি-নাতিনীদের চাল-চলনে তিনি ভড়কে গেলেন। তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদলায়। এক একটা ছেলেমেয়ের যে এতগুলো করে পোষাক দরকার হয় একথা ভাবতে তাঁর বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না। নিজের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যার জন্যে এত বড় অপব্যয় লোকে কি করে করে, তাঁর কালের বিচারে তিনি তার থই পান না।

তবু উপায় কি !

কতকাল পরে তাঁর কত আদরের নাতি-নাতিনী, তাঁর কত স্নেহের পুত্র-পুত্রবধূ এসেছে। যেমন করেই হোক, তাদের সাধ মেটাতেই হবে। নইলে তিনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না।

গ্রামের এক প্রান্তে জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধারে কিনু ময়রার মুড়ি-মুড়কির দোকান আছে। রাহী লোক যাওয়া-আসার পথে সেইখানে বিশ্রাম করে, কিছু-কিছু মুড়ি-মুড়কি কিনে খায়। ওরই মধ্যে যারা একটু সৌখীন লোক, রোদে রাস্তা হেঁটে এসে মুড়ি-মুড়কি চিবুতে পারে না, তাদের জন্যে ভাগ্যক্রমে বোঁদেও পাওয়া যায়। সেরকম খদ্দের তো বেশি পাওয়া যায় না। সুতরাং অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই বাসি বোঁদে জোটে। কড় কড়ে শুকনো বোঁদে, তার উপরে চিনি জমে গেছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাহী লোক, তাই যে তারা কত পরিতৃপ্তির সঙ্গে খায়, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না।

গ্রামে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে কিনুই রসগোল্লা-পান্তুয়া তৈরি করে। বামাচরণবাবু কিনুকে ডেকে পাঠাতে সে জোড়হাতে এসে দাঁড়াল।

—কি হুকুম বাবু !

—আমাকে কিছু মিষ্টি তৈরি করে দিতে হবে যে বাবা।

হাসলে ওর সর্বশরীর আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

একগাল হেসে বললে, বেশ তো বাবু। নাতি-নাতিনীরা শহর থেকে এসেছে। মিষ্টি তো তৈরি করতেই হবে। আজই আমি এসে ভিয়েন চড়াব।

বামাচরণবাবু বললেন, কিন্তু রাম মুখুয্যে মহাশয়ের শ্রাদ্ধে যেমন পান্তুয়া হয়েছিল, তেমনি পান্তুয়া আমাকে তৈরি করে দিতে হবে।

—আজ্ঞে. তার চেয়ে ভালো পান্তুয়া হবে। কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না আপনি।

কিনু হাত নেড়ে বামাচরণবাবুকে আশ্বস্ত করে চলে গেল।

দুপুরে খেতে বসে বড় ছেলে বিনয়ের সঙ্গে বামাচরণবাবুর কথা হচ্ছিল :

বিনয় জিগ্যেস করলে, সাধনকে দেখছিনে বাবা ?

সাধন বিনয়ের সর্বকনিষ্ঠ ভাই।

বামাচরণবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাকে নিয়েই ভাবনা হয়েছে বিনয়। তুমি এসেছ, এর একটা ব্যবস্থা করে যাও।

বিনয় বললে, তার জন্যে ভাবনা কিসের বাবা ! অমন ভালো করে এম-এ পাশ

করেছে, আজকের বাজারে তার কি চাকরির অভাব হবে! চলুক না আমার সঙ্গে।

—সেইটেই তো ভাবনার কথা। চাকরি সে করবে না বলছে।

—ব্যবসা করবে? সে তো আরও ভালো। কিছু টাকা তাকে দিন। কলকাতায় রতীনের কাছে থেকে একটা ব্যবসা ফাঁদুক। তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না।

এবার অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে বামাচরণবাবু বললেন, ওরে না বাবা, চাকরি কি ব্যবসা কিছুই সে করবে না।

বিনয় সবিস্ময়ে বললে, তবে!

—সে দেশের কাজ করবে। তোমরা আসবে বলে পরশু থেকে কত আনন্দ সে করছিল। কাল হঠাৎ খবর পেলে পাশের গ্রামে মুসলমান পল্লীতে কলেরা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কে কার মুখে জল দেয় এমনি অবস্থা। খবর পেয়েই তার দল নিয়ে সেখানে সে ছুটেছে।

—সর্বনাশ! আপনি নিষেধ করেন নি?

—সে কি আমাকে জানিয়ে গেছে? না, নিষেধ করলেই শুনত?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

একটু পরে বামাচরণবাবু বললেন, তোমরা এসেছ জানে। সুতরাং যতক্ষণের জন্যেই হোক, আজ বিকেল নাগাদ একবার আসবে বলে আশা করছি।

—সেইটেই ভয়ের কথা বাবা।

—কেন?

—ছেলেপুলের বাড়ি। ছোঁয়াচে রোগ ঘেঁটে আসছে।

বামাচরণবাবু চিন্তিত হলেন। সত্যিই তো ছেলেপুলের বাড়ি। ভয়ের কথা তো আছেই।

কিন্তু এ কি অশান্তি!

খেতে-খেতে বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে, রতীনের খবর কি?

বামাচরণবাবুর তিন ছেলে। মেজ রতীন কলকাতায় একটা মিশনারী কলেজে অধ্যাপনা করে। এবং আরও বোধ হয় কিছু কিছু করে। সে একেবারে সাহেব মানুষ। সাজ-পোষাক থেকে চুরুট খাবার ভঙ্গিতে পর্যন্ত।

বামাচরণবাবু বিরক্তভাবে বললেন, জানিনে।

—কাছেই তো থাকে। মাঝে-মাঝে আসে না?

—ক্বচিৎ।

উভয়েই নিঃশব্দে আহার করতে লাগলেন।

একটু পরে বিনয় আবার জিজ্ঞাসা করলে, যে কথাটা তার সম্বন্ধে শোন যাচ্ছিল. সেটা সত্যি না মিথ্যে ?

এই আশঙ্কাই বামাচরণবাবু করছিলেন।

একটি বিধবা কায়স্থ কন্যাকে রতীন বিবাহ করতে যাচ্ছে, এই খবরটা এই গ্রামের রতীনের কয়েকজন বন্ধুর মারফত মাসকয়েক আগে বামাচরণবাবুর কানে এসে পৌচেছিল। এর মধ্যে রতীন আর গ্রামে আসেনি। খবরটা এমনি যে, বামাচরণবাবু এ সম্বন্ধে তাকে কোনো পত্রও দিতে পারেননি। সুতরাং খবরটির সত্যমিথ্যা সম্বন্ধেও নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারেন নি।

বললেন, কে জানে সত্যি না মিথ্যে। সে আসেওনি, কোনো খবরও দেয়নি। তুমি জানলে কি করে ?

—আমাকেও ওর একটি বন্ধু চিঠি দিয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যি কিনা জানবার জন্যে আমি রতীনকে চিঠিও দিয়েছিলাম।

– তারপরে ?

—সে জবাব দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই করেনি। তাইতেই সন্দেহ হচ্ছে, খবরটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়।

বামাচরণবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, লোকে বলে আমি খুব সুখে আছি। এই তো আমার সুখ! এক ছেলে সাহেব—সে যে কখন মুখ হাসাবে ঠিক নেই। এক ছেলে স্বদেশী, সেও যে কখন কি করে বসে ভাবতে গেলে গলা শুকিয়ে যায়। এই আনন্দে আমি রয়েছি!

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, এখানকার ডাক যায় কখন ?

—সে অনেকক্ষণ চলে গেছে। সকালেই ডাক যায়। কেন ?

—রতীনকে একখানা চিঠি লিখব ভাবছি। কতদিন পরে এলাম, তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। আসবার জন্যে একখানা চিঠি লিখে দিই, কি বলুন ?

বামাচরণবাবু খুশি হয়ে বললেন. বেশ তো। আমার কাছে একখানা পোস্টকার্ড আছে বলে মনে হচ্ছে। খুঁজে তোমাকে দিচ্ছি। আজ চিঠি লিখলে কালকের ডাকে যাবে; পরশু সে পেয়ে যাবে। সামনেই গুডফ্রাইডের ছুটি। সেই ছুটিতেই তাকে আসতে লেখ। দিন কয়েক থাকতেও পারবে:

বিনয় হেসে জিজ্ঞাসা করলে, সে কি দুর্দান্ত সাহেব হয়েছে ?

—কি জানি বাবা। সকালে দু-চোঙা পরে বেরিয়ে এল, আমি ওর দিকে

চাইতে পারলাম না। অন্য ঘরে চলে গেলাম।

বিনয় বুঝলে, বামাচরণবাবু পায়জামার নাম জানেন না। মনে-মনে সে হাসলে।

বামাচরণবাবু বললেন, সে যা-খুশি পরুক বিনয়, তার জন্যে কিছু বলিনে। কিন্তু মুরগীর ডিম খায়! বামুনের ছেলে মুরগীর ডিম খায়, শুনেছ কখনও? আমি নিজে দেখিনি অবশ্য, তবে শুনেছি গলার পৈতেটাও ফেলে দিয়েছে! বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাড়ি, সামনে রাধাবল্লভের মন্দির। সেই বাড়ির ছেলের এই মতিগতির কথা যখন ভাবি, সত্যি বলছি বিনয়, তখন আমার পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকে যায়। রাত্রে ঘুমুতে পারিনে।

—অন্যায়!

কোনোরকমে মুখ নিচু করে এই একটা কথা বিনয় বলতে পারল, তার পেটের ভেতরটা হাসির চোটে গুলিয়ে উঠছিল। মুরগী সে নিজেও সপরিবারে খায়।

বামাচরণবাবু উঠতে উঠতে বললেন, আমি এখনই পোস্টকার্ডখানা তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেশ ভালো করে লিখে দাও রতীনকে আসতে। আমার বিশ্বাস আসবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই আসবে। সামনে ছুটিও পাবে গুডফ্রাইডে'র।

পুত্রস্নেহাতুর পিতা চিঠি লেখার কথাটা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। জীবনের অপরাহ্ণকালে সবক'টিকে একত্রে দেখবার জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রজারা বামাচরণবাবুকে দুর্দান্ত জমিদার বলেই জানে। তাঁর দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়। প্রয়োজন হলে তিনি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারেন তাও তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তাঁর শক্তিকে তারা ভয় পায়, সমীহ করে। কিন্তু যেখানে তিনি পিতা, সেখানে যে তিনি কত অসহায় এবং কত দুর্বল, বামাচরণবাবুর অন্তর্যামী ছাড়া সে কথা আর কেউ জানে না। হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সেই দুর্বলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং সতর্কতার সঙ্গে তিনি পদক্ষেপ করেন। তাঁর জমিদারী-নীলরক্ত ধীরে প্রবাহিত হয়।

ফাল্গুন শেষ হয়ে সবে চৈত্র পড়েছে। গাছের পাতায় সবুজ ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে। গরমের আভাষ জাগছে, কিন্তু শীত এখনও একেবারে শেষ হয়নি। পাখীরা একটি-দুটি করে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি নামল। ভোর থেকে শুরু হয়েছে, সমস্তদিন গেল এর আর বিরাম নেই।

সন্ধ্যের ট্রেনে আসবে রতীন। একে সে সহজেই দেশে আসতে চায় না। তার উপর এই বৃষ্টি এবং কাদা!

বামাচরণবাবু তার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

স্টেশন দূরে নয়, মাইল খানেকের মধ্যে। কিন্তু এই পথটাই বা সে আসবে কি করে? আলো-ছাতা নিয়ে লোক অবশ্য একজন যাচ্ছে তাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু পথের কাদার কথা ভেবেই বামাচরণবাবু উদ্বেগবোধ করতে লাগলেন।

—ও বিনয়, স্টেশনে গরুর গাড়িটা পাঠাব না কি?

—গরুর গাড়ি? কি ব্যাপার?

—রতীন আসছে যে সন্ধ্যার ট্রেনে। টেলিগ্রামখানা দেখনি?

—দেখেছি। কিন্তু এইটুকু পথ, গরুর গাড়ি না গেলে সে আসতে পারবে না?

—না, না! পথের জন্যে তো নয়। কিন্তু কোট-পেণ্টুলুন পরে এই কাদায় হাঁটা কি তার সুবিধা হবে?

বাবার স্নেহকাতর মুখের দিকে চেয়েও বিনয় বিরক্ত না হয়ে পারল না। বললে, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না বাবা। সে যত সাহেবই হোক, এই গ্রামেরই তো ছেলে! জল-বৃষ্টি-কাদা, এখানকার কিছুই তার অপরিচিত নয়।

—তাহলে থাক।

বলে বামাচরণবাবু চলে যাচ্ছিলেন।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, সাধন কি আজও চলে গেছে সেইখানে?

আকাশে হাত তুলে বামাচরণবাবু বললেন, আজও? তুই ভাবছিস কি বিনয়? ওর তো এখন মরশুম পড়ে গেছে। একমাসের মধ্যে তুমি আর ওর টিকি দেখতে পাবে না। আমি তোদের বলে রাখছি বিনয়, দেখবি ও একদিন অপঘাতে মরবে। হয় কলেরা-বসন্তর হাতে, নয় সাপে কেটে।

বামাচরণবাবু ক্রুদ্ধভাবে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে গরুর গাড়ি আর পাঠাবার দরকার নেই। কি বল?

—না, না।

—তাহলে বংশী একটা আলো আর ছাতা নিয়ে চলে যাক। ও বংশী! সে ব্যাটা আবার কোথায় পালাল দেখ।

বংশী শিশুকাল থেকে এই বাড়িতেই মানুষ। বামাচরণবাবুর পেয়ারের

চাকর বলে গ্রামের মধ্যে তার একটা খাতিরও আছে। বাবু এবং গিন্নীমা উভয়েই তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তার ফলে সে বেজায় কুড়ে হয়ে পড়েছে। শ্রমসাধ্য কাজে হাত দেবার চিন্তাতেই তার জ্বর আসে। স্টেশনে রতীনকে এই বৃষ্টিতেও আনতে যেতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু রতীনকে সে চেনে। রতীন যে পরিমাণে সাহেব সেই পরিমাণে কৃপণ। সহজে তার হাত দিয়ে জল গলে না। বংশীকে দেখলে নির্ঘাত সে মোট-পোঁটলা বংশীর ঘাড়ে চাপাবে, কুলি করবার নামও করবে না।

মোট বইতেই বংশীর আপত্তি। সুতরাং বামাচরণবাবু কিছুতেই তার সাড়া পেলেন না। অগত্যা কেষ্ট গেল। আর বামাচরণবাবু ভাবতে লাগলেন, কেষ্ট তাকে খুঁজে পেলে হয়।

বামাচরণবাবু একবার ঘর একবার বার করেন আর থেকে-থেকে ঘড়ি দেখেন।

—ওরে ন'টা বাজে যে! কেউ তো ফিরল না।

বংশী তামাক সেজে কল্‌কেটা গড়গড়ার উপর বসাতে বসাতে বললে, আজ্ঞে, ট্রেন এখনও তো যায়নি।

—না, যায়নি। তুই ব্যাটা তো ট্রেনের সবই জানিস।

—আজ্ঞে, ট্রেন গেলে শব্দ পাওয়া যেত।

—শব্দ পাওয়া যেত! ব্যাটাকে বললাম যেতে। ফাঁকিবাজটা কোথায় সরে পড়ল। এখন ট্রেনের শব্দ শুনছে ঘরে বসে-বসে!

বংশী আর সাড়া-শব্দ না দিয়ে পালাল।

একটু পরেই ঝুপ ঝুপ করে ছাতা মাথায় দিয়ে লোক আসার শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের কলরব শোনা গেল: এই যে, এরা এসে গেছে!

কে এসে গেছে, না বললেও বোঝা যায়।

বামাচরণবাবু নিরুদ্বেগে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানতে লাগলেন জমিদারী চালে। এই লোকটিই যে একটু আগে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, সেকথা বোঝবার চিহ্নমাত্রও রইল না।

বংশী ছুটে এসে ব্যস্তভাবে খবর দিলে, মেজবাবু এসেছেন।

বামাচরণবাবু তার সাড়া দেবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। শুধু নিস্পৃহভাবে শান্তকণ্ঠে বললেন, তামাকটা বদলে দিয়ে যা।

•

মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছিল বিকেলবেলায়। নিমের ফুল ঝরছিল ঝুরঝুর

করে। অনেকদিন পরে রতীন বসে আছে একখানা ডেকচেয়ারে নিমতলায়।

বিনয় বললে, গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবে না কি একটু বেড়াতে ?

গ্রামের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই রতীন যেন সংযোগের নিবিড়তা বোধ করে না। এত কালকার যোগসূত্র শিক্ষা সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে কেমন যেন শিথিল হয়ে গেছে।

আলস্য ভেঙে রতীন বললে, আপনিই ঘুরে আসুন। কলকাতার কোলাহল থেকে এসে এই নিস্তব্ধতা বেশ লাগছে। কোথাও বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

বিনয় আর জেদ করলে না। একাই বেড়াতে বেরুল। রতীন বসে রইল একা। পাড়াগাঁয়ের নিঝুম অপরাহ্ণ। মাথায় ঝুর ঝুর ঝরে পড়ছে নিমফুল নিঃশব্দে। বেশ লাগছে।

কাল সন্ধ্যায় এসেছে রতীন। এর মধ্যে বামাচরণবাবুর সঙ্গে তার একবার মাত্র দেখা হয়েছে। তাও আধ মিনিটের জন্যে।

বামাচরণবাবু জিগ্যেস করলেন, ভালো আছ ?

রতীন বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যস। আর কিছু না। বামাচরণবাবু যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চলে গেলেন। রতীনও চলে গেল।

এক'দিন বামাচরণবাবু আর বিনয় একসঙ্গে বসে খাচ্ছিলেন। রতীন আসায় বামাচরণবাবু পৃথক ঘরে খেতে বসেন। বিনয় আর রতীন বসে একসঙ্গে।

এর জন্যে রতীনের মনে যে কোনো ক্ষোভ আছে তা নয়। সে নিজেও বাপের সঙ্গে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করে। বস্তুত খাওয়া-দাওয়া, বলতে গেলে সমস্ত ব্যাপারেই, বামাচরণবাবু যে তাকে সম্ভবমতো এড়িয়ে চলেন, এটা অন্য সকলের চোখে বিসদৃশ লাগলেও তার নিজের চোখেই পড়ে না। বরঞ্চ তার মনে হয়, সেকেলে বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ কুশলপ্রশ্ন বিনিময় ছাড়া আর কি আলোচনাই বা হতে পারে ? সে বিয়ে করেনি। সংসারী নয়। জমি-জমিদারী, ঘর-বাড়ি, লোক-লৌকিকতা, এ সব সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। সুতরাং বাপের থেকে দূরে দূরেই সে বরঞ্চ ভালো থাকে।

শুধু বাপের সঙ্গেই নয়, সমগ্র গ্রামের সম্পর্কেই তার এই মনোভাব। গ্রামের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিত লোকেরা কেউ এলে তাদের সঙ্গে নিতান্ত ভদ্রতারক্ষার জন্যেই হেসে দুটো কথা বলে। নইলে কেউ এল, কি এল না, তা নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই—কোথাও গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করারও তার আগ্রহ নেই।

গ্রামে কচিৎ-কখনো এলে এইটুকুই তার ভালো লাগে: এই নিমগাছের স্নিগ্ধ ছায়া, এই শান্ত নিস্তব্ধতা এবং এই দূর বিস্তৃত উন্মুক্ততা। তার বেশি এই গ্রামের কাছ থেকে অথবা কোনো গ্রামের কাছ থেকেই সে প্রত্যাশা করে না।

যতদিন অথবা যতক্ষণ সে গ্রামে থাকে, এইখানেই সে অধিকাংশ সময় থাকে—প্রায়ই একা, কখনও কোনো বন্ধুবান্ধবও আসে।

হঠাৎ বাড়ির ভিতরের দিকের শিকলটা বেজে উঠল।

রতীন চমকে সেই দিকে চাইতেই দরজার ফাঁক থেকে একখানি হাত ইশারায় তাকে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলোও বেজে উঠল।

এবারে আর রতীন না উঠে পারল না।

নিমগাছের মৃদুমন্দ হাওয়া, ডেকচেয়ারের আরাম-বিলাস ছেড়ে তাকে উঠতে হল। হাসতে হাসতে সে ভিতরে গেল।

ভিতর মানে, এই ঘরখানিকে ভিতর বললে ভিতর, বাহির বললে বাহির। সদর এবং অন্দরের মধ্যে এই ঘরখানিই সেতুস্বরূপ।

ছেলেবেলায় এইখানিই ছিল ওদের পড়বার ঘর।

বালাখানার প্রকাণ্ড বড় বারান্দায় যখন বামাচরণবাবুদের আড্ডা বসত —কখনও তাস-পাশা-দাবা, কখনও রামায়ণ-মহাভারত সুর করে পড়া, কখনও বা স্রেফ ভূতের গল্প,—এই ঘরে পড়তে বসে খেলোয়াড়দের চিৎকারে কখনও ওরা উচ্চকিত হয়ে উঠত, রামায়ণ-মহাভারতের সুরে ওদের মন কখন পড়া থেকে ছুটে চলে যেত পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনও বা ভূতের গল্প শুনতে শুনতে ভয় ও আনন্দে মেশানো এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করত।

এই সেই ঘর।

কত কাল পরে এই ঘরে এসে রতীন মুহূর্তকালের জন্যে থমকে দাঁড়াল। ওই সেই গোল টেবিলটা, আর সেই একহাত ভাঙা চেয়ার। রতীনের মনে পড়ল, এক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এই ঘরে অবিনাশের সঙ্গে খেলা করতে করতে চেয়ারটা উল্টে ভেঙে যায়। তার জন্যে বাপের কাছে এবং দাদার কাছেও কী ভীষণ বকুনীই সে খেয়েছিল!

সেই ঘর···সেই গোল টেবিল··সেই হাতভাঙা চেয়ার! কিন্তু সেই রতীন আজ কোথায়?

বললে, বল কি হুকুম?

—বিয়ে কি করবে না ঠিক করেছ ?

—না। ততদূর এখনও যাইনি।

—তাহলে কতদূর গেছ সেটা দয়া করে আমাদের জানাবে ?

রতীন হাসলে, খুব মনের আনন্দে হাসলে। এখানে এসে পর্যন্ত তো নয়ই, বোধ করি অনেকদিনই সে এমন করে হাসেনি।

বললে, মনে পড়ে বৌদি, সেইবারেই বোধ হয় তোমাদের বিয়ে হল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। সবাই যে-যার ঘরে শুয়ে। নিচে লক্ষ্মীর ঘরে আমরা তুজনে তাস খেলছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় তুষ্ট বুদ্ধি জাগল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে আবার পড়বে না ? সেই ভর্তি-তুপুরে তুমি বেরুলে বাগান থেকে কাঁচা আম পেড়ে আনতে।

রতীন বললে, ভাঁড়ার থেকে তুমি আনলে নুন-লঙ্কা। সেই আম ছেঁচা হল। তুজনে খেলাম। মনে পড়ে ?

বৌদি হেসে বললে, মনে হচ্ছে সে সব যেন সেদিনকার কথা।

—তার পরে কি হল বৌদি ?

- কি হল ? তোমার জ্বর হয়েছিল বোধ হয়, না।

রতীন বললে, জ্বর মানে ? রীতিমতো টাইফয়েড, ঠিক তার পরদিন থেকেই। বাঁচবার আশা ছিল না। তুমি কি রকম কাঁদতে মনে নেই ? তোমার ধারণা হয়েছিল, কাঁচা আম খাওয়ার জন্যেই বোধ হয় আমার অসুখ।

—তা হবে। সে সব ঠিক মনে পড়ে না।

—মনে ঠিকই পড়ে বৌদি। শুধু ছেলেবেলার সেই তুর্বলতার কথা আজ স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু সেদিন যদি আমি মারাই যেতাম বৌদি ?

এইবারে বৌদির চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, ছিঃ! ওকথা বলতে নেই। তুমি বিয়ে করবে কি না সেই কথার জবাব দাও।

—জানিনে তো।

—আচ্ছা, একটা কথা আমার কাছে সত্যি বলবে ?

—সম্ভব হলে নিশ্চয় বলব বৌদি। কি কথা বল তো ? সেই বিয়ের কথাটা তো ?

—হ্যাঁ। সত্যিই কি তুমি বিধবা কায়স্থ-মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছ ?

—কিন্তু সে-মেয়েটি বিধবা নয় বৌদি, কুমারী।

—কিন্তু কায়স্থ তো ?

—হ্যাঁ কায়স্থ,—অন্তত আমি যতদূর জানি।

বৌদি মাথা নেড়ে বললে, তাহলেই হল—আমাদের স্বজাতি তো নয়। কেন, ব্রাহ্মণের ঘরে কি ভালো পাত্রী নেই?

—সে অপবাদ তো দিইনি বৌদি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মিথ্যে অপবাদ দেবই বা কোন্ মুখে?

বৌদি ওর জোড়হাতে কথা বলবার ভঙ্গিতে না হেসে পারলে না। কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার মেয়ে সে নয়।

বললে, তা আমাদের ঘর ছেড়ে যখন কায়স্থর মেয়েকে পছন্দ করেছ, তখন কথাটা সেই রকমই দাঁড়াল বই কি।

• মোটেই সে রকম দাঁড়াল না বৌদি। কে কখন কাকে কেন পছন্দ করে সে কি কেউ জানে? মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু কেন ভালো লেগেছে তা জানিনে।

—তাহলে তাকেই বিয়ে করছ তো, বুড়ো বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ে?

—বুড়োদের কষ্ট কে রোধ করতে পারে বৌদি? তাঁদের সে-কাল আর নেই। মানুষ বদলেছে, হাওয়া বদলেছে। সে হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে না পারলে কষ্ট তো পেতেই হবে। তাহলে সমস্ত কথা তোমাকে বলি। আপত্তি যে শুধু তোমাদের তরফেই, ব্রাহ্মণ বলে, তা নয়—কায়স্থ হলেও তাদের তরফেও ঠিক এই রকম আপত্তি। দীর্ঘকাল যে প্রথা চলে আসছে তা ভাঙতে সকলেরই আপত্তি।

—সে তো খুবই স্বাভাবিক।

—নিশ্চয়। কেবল অস্বাভাবিক এইটে যে, তোমরা আমাকে এবং তারা সেই মেয়েটিকে স্বাভাবিক প্রাচীন প্রথায় মানুষ করনি। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ইংরিজি লেখাপড়া শিখিয়েছ।

নারীর কৌতূহল, বৌদি না জিজ্ঞাসা করে পারলে না:

—মেয়েটিও খুব লেখাপড়া শিখেছে বুঝি?

—এবারে এম-এ দিচ্ছে।

—তাই বুঝি? কিন্তু বামুনের মেয়ে এবারে কি একটাও দিচ্ছে না? তাদের কাউকেই পছন্দ করো না কেন?

রতীন হেসে বললে, পশ্চিমে এত শহর ঘুরে বেড়ালে বৌদি, কিন্তু তুমি এখনও সেই সেকেলেই আছ। পছন্দর উপর কি জোর চলে? তা ছাড়া আমি পছন্দ করলেই পতিসৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পছন্দ করবেন, তারই বা কি মানে আছে? একালের মেয়েদেরও ঠিক পুরুষের

মতোই একটা নিজস্ব মত এবং রুচি আছে, তা জানো না ?

বৌদি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে :

—আচ্ছা, আমরাও মত দিচ্ছিনে, তাঁরাও মত দিচ্ছেন না। এইবারে তোমরা কি করবে ?

—তা প্রজাপতি ব্রহ্মাই জানেন। কিন্তু তোমরা এখন থেকেই ব্যস্ত হয়ে মাথাখারাপ কর না, এই আমার অনুরোধ।

রতীন আর দাঁড়াল না। হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল।

সেই ডেকচেয়ারটিতে রতীন ফিরে এসে বসল।

তার একটু পরেই ঝোড়ো কাকের মতো ঝুপ ঝুপ করে এসে সাধন তাকে প্রণাম করলে।

শশব্যস্তে রতীন পা সরিয়ে নিয়ে বললে, থাক থাক। আর প্রণাম করতে হবে না। এই আসছিস ?

রতীনের পায়ের ধুলো মাথায় বুলিয়ে সাধন বললে, হ্যাঁ। বড়দা কোথায় গেলেন ?

—পল্লীজননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

—আপনি যান নি ?

—পল্লীজননীর উপর আমার অনুরাগ বোধ করি বড়দার চেয়ে কম বলে।

—সে কি গর্ব করে বলবার কথা মেজদা ? যে গ্রামে আমরা জন্মেছি, মানুষ হয়েছি—

—মানুষ তোমরা গ্রামে হওনি ভাই, গ্রামের বাইরেই হয়েছ। গ্রামের বাইরে যারা যায়নি, তারা যা মানুষ হয়েছে, সে তো সর্বক্ষণ চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

সাধন হেসে ফেললে। বললে, তা খুব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের পরিমাপ যদি হৃদয় দিয়ে করতে হয়, তাহলে আমি বলব, গ্রামে এমন লোক অনেক আছে মানুষ হিসাবে যারা কারও চেয়ে খাটো নয়।

রতীন উত্তরে শুধু একটু উপেক্ষার সঙ্গে হাসলে।

বললে, বোসো বোসো। তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তোমার রোগীগুলির অবস্থা কি বল।

—ভালোই, অর্থাৎ যারা মরবার তারা মরে গেছে। যারা মরতে পারলে না, তারা পরবর্তী সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছে। তারও বোধ হয় দেরি হবে না। বসন্ত আরম্ভ হল বলে। তাতেও না কুলোয় ম্যালেরিয়া তো আছেই।

রতীন খুব বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এই যে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের জীবন, একদিন জন্ম নেওয়া এবং আর একদিন মরে যাওয়া—এর কোনো সার্থকতা তুমি খুঁজে পাও ?

—না। কিন্তু সে কার দোষ মেজদা ? পাড়াগাঁয়ের লোকেদের, না এই দেশেরই যাঁরা বড় হয়ে বাইরে চলে গেছেন, গ্রামের সঙ্গে অসীম ঘৃণায় যাঁরা যোগসূত্র ছিন্ন করেছেন, তাঁদের ?

রতীন উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বললে, কি জানি। বোধকরি এই এদের বিধিলিপি। কিন্তু তুমি কি এদেরই মধ্যে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেবে ? লেখাপড়া শিখেছ, বড় হবার কোনো চেষ্টা করবে না ?

—না মেজদা। একলা বড় হবার উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। পারি, এদেরও বড় করে তোলবার চেষ্টা করব। নয়তো এদেরই সঙ্গে এদেরই মতো ছোট হয়ে থাকব।

রতীন হেসে বললে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সাধন, তাহলে সারাজীবন তোমাকে হয়তো ছোট হয়েই থাকতে হবে, বড় হওয়া আর ঘটে উঠবে না।

—না ঘটে ওঠে, তাতেও দুঃখ করব না। তুমি বোসো মেজদা, আমি স্নানটা করে আসি। রোগী ঘেঁটে আসছি।

সন্ধ্যায় রাধাবল্লভের আরতি হয়ে গেল।

বামাচরণবাবু এই সময়টায় নিয়মিতভাবে যুক্তকরে মন্দিরের নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ান। ঠাকুরদালানে আধঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর গৃহিণী। পাড়ার প্রসাদলোভী ক'টি বালক কাঁসর বাজায়। মুচির সঙ্গে জমি চাকরান বন্দোবস্ত আছে, তারা এসে ডগর বাজায়। শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রণাম করে। বামাচরণবাবুর স্ত্রী নিজের হাতে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন।

আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রসাদ-বিতরণের শেষে মন্দির অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গনে বামাচরণবাবু একা পায়চারী করতে লাগলেন।

বিনয় বেড়িয়ে ফিরছিল।

প্রাঙ্গনে একটি ছায়ামূর্তিকে একা অন্ধকারে পাদচারণ করতে দেখে সে একবার থমকে দাঁড়াল। ডাকল : বাবা ?

বামাচরণবাবু দাঁড়ালেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, বিনয় ? বেড়িয়ে ফিরলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অন্ধকারে বেড়াচ্ছেন ? একটা আলো দেয়নি কেউ ?

—আলোর দরকার নেই বাবা। তুমি ভিতরে যাও, হাতমুখ ধোও গে।

বিনয় ভিতরে গেল না। বামাচরণবাবুর কণ্ঠস্বরে সে যেন অশ্রুর আভাষ পেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর কি ভালো নেই বাবা?

– ভালোই আছে তো?

—কি যেন ভাবছেন মনে হচ্ছে?

—ভাবছি?– বামাচরণবাবু হাসলেন—ভাবনার অনেক কারণ আছে বাবা।

বামাচরণবাবু থামলেন! বিনয় জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারী করতে লাগল।

একটু পরে বামাচরণবাবু বলতে লাগলেন:

– ভাবনার অনেক কারণ ঘটেছে বিনয়। বয়সে ষাট পেরিয়ে গেল। আমার বাবা মারা যান পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে। আমিও হয়তো তার চেয়ে বেশি বাঁচব না। তাই যত দিন যাচ্ছে, চারিদিকে চেয়ে ততই ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। এর আর কোনো কিনারা পাচ্ছি না।

—কী আপনার ভাবনা?

—অনেক। সেইটেই বলব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। এবংশের মান-মর্যাদা, এই বংশের কুলপ্রথা রক্ষা করবার দায়িত্ব প্রধানত তোমার। সুতরাং তোমাকে আমার দুর্ভাবনার কথা বলা উচিত। অনেকদিন পরে তুমি এলে। আবার কবে আসবে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কিনা তার কিছুই ঠিক নেই। সুতরাং আমার দুর্ভাবনার কথা তোমার এবারেই জেনে যাওয়া দরকার।

বামাচরণবাবু একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেন।

বললেন, আমাদের বংশের ইতিহাস তুমি জান। দায়ুদ শা'র আমলে তাঁর দেওয়ান জঙ্গল কেটে এই গ্রামের পত্তন করেন। সেই থেকেই এই গ্রামে আমাদের বাস, এই গ্রামের আমরা জমিদার। সামনে ওই যে মন্দির, এও আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তি। ওই বিগ্রহ মূর্তি আমাদের পূর্বপুরুষ বৃন্দাবন থেকে এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই থেকে এই বিগ্রহের আমরা সেবাইত। রাধাবল্লভ আমাদের কুলদেবতা। কুলদেবতার ভোগ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অন্নগ্রহণ করি না, তাঁর আরতির সময় আমরা অনুপস্থিত থাকি না। আমি পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম হয়নি। দোল-রাস, বার-ব্রত দেব-সেবার যা-কিছু অঙ্গ জ্ঞানত আমি তার ত্রুটি করিনি। ভাবছি, এর পরে কি?

—এর পরেও সে ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি হবে না বাবা।

বামাচরণবাবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলেন।

বললেন, কি করে? তুমি বাইরে চাকরী করো। রতীনটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তার কথা ছেড়েই দাও। বাকি সাধন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, দেবোত্তরের আয় থেকে এই নাটমন্দিরেই সে হয়তো হাড়ি-বাগ্দী-মুচি-ডোমের ছেলেদের নিয়ে একটা নৈশ-বিদ্যালয় বসাবে। দেবসেবার ত্রুটি হবে, অতিথি-সেবা হয়তো বা বন্ধই হয়ে যাবে।

—যাতে তা না করতে পারে তার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যান বাবা।

—পাকা ব্যবস্থা?—বামাচরণবাবু আবার হাসলেন, পাকা ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হলে আমি কি পরলোক থেকে এসে তার নামে মামলা করব বিনয়, যে পাকা ব্যবস্থার কথা বলছ?

বিনয় বুঝলে কথাটা সত্যি। সে নীরব রইল।

বামাচরণবাবু বললেন, আমার সব কথা আমি হয়তো তোমাদের বোঝাতে পারব না বিনয়। এই গ্রাম, ওই রাধাবল্লভ দেবতা এবং আমাদের বংশ, এ আমার কাছে একসুতোয় গাঁথা। এর একটি থেকে আর একটিকে পৃথক করতে গেলেই মালা যাবে ছিঁড়ে। এই গ্রাম এবং রাধাবল্লভঠাকুর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই আমাদের বংশের বৈশিষ্ট চলে যাবে, আমরা তখন নিতান্ত সাধারণ হয়ে যাব, আমাদের বংশের সত্তা যাবে হারিয়ে—এই কথাটা আমি তোমাদের কি করে বোঝাব জানিনে। আধুনিক শিক্ষায় এবং বাইরে থেকে-থেকে এই বোধ তোমাদের লোপ পেয়েছে। আমার সঙ্গে এবং আমাদের বংশের ধারার সঙ্গে কিছুতেই তোমাদের মিল খাওয়াতে পারছি না, এই আমার দুঃখ, আমার দুশ্চিন্তা!

বংশী এসে বললে, আপনার আহ্নিকের জায়গা হয়েছে বাবু।

—হ্যাঁ যাই। নারায়ণ! নারায়ণ!

বামাচরণবাবু চলে গেলেন। বিনয় স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

মন্দির প্রাঙ্গনের একপ্রান্তে একটা ছোট আতাগাছ খানিকটা ঝোপের সৃষ্টি করেছে। সেইখানে নিঃশব্দে শুয়েছিল বামাচরণবাবুর পোষা কুকুর ভুলো। আহ্নিকের পরে বামাচরণবাবু আহারে বসেন। কিছুদিন থেকেই বালাখানার

মজলিস এবং মজলিসের শেষে অধিক রাত্রে আহার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

শরীর দিন দিন অশক্ত হয়ে আসছে। রাত্রের ঘুম গেছে কমে। কিছুক্ষণ ঘুম প্রথম রাত্রেই হয়। সেজন্যে তিনি সকাল সকাল খেয়েই শুয়ে পড়েন। আহারান্তে পাতের একমুঠা ভাত ভুলোকে দেওয়া তাঁর অভ্যাস।

সুতরাং দুটো ভাত পাওয়ার লোভে ভুলো আতাতলার নিদ্রা ছেড়ে গা ঝেড়ে উঠল।

তার গা-ঝাড়ার শব্দে বিনয়ের চমক ভাঙল।

রাত বোধকরি ন'টা হবে। এক ফালি সরু বাঁকা চাঁদ চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল।

বিনয় বাড়ির দিকে পা বাড়াবে এমন সময় সাধনের কলকণ্ঠ শোনা গেল :

—আপনি এখানে বড়দা? একা?

শান্তকণ্ঠে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ফিরলে কখন?

—বিকেলে। মেজদার সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম, আপনি গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গেছেন। স্নান করে এসে দেখলাম তখনও ফেরেন নি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। ক'দিন থেকে হঠাৎ বেশ গরম পড়ে গেছে। এখন অন্ধকারে বেরুন ঠিক নয়। সাপ বেরুচ্ছে।

বিনয় ভয় পেয়ে গেল।

বললে, বলো কি? বিষাক্ত সাপ?

—হ্যাঁ। একটু আগে হাড়িরা একটা মস্ত বড় কেউটে সাপ মারলে।

—কোথায়? রতীন এসে জিজ্ঞাসা করলে।

—হাড়িপাড়ায়।

—এই দেখ!—রতীন যেন জমে গেল। বললে, তোমরা রাগ কর সাধন, কিন্তু বলত এইভাবে মানুষ গ্রামে বাস করতে পারে? গ্রীষ্মে জলের কষ্ট, বর্ষায় কাদা, শরৎ-হেমন্তের ম্যালেরিয়া চলবে ফাল্গুন পর্যন্ত, তারপরেই আরম্ভ হবে বসন্ত কলেরা। সাপ-বাঘ-মহামারী-জলাভাব-খাদ্যাভাব—ভদ্রলোকে কী করে থাকে বল?

সাধন হো হো করে হেসে উঠল। বললে, মেজদা, তুমি গ্রামে থাকতে ভালোবাস না, সুতরাং থেক না। কিন্তু অজুহাত তুল না।

রতীন রেগে বললে, ও-গুলোকে তুমি অজুহাত বল? ও-গুলো কি মিথ্যে?

সাধন বললে, মিথ্যে কেন হবে? তবু অজুহাত। আমাদের গ্রামগুলোতে

অনেক অসুবিধা আছে। তাই বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে? তুমি গ্রামের জমিদার, গ্রামের জলকষ্ট দূর কর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, গ্রামের লোককে শেখাও কেমন করে গ্রাম পরিষ্কার রাখতে হয়, মহামারী দূর করতে হয়, কেমন করে মানুষের মতো বাঁচতে হয়। পালিয়ে যাওয়াটা তো প্রতিকার নয়।

বিনয়ের মনে পড়ল বামাচরণবাবুর কথা। গ্রামকে ভালোবাসেন দুজনেই, বামাচরণবাবুও সাধনও। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কত তফাৎ! বামাচরণবাবু গ্রামের কথা ভাবেন তাঁর বংশমর্যাদার দিক থেকে। তাঁর কাছে এই গ্রাম, রাধাবল্লভ বিগ্রহ এবং তাঁর জমিদারী মর্যাদা একসুতোয় গাঁথা। সাধন দেখছে, নতুন যুগের নতুন আলোয়। তাই গ্রামের উপর দুজনেরই যথেষ্ট ভালোবাসা থাকলেও দুজনের মধ্যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বিস্তৃত ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

বিনয় বললে, একটু আগে বাবার সঙ্গে এইখানে এই কথাই হচ্ছিল। তাঁর মনে ভাবনা হয়েছে, তাঁর অবর্তমানে এই বংশের ধারা লোপ পেয়ে যাবে। রাধাবল্লভের নিত্যভোগ হয়তো হবে, কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির কেউ কুলপ্রথা মতো সেখানে উপস্থিত থাকবে না। কেউ উপস্থিত থাকবে না সন্ধ্যারতির সময়।

সাধন বললে, আমি থাকব বড়দা।

বিনয় হেসে বললে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তোমার উপর তাঁর আস্থা নেই। বরং আশঙ্কা আছে এই জন্যে যে, কুলপ্রথার ব্যতিক্রম করে দেবোত্তরের আয় থেকে তুমি হাড়ি-বাগ্দীদের নিয়ে এই নাটমন্দিরেই একটা নাইট স্কুল খুলবে।

সাধন বললে, সে ইচ্ছা সত্যিই আমার মনে-মনে আছে বড়দা।

বিনয় বললে, সেইটেই তাঁর দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কিন্তু সেটা কি খারাপ বড়দা?

বিনয় বললে, সে বিষয়ে আমাদের বিবেচনার কথা হচ্ছে না সাধন। বাবার বিবেচনার কথা হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয়, তাঁর আশঙ্কা রতীনের উপর থেকে তোমার উপর কম নয়।

হাতে তালি বাজিয়ে রতীন বললে, Good! ভাই স্বদেশীওয়ালা, তোমার পল্লীপ্রীতির দম্ভ একটুখানি কমাও। তোমারও সম্বন্ধে বাবা যে আশঙ্কা পোষণ করেন, এই কথাটা কান পেতে শোন।

সবাই হাসলে।

বিনয় বললে, হাসির কথা নয়! বাবার কণ্ঠস্বরে আজ অশ্রুর আভাস পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে আছে।

রতীন বললে, এর আর প্রতিকার কি বড়দা? আমরা নিশ্চয়ই আর বাবার

সেই পুরনো শতাব্দীতে ফিরে যেতে পারি না।

বিনয় বললে, সেও বুঝি। কিন্তু বাবার চোখে জল, এও সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন। সেই থেকেই এই একটা কথাই আমি ক্রমাগত ভাবছি।

সাধন জিজ্ঞাসা করলে, ভেবে কুল-কিনারা কিছু পেলেন ?

—না।

—তাহলে ?

—আমি চাই এই 'তাহলের' কথাটাই তোমরা সবাই মিলে ভাব।

রতীন বললে, সে মিথ্যে ভাবা হবে বড়দা। তার চেয়ে একটা গোল গর্তের মধ্যে চৌকো কিছু মিল করে বসিয়ে দেওয়া সহজ।

বিনয় আর সাধন চুপ করে রইল।

রতীন বলতে লাগল ঃ

এই একটু আগে, বৌদির সঙ্গে এই রকমের আলোচনাই চলছিল। সমস্ত মুসলমান শাসনকালে বাঙলার সমাজ-জীবনে পরিবর্তন বেশি আসেনি। হাওয়া নিস্তরঙ্গ ছিল বললেই হয়। মাঝে মাঝে এক-আধটা কালাপাহাড় ক্ষণিকের জন্যে ঝড় তুলেছিল। কিন্তু তা থামতেও দেরি হয়নি। তরঙ্গ উঠল ভালো করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এবং সংঘাতে। যত দিন যাচ্ছে, তরঙ্গের গতি তত দ্রুততর হচ্ছে। বাবা আজ যে কষ্ট পাচ্ছেন, সে তো সামান্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমরা এর চেয়েও কষ্ট পাব। বাবার কথা ছেড়ে দিয়ে তারই জন্যে প্রস্তুত হোন।

বিনয় বিস্মিতভাবে বললে, তুমি কী বলছ রতীন ? আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন কী বিস্ময় জমছে, আমি তো টের পাইনি।

রতীন উত্তর দিলে, টের পাবেন কি করে বড়দা ? ওদের কি আপনি কোনদিন চেনবার চেষ্টা করেছেন। আমি কলেজে ছেলে পড়াই। বছরের পর বছর তরঙ্গের পর তরঙ্গে নতুন ছেলেদের দল আসে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে কি দ্রুত পরিবর্তন যে হচ্ছে, দেখে আমার বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, এর কারণ কিছু অনুমান করতে পার ?

রতীন উত্তর দিলে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের দূরত্ব অত্যন্ত দ্রুতবেগে কমে আসছে। পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। যাদের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাদের সঙ্গে সকালে-বিকেলে চায়ের দোকানে দেখা হচ্ছে। আমার মনে হয়, এত দ্রুত পরিবর্তনের সে একটা বড় কারণ।

বংশী এসে দাঁড়াল। ভাবলেশহীনকণ্ঠে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

বংশী চলে গেল। তার পিছনে-পিছনে ওরা তিন ভাইও নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে ভিতরে গেল।

বহুদিন পরে দাদার সঙ্গে দেখা। পল্লীগ্রামের উপর অনুরাগ না থাকলেও দাদার উপর রতীনের অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ করে তার সমবয়সী, তার বাল্যকালের খেলার সাথী বৌদিদির সঙ্গ অনেকদিন পরে পেয়ে তার কলকাতায় ফিরে যেতে মন সরছিল না। যে ক'দিন এরা আছে, একসঙ্গে কাটাবার জন্যে সে কলেজ থেকে ছুটি নিলে।

কিন্তু দেখতে দেখতে সে ছুটিও ফুরিয়ে এল।

বেলা বারোটায় ওদের ট্রেন।

বিনয়ের ছেলেমেয়েগুলি সকাল থেকেই দাদুর আঙুল ধরে ঘুরছে। বামাচরণবাবু ওদের নিয়ে কী যে দেখাচ্ছেন, কোথায়-কোথায় যে ঘুরছেন আর কী যে বলছেন, তার স্থিরতা নেই।

—দাদু ভাই, এলাহাবাদ ভালো না কুসুমপুর ভালো?

ছোট বালক নিঃসঙ্কোচে বললে, কুসুমপুর। এলাহাবাদ আমার মোটে ভালো লাগে না দাদু।

আনন্দে বামাচরণবাবুর সমস্ত মন আপ্লুত হয়ে উঠল।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? কেন?

কেন তা সে জানে না। মাথা নেড়ে শুধু বললে, না। কিছু ভালো লাগে না।

—কেন? সেখানে কত বড় বড় বাড়ি, থিয়েটার-সিনেমা, কত ভালো ভালো খাবার।

তা হোক, তবু তাদের এলাহাবাদ ভাল লাগে না। এলাহাবাদ যেতে তাদের ইচ্ছা করছে না। তারা দাদুর কাছে থেকে যেতে চায়।

বামাচরণবাবুর চোখে জল এল।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, তাই কি হয় ভাই? এখন যাও বাবা-মার সঙ্গে। তারপর যখন বড় হবে, অনেক লেখাপড়া শিখবে, তখন এইখানে ফিরে আসবে—তোমার দাদুর বাড়িতে। তোমার বাড়ি, তোমার রাধাবল্লভের মন্দির, তোমার জমিদারী দেখবে?

—সন্ধ্যেবেলায় কাঁসর বাজিয়ে আরতি হবে না?

—হবে বই কি? নাটমন্দিরে আমি যেখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, ঐখানটিতে তুমিও এসে হাত জোড় করে দাঁড়াবে।

—প্রসাদ দেবে কে ?

—তুমিই দেবে।

—শোব কোথায় ?

—আমার ঘরে। আমার খাটখানিতে।

—আর তুমি ?

—আমি তো তখন থাকব না ভাই।

—কোথায় যাবে ? এলাহাবাদ ?

—কোথায় তা কি জানি ? তবে এলাহাবাদে নয়। তোমার মতন আমিও এলাহাবাদ ভালোবাসি না।

এলাহাবাদ সম্বন্ধে দাদুর সঙ্গে শিশুর কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু দাদুর কোথাও চলে যাওয়া চলবে না।

বললে, না। তুমি কোথাও চলে যেতে পাবে না।

—চিরকাল এইখানে থাকব ?

—হ্যাঁ।

বামাচরণবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

বলল, তাই হবে ভাই। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। তোমরা হয়তো দেখতে পাবে না। কিন্তু থাকব মিলিয়ে রাধাবল্লভের মন্দিরের রজ'র সঙ্গে। কিন্তু তুমি যেন এস ভাই। আমার খাটে এসে শুয়ো, আমার মতো করে জমিদারী চালিও, রাধাবল্লভের ভোগারতির সময় হাজির থেক। বেশ ?

বামাচরণবাবু আর কথা বলতে পারলেন না। অশ্রুতে তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে উঠল।

ওঘরে টুকিটাকি গোছাচ্ছেন গৃহিণী।

কিছু সরু চিঁড়া, টাটকা আখের গুড়, খেজুর গুড়ের পাটালি। এসব জিনিস কোথায় পাবে এলাহাবাদে ? একখানা কাপড়ে বেঁধে দিলেন কতকগুলো।

বৌমা বললে, কী হবে ওসব মা ? ওরা কি ওসব কিছু ছোঁবে ভেবেছেন ?

—তোমার ছেলেমেয়ে কি খেতে ভালবাসে সে তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি মা। বিকেলে আমার ঘরে বসে কি খেয়েছে ওরা জান ?

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। খেজুর গুড়ের পাটালি খেয়েছে মুঠো-মুঠো। বলে চকোলেটের চেয়ে ঢের ভালো। দই দিয়ে, কলা দিয়ে, গুড় দিয়ে চিঁড়ে মাখিয়ে দিয়েছি —চেঁচেপুঁছে খেয়েছে। দেখনি তো ?

—তাই নাকি ?—বৌমা আনন্দে হেসে উঠল—এমন সুবুদ্ধি ওদের হয়েছে ?

ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনীদের বিদায়দুঃখ গৃহিণীর চোখ ছলছল করছিল। বাঁ হাতে চোখের জল মুছে হেসে তিনি বললেন, যতখানি ভাব, তোমার ছেলেমেয়ে তেমন সাহেব-মেম হয়নি। আমস্বত্বটুকু দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় আমস্বত্বগুলি জড়িয়ে বেঁধে বললেন, আর এক হাঁড়ি কুলের আচার দেব বৌমা। দোহাই তোমার, ট্রেনে যেন ফেলে যেও না, যত্ন করে নিয়ে যেও।

—কিন্তু সব আমস্বত্বটাই যে দিয়ে দিলেন মা। বাবার জন্যে খানিকটা রেখে দিন।

জলভরা চোখেই গৃহিণী আর একবার হাসলেন।

বললেন, হায়রে কপাল! ছেলেমেয়েরা চলে যাচ্ছে, ভালো-মন্দ জিনিস ও কি আর মুখে দেবে ভেবেছ? এই শূন্যবাড়িতে আমরা যে করে দিন কাটাই সে আর বলবার নয়।

—সে কি আর বুঝিনে মা। আপনারা একলা থাকেন, আমাদের কত ভয় করে! কি করব? উপায় তো নেই। চাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকা তো চলে না।

—সেই ভেবেই আমরাও পাষাণে বুক বেঁধে চুপ করে থাকি। কি করব। উপায় তো নেই। কিন্তু এবারে যেন বড্ড মনটা ছটফট করছে বৌমা। কিছুতে ধৈর্য ধরতে পারছিনে।

গৃহিণী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার জন্যে বাইরে চলে গেলেন।

যাত্রার সময় নিকট হয়ে এল।

দু'খানি গরুর গাড়ি যথাসময়ে এসে উপস্থিত। বিনয়ের নিজের বাক্স-বিছানা, জিনিসপত্র তো আছেই, তার উপর টুকিটাকি করে এখান থেকেও জিনিস কম যাচ্ছে না। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জিনিস : বামাচরণবাবুর নিজের হাতে লাগানো গাছের গোটাকতক বেগুন, সিম, লাউ; ঘরের গাছের ডুমুর, দুটো পাকা কুমড়া, ক্ষেতের আলু সের দশেক ;- নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস! তবু এই সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে!

রতীন হলে খামোখা এই বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজি হত না। কিন্তু বিনয়ের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সে জানে এর একটি জিনিস নিয়ে যাব

না বললে মায়ের চোখ ছলছল্ করে উঠবে। আজকালকার দিনে ট্রেনের ভিড় সামান্য নয়। মানুষেরই ওঠা দায়। তার উপর এই লাগেজ। কিন্তু কি করবে? ফেলে দিতে হয়, নিতান্তই না নিয়ে যেতে পারে, রাস্তায় ফেলে দেবে। কিন্তু এখানে নয়।

বিনয় খুব উৎসাহের সঙ্গে সমস্ত জিনিস গুণতে লাগল।

গাড়োয়ান হাঁকলে, আর দেরি করবেন না বাবু, তাহলে ট্রেন পাওয়া যাবে না।

ছেলেমেয়েরা ছুটতে ছুটতে এসে গরুর গাড়িতে চেপে বসল। কী উৎসাহ তাদের! কুসুমপুর তাদের ভালো লাগে। দাদুকে ঠাকুমাকে তারা অসম্ভব ভালোবাসে। তবুও কোথাও যে তারা চলল, সেই আনন্দেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।•

সব শেষে এল বিনয়ের স্ত্রী, পিছনে বিনয়ের মা।

নাটমন্দিরে প্রণাম করে বিনয়ের স্ত্রীও অবশেষে গাড়িতে গিয়ে উঠল। কান্নায় তার বুক ফুলে-ফুলে উঠছে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে জলভরা চোখে বিনয়ের স্ত্রী দেখলে, বৃদ্ধ বামাচরণবাবু পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাড়িয়ে।

ছেলেমেয়েরা হাত নেড়ে কলকণ্ঠে বলে উঠল: দাদু, চললাম। চিঠি দিও।

বামাচরণবাবু হাসলেন। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

আশ্চর্য এই যুগ!

মানুষ যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। পুত্রপৌত্র নিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার উপায় নেই। আশ্চর্য!

সাধন গিয়েছিল গরুর গাড়ির সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত।

সকালেই ভদ্রপুর থেকে খুব উদ্বেগজনক খবর এসেছিল। তখনই তার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। রোগী-সেবায় সাধারণত সে কালবিলম্ব করে না। কিন্তু এদিনটা যেন একটা বিশেষ দিন। এই একটি দিন সে কর্তব্যে অবহেলা করলে। মাত্র ঘণ্টাকয়েকের জন্যে। স্টেশনে বিনয়দের উঠিয়েই সে ছুটবে ভদ্রপুর।

মুচিপাড়ায় দুটো কলেরা কেসের খবর এসেছে। কে জানে সে দুজন বেঁচে আছে কি না, কে জানে রোগ আরও ছড়াল কি না

আজ রাত্রে হয়তো সে বাড়ি ফিরতেই পারবে না।

সন্ধ্যার আরতি হবে আজও। প্রতিদিনের মতো আজও বামাচরণবাবু এসে দাঁড়াবেন নাটমন্দিরে তাঁর প্রতিদিনকার জায়গাটিতে। পাড়ার ছেলেরা এসে বাজাবে কাঁসর। প্রসাদ বিতরণ করবেন বামাচরণবাবুর গৃহিণী।

তারপরে ?

আতাগাছের দিকে অন্ধকার যেন আলকাতরার মতো জমাট বাঁধবে। কে জানে আজ কি তিথি। চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে একফালি বাঁকা চাঁদ উঠবে কি না। ওঠে যদি, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে।

দীর্ঘ, শীর্ণ বনস্পতি··· মাটিতে যার শিকড়ের বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে··· যে গাছে আর ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না, পোকায় কেটে ভিতরটা যার ফাঁপা করে দিয়েছে, তবু দাঁড়িয়ে থাকে যেন সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে··· আর কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদের দিকে চেয়ে সবহারার মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরল পাতায় পাতায়···

ওঠে যদি আজ বাঁকা চাঁদ, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে···সে হয়তো বুঝবে।

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA